দ্রৌপদী প্রেম

সুশীলকুমার নাগ

পূর্ণ প্রকাশন : ৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

যাঁর কাছ থেকে শুধুই পেয়েছি, যাঁকে দেওয়া হয়নি কিছুই—আমার সেই পিতা ৺প্রমথলাল নাগ-এর অম্লান স্মৃতিতে—

—লেখক

কৃতজ্ঞতা

যাঁর উৎসাহ আর উদ্যম পেছনে না থাকলে এ বই প্রকাশ করা আমার পক্ষে কখনই সম্ভব হত না, সেই একান্ত সুহৃদয় শ্রীযুত অনিলকুমার ঘোষ মহাশয়ের নাম উল্লেখ না করে পারিনে।

—লেখক

অনেকক্ষণ থেকেই কথাটা একটি সরু ধোঁয়ার রেখার মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওপরে উঠছিল। ছড়াচ্ছিল সমস্ত বাড়িময়। এবারে হঠাৎ সেই ধোঁয়া উবে গিয়ে আগুন দেখা দিল। একেবারে দাউ দাউ আগুন।

বিয়েবাড়ির সমস্ত কোলাহল আর মুখরতাকে ম্লান করে দিল একটি কথা। প্রথমটায় সবারই চোখে-মুখে একটা হাল্কা বিস্ময় আর কৌতুক দেখা গিয়েছিল। কানাকানিতে কথাটি শুনে সবাই ওটাকে হেসে অবিশ্বাসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। এবং তা দিয়েছিলও।

সবাই ভেবেছিল, ওরকম একটি নাটুকে ঘটনা আর সংলাপকে কেউ একজন রটনা করেছে নেহাতই একটি মজার চাঞ্চল্য আনবার জন্য। বিয়েবাড়ির নানা কৌতুক আর বিস্ময়ের মত এ ঘটনাটিও আর এক কৌতুক মাত্র।

তাই কথাটি শুনে সুতপার বন্ধু হেনা নিতান্তই ঠাট্টার সুরে বলেছিল, কিলো সুতপা, তুই কি তাই হবি নাকি?

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পেরে সুতপা বলেছিল, কি হব?

—ঐ যে, ঐ এক ভদ্রলোক যা বলছেন। তবুও রহস্যটুকু একেবারে ফাঁস করল না হেনা।

কি বলছিস হেনা? কে ভদ্রলোক? কি বলছেন? খুলেই বল না? নিতান্তই কৌতূহল মেটানোর জন্যই পীড়াপীড়ি করতে লাগল সুতপা।

— সে তুই নিজেই দেখবি'খন। তোরই তো জিনিস বাবা, আমরা তো আর কেউ নিয়ে যাচ্ছি না।

এবারে একটু লজ্জা পেল সুতপা। ভাবল, হেনা বোধহয় এমন

এক ভদ্রলোকের কথা বলছে যার কথা এ মুহূর্তে জানতে চাইতে নেই কোন বিয়ের কনের।

তাই একটু পরেই বলল, থাক, তাহলে আর বলে কাজ নেই। এক্ষুণি আবার যা-তা একটা কিছু বলে ফেলবি। তারচেয়ে নাহয় চুপ করেই থাক।

—তা হেনা নাহয় চুপ করেই থাকল কিন্তু আর সবাই তো চুপ করে নেই? এতক্ষণে কথাটি যে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল সুতপা, তাকে তুই ঠেকাবি কি দিয়ে?

আর এক বান্ধবী ইলা সেই একই কথা বলল সুতপাকে। বলল যেন বেশ একটু গম্ভীর সুরে।

আবার একবার চমকে উঠল সুতপা। চাইল ভাল করে সবার দিকে, বুঝতে চাইল কি এমন ব্যাপার ঘটেছে এ বাড়িতে। সবারই চোখে-মুখে একটা থমথমে ভাব নেমে আসছে কেন!

তবে কি কোথাও কোন আয়োজনের ত্রুটি হয়েছে এই বিয়ে-বাড়িতে? কিংবা কেউ কাউকে অপমানসূচক কিছু কথা বলেছে?

একটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল সুতপার। জিজ্ঞেস করল বিশাখাকে, হ্যাঁরে শাখা, মা কোথায় রে?

—কি জানি, ভেতর বাড়িতেই কোথাও আছেন।

কি একটু ভেবেই উঠে পড়ল সুতপা।

বান্ধবীরা এবং বর্ষীয়সী মহিলারা হা হা করে উঠল, বলল, ওকি, তুই এখন কোথায় যাচ্ছিস? বিয়ের কনেকে জায়গা ছেড়ে উঠতে নেই।

কে একজন ওর শাড়ির আঁচলটাও ধরে রেখেছিল। সেটাকে হাত দিয়ে ছাড়াতে ছাড়াতে সুতপা বলল, তাহলে তোমরা আমায় বলছ না কেন, কি হয়েছে? মা জ্যাঠাইমা এঁদেরই বা দেখছি না কেন? কোথায় গেলেন তাঁরা?

একজন প্রৌঢ়া বললেন, অবুঝের মত প্রশ্ন কর না বাছা। ওরা

কি সব এখানে বসে থাকবেন নাকি ? তাহলেই সব কাজ হয়ে যাবে ? বিয়ের ব্যাপার, ছেলেখেলা তো নয়। এমনিতেই নাভিশ্বাস উঠে যায়।

ভদ্রমহিলা অন্যদিক থেকে ওকে বোঝাতে চাইলেন। তাই তখন-কার মত উত্তেজনাটা একটু কমল সুতপার।

কিন্তু তবুও এদিকে-ওদিকে কাণাঘুষায় শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা জানল সে। জেনে একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

—ছি ছি ছি, এমন কাণ্ড মানুষে করে ! কালে কালে যে দেখছি সংসারটাই নাটক হয়ে উঠছে।

একজনের খেদোক্তি।

আর একজন সুরে সুর মিলিয়ে বলল, এ যে দিদি, নাটকেরও বাড়া ! ঘেন্না, ঘেন্না, বিয়ের কনেকে মদের বোতল উপহার দেওয়া, এ যে সিনেমা সুরু করে দিল বিয়েবাড়িতে।

অন্য একজন ওদের কথার ফাঁকটুকু দেখিয়ে বলল, কিন্তু কই, আর দশটা বিয়েও তো হচ্ছে, কোথাও তো এমন হয় না ? তবেই বুঝুন, একি আর এমনি এমনি হয় ? বিনে কাঠিতে কি আর ঢাক বাজে ?

--আবার কাব্যি করে লেখা হয়েছে—দ্রৌপদী হতে যাচ্ছ দেখে খুশি হলাম। তাই নিজের সব চাইতে প্রিয় জিনিসটি তোমায় দিলাম। মরণ আর কি ?

ব্যস, আর বিশেষ কিচ্ছু শোনার দরকার হয়নি সুতপার। মাথাটা দু'একটা চক্কর খেয়েই একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। কিন্তু তবু সে মূর্চ্ছাও গেল না, চীৎকারও করল না। কাঠ হয়ে বসে রইল শুধু। বসে কি যেন ভাবল। তারপর এক সময় আচমকা উঠে হন হন করে চলল অভ্যাগতদের ঘরে।

দেখল, এক ঘর লোক তখনো বসে পরস্পর বলাবলি করছে। ওদের কথা তখন আর স্পষ্ট কিছুই কানে গেল না তার। সে শুধু তীব্র দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক কাকে যেন খুঁজল।

মেজকাকা বীরেন্দ্রনাথ ওকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে খুকু, কাকে খুঁজছিস? বলতে বলতে কাছে এগিয়ে এলেন তিনি।

এবারে একটু নীচু সুরে বলল, সুতপা, তুমি কি আগাগোড়াই এ ঘরে আছ নাকি, মেজকাকা?

—হ্যাঁ, আমিই তো এদের রিসেপশন করছি।

—তবে তুমি তাকে দেখতে পেলে না?

—কাকে?

—ঐ যে, কে একজন নাকি কি এক অপূর্ব বস্তু উপহার দিয়ে গেছে আমাকে।

একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বীরেন্দ্রবাবু বললেন, হুঁ-ম্, তুইও তাহলে শুনেছিস সব।

—বাঃ, আমায় উপহার দিয়ে গেছেন আর আমি জানব না? বলে কেমন একটা শুকনো হাসি হাসল সুতপা।

—সত্যি ভারি বিশ্রী হয়ে গেল ব্যাপারটা। এ যে বংশের মুখে কালি দেবার ব্যবস্থা করেছে লোকটা। আচ্ছা খুকী, তোর কাউকে সন্দেহ হয়? তোর বন্ধুবান্ধব বা অন্য কেউ? এদিকে বরপক্ষ তো আবার ক্ষেপে উঠেছে। ওদের দারুণ সন্দেহ, কোথাও কিছু গোলমাল আছেই।

—ওদের বুদ্ধি আছে। এর পরেও সন্দেহ না করাটাই অন্যায়। আচ্ছা বাবা কাথায় গেল?

—তিনি তো ছেলের বাপকে নিয়ে ওপরের ঘরে ঢুকলেন।

—ও আচ্ছা। বলেই ওপরের দিকে যাচ্ছিল সুতপা।

—তুই আবার ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? ওখানে এখন তোর যাওয়া ঠিক হবে না।

—কেন?

—দাদা গেছেন তোর মেসোমশাইকে সঙ্গে নিয়ে। হয়ত কোন-

রকমে একটা মীমাংসার চেষ্টা করছেন। তুই গেলে হয়ত সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে?

—এ বিয়ে ভেস্তে যাবেই মেজকাকা, এ আমি জানি। নইলে এমন একটা পাকা চাল লোকটি চালবে কেন? কিন্তু তাই বলে ওদের কাছ থেকে অপমান কুড়িয়ে লাভ কি? বলে দাও সব কথা—ওঁরা জানুক কেন লোকটি আমাকে দ্রৌপদী হতে বলেছে! কেন ওরকম একটা বস্তু দিয়েছে বিয়ের উপহার হিসেবে!

—আঃ, তুই কি ক্ষেপে গেলি নাকি খুকী? এ সময়ে মাথা ঠিক রাখতে হয়, তা নাহলে নির্ঘাত ভরাডুবি।

—যে নৌকোর তলার কাঠই খুলে গেছে, ছুটো স্তোকবাক্যের ঝিনুক দিয়ে সে নৌকোর জল সেঁচে ফেলা যায় না।

—এদিকে আয় খুকী, ভেতরে আয়।

কখন এক সময় মা সুধাদেবী এসে গেছেন।

—আর তুমি রাখ-ঢাক কর না, মা। তোমার জন্যই আজ এক-বাড়ি লোকের সামনে আমায় এ অপমানটা সহ্য করতে হল। সুতপা একটু রেগেই বলল।

—নে, বেশি বকিস না। কার জন্যে কি হচ্ছে, সে পরে বুঝবি। ঠাকুরপো, তুমি এদিকটা দেখ। যতক্ষণ ওরা কথা সেরে নীচে না আসছে।

আবার হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে মা বললেন আর হ্যাঁ, কাউকে এখন ওপরে যেতে দিও না।

—ঠিক আছে, সে আমি সব দেখছি।

চলে গেলেন সুধাদেবী মেয়েকে সাথে নিয়ে। তখনকার মত মায়ের সঙ্গে চলে গেলেও ওপরের ঘরটি ওকে ছুর্বার আকর্ষণে টানছিল। তাই একটু সুযোগ পেয়েই সে ওই ঘরের পেছনের দরজায় গিয়ে কান পাতল এবং দরজার ফুটো দিয়ে সব দেখতেও পেল। ঘরের ওদিকে বাবা নীরেন্দ্রনাথ আর ছেলের বাবা যোগেশচন্দ্র ছুজনেই চুপ করে বসে

আছেন। একজন আঙুল দিয়ে নিজের চুলের মুঠি শক্ত করে চেপে ধরে আছেন। আর একজন গম্ভীর মুখে দাঁতে ঠোঁট কাটছেন।

এছাড়া আর যে চারজন উপস্থিত, কথা কাটাকাটি হচ্ছে তাদেরই মধ্যে।

বরপক্ষের একজন বললেন, আমার মনে হয়, এরকমভাবে কথা কাটাকাটি করে কোন মীমাংসাই হবে না। অযথা তিক্ততাই বাড়বে শুধু।

কন্যাপক্ষের একজন বলল, বেশ, আপনি কি করতে চান বলুন ?

—একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কথা যখন উঠেছে তখন ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি এবং কতটুকু তা না জেনে কেউ এ অবস্থায় তার ছেলের বিয়ে দিতে পারে না। তাই, যোগেশবাবুও পারেন না। আপনাদের কথাই ধরুন, আপনারা যদি ছেলের সম্বন্ধে এরকম কিছু শুনতেন তাহলে বিনা বিচারে আপনারাই কি সেখানে মেয়ের বিয়ে দিতেন ?

শ্রোতাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বক্তা একবার সকলের মনোভাব লক্ষ্য করে নিলেন। যেন দৃষ্টিতে মেপে নিলেন, তার কথা কতদূর গুরুত্ব পাচ্ছে।

তারপর আবার বললেন, আমি জানি, তা করতেন না। কেননা, বিয়েটা ছেলেখেলা নয়। কাজেই, আমার কথা হচ্ছে, সন্দেহটা মিটিয়ে ফেলা যায় এমন ব্যবস্থা আমাদের অবলম্বন করা উচিত।

এতক্ষণে কন্যাপক্ষের একজন বলল. বেশ, কি ব্যবস্থা আপনাদের সন্তোষজনক হবে, আপনারাই বলুন ? আমরা তো আমাদের যা বলার ছিল তা বলেছি।

বরপক্ষের ভদ্রলোকটি বললেন, সমস্ত ঘটনাটিই যেহেতু অস্বাভাবিক সেহেতু আমার কথা এ প্রসঙ্গে একটু অস্বাভাবিক এবং ক্ষোভের কারণ হতে পারে আপনাদের। তবুও বলছি, আপনাদের ভেতর কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানেন সেই ভদ্রলোকটিকে, যিনি আজকের এই সমস্ত

ঘটনাটি ঘটিয়েছেন। বলুন, কে সেই ভদ্রলোক? কোথায় থাকেন তিনি?

বলেই ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকালেন। লক্ষ্য করলেন, কারো চোখে কোন নীরব জবাবও অন্তত ভেসে ওঠে কিনা।

কন্যাপক্ষের একজন ভীত এবং বেদনার্ত চোখে লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, বিশ্বাস করুন, আমরা কেউ জানি না সেই লোকটিকে। নইলে, আপনারা বলার অনেক আগেই তাকে ধরতুম, জানতে চাইতুম, কেন সে এই জঘন্য চক্রান্ত করেছে। কি তার আসল উদ্দেশ্য।

বরপক্ষের সেই লোকটি তখন বললেন, বেশ, তাই যদি হয়, যদি আপনারা কেউ না-ই চেনেন তো একজন তাঁকে নিশ্চয়ই চেনেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা জানতে চাই।

—কে সে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল কন্যাপক্ষরা।

সমস্ত ঘরটা একটা দারুণ উত্তেজনায় কাঁপছে, যেন কি এক নতুন দুঃসংবাদ শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব সবাই। ঢোক গিলবার পর্যন্ত অবকাশ নেই। একটা বোবা অস্থিরতায় থমথম করছে ঘর। দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামটির শুধু নিয়মিত যান্ত্রিক ধুক্‌ধুকানির আওয়াজটি উপস্থিত সকলের বুকেই একটা অনুরণন তুলে যাচ্ছে।

তারপর একসময় এই কঠিন নীরবতাকে ভেদ করে বরপক্ষের সেই ভদ্রলোক বললেন, তাঁকে আপনারা সবাই জানেন। দুঃখের বিষয়, তবু আমাকেই তাঁর নামটি উচ্চারণ করতে হল বলে। একটু থেমে আবার বললেন, তিনি আজকের সবচেয়ে সম্মানীয় মহিলা—সুতপা দেবী।

নিজের নামটা ওখানে উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সুতপা। উৎকণ্ঠায় আর উদ্বেগে গলাটা শুকিয়ে এল ওর।

অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে কেউ যদি সাপের পিঠে পা দিয়ে ফেলে

তাহলে সে যেমন ভয়ে আঁৎকে ওঠে তেমনি এক আতঙ্কে শিউরে উঠলেন নীরেন্দ্রনাথ। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেই।

মেসোমশাই নন্দলালবাবু বললেন, এ আপনি কি বলছেন শৈলেনবাবু? সুতপা কি করে জানবে, আজ তার এই শুভলগ্নে কে ওর সঙ্গে এমন ঘৃণ্য চক্রান্ত করেছে? যে লোক এরকম বিশ্রী একটা ষড়যন্ত্র করতে পারে সে নিশ্চয়ই ওর বন্ধু নয়।

—ঠিক তাই। আজ সে লোক সুতপা দেবীর বন্ধু নয় নিশ্চয়। কিন্তু একদিন সে নিশ্চয়ই বন্ধু ছিল, একথা খুব সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়।

বরপক্ষের অপর একজন শৈলেনবাবুর যুক্তিকে পুরো সমর্থন জানিয়ে বললেন সে তো ঠিক কথা। একদা বন্ধুত্ব ছিল এবং আজও তার মনে সুতপা দেবী সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ আছে বলেই এ শত্রুতা তিনি করেছেন। এ একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। এ না হয়ে যায় না।

সমস্ত যুক্তিতর্ক জলাঞ্জলি দিয়ে নীরেন্দ্রনাথ ছেলের বাপের হাঁটুটি চেপে ধরে বললেন, আপনি আমায় বাঁচান যোগেশবাবু, আপনি আমায় রক্ষা করুন! আপনি জানেন আমাকে। খুব ভাল করেই জানেন, কোন অন্যায় আমি করিনি। আমি—আমি কারো কোন ক্ষতি করতে চাই না। আপনি আমার বংশটাকে এমন করে অপমান করে যাবেন না।

বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদেই ফেললেন বাবা নীরেন্দ্রনাথ।

নীরেন্দ্রনাথ যোগেশবাবুর বন্ধু। দুজনে একই অফিসে কাজ করছেন। সেই সূত্রেই পরস্পর এই বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল এবং সাদরে গৃহীতও হয়েছিল।

যোগেশবাবু জানেন, নীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভদ্র এবং সৎ প্রকৃতির লোক। অফিসের অনেক লোকের মতই তিনিও নীরেনবাবুর অমায়িক ব্যবহারের প্রীত।

আজকের এই ঘটনাটি তাঁর পক্ষেও বেদনাদায়ক। বন্ধুর দুঃখে

তিনিও বিচলিত। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনিও অসহায় বুঝি।

আর তাছাড়া, এটা এমন একটি ব্যাপার যেখানে কোনরকম ত্রুটি হলে পরিণামে তাঁর সমগ্র পরিবারকে এর জন্য দুর্ভোগ ভুগতে হবে। বিশেষ করে তার ছেলের বাকি জীবনটাই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এর জন্য তখন তাঁকেই শত কৈফিয়ৎ দিতে হবে ছেলের কাছে। বাপ তখন ছেলের বিচারে ঘৃণিত আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবে। তখন আর ছেলের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবেন না তিনি।

সে অবস্থাটা কল্পনা করতে কষ্ট হল যেন তাঁর। মনে মনে বোধহয় শিউরে উঠলেন যোগেশবাবু সে দিনের কথা ভেবে.

তাই বুঝি স্থির গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বললেন নীরেন্দ্রনাথকে আমার অবস্থাটাও বুঝতে চেষ্টা করুন, নীরেনবাবু। আপনি মেয়ের বাবা হিসেবে আপনার যতটুকু দায়িত্ব, ছেলের বাবারও এ ব্যাপারে কিছু কম দায়িত্ব নয়। আপনার মেয়েরও যেমন আমার ছেলেও তেমনি আমাদের সমান আদরের। কাজেই, আমাদের কারো কোন ভুলে ওদের যদি কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে তো সে কাজ করার কোন অধিকার আমাদের নেই।

--কিন্তু আজ যদি আপনারা এ অবস্থায় ফিরে যান তাহলে যে আমাকে আত্মহত্যা করে মান বাঁচাতে হবে। নীরেন্দ্রনাথ ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন.

ছিঃ, ও কি কথা! এ অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। একটা শুভকাজের বাড়িতে ওসব কথা কি কেউ বলে? বন্ধুকে একটু মৃদু ভৎসনা করলেন যোগেশবাবু।

—আর তা ছাড়া আত্মহত্যা করলে আপনার মান কোনরকমেই বাঁচবে না নীরেনবাবু, বরং উল্টে আপনাদের কলঙ্কটাই প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত হবে। নীরেন্দ্রনাথের চিন্তার দুর্বলতাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন শৈলেনবাবু।

তারপর আবার বললেন, তাঁর চাইতে, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো সুতপা দেবীকে একবার ডেকে পাঠান। বলুন, ব্যাপারটি সাধারণভাবে আপত্তিজনক হলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁর একবার আসা উচিত। এ ছাড়া বর্তমান অবস্থায় আর কোন মীমাংসা নেই বলেই আমার মনে হয়। আপনারা কি বলেন? কথার শেষে একটি প্রশ্ন জুড়ে দিলেন শৈলেনবাবু। তাকালেন সবার দিকে।

তাঁর কথাকে কেউ সোচ্চারে সমর্থন করল, কেউ বা নীরবে।

মেসোমশাই নন্দলালবাবু প্রস্তাবটিকে বোধহয় খুব সমর্থনযোগ্য মনে করলেন না।

তাই এবারে তিনিই শৈলেনবাবুর কথার জবাবে বললেন, কিন্তু শৈলেনবাবু, সুতপার কথার ওপরেই কি বিষয়টির মীমাংসা নির্ভর করছে বলে আপনার স্থির বিশ্বাস আছে? আপনারা ডেকে পাঠালে সে এখন আসতে বাধ্যই হবে হয়ত, কিন্তু আপনারা আগে স্থির সিদ্ধান্তে আসুন যে, ওর জবানবন্দীর ওপরই আপনাদের পরবর্তী কর্মপন্থা আপনারা নির্ধারিত করবেন। তখন যদি কোন কারণে ওর কথা আপনাদের সন্তোষজনক না হয় তো ডেকে ওকে দ্বিতীয়বার অপমান করা হবে এবং আপনাদেরও সর্তভঙ্গ হবে। আর একথা ঠিক যে কোন-রকম একটা সন্দেহ মনে জাগলে সে ব্যাপার থেকে আপনারা নিবৃত্ত হতে পারেন, কিন্তু সন্দেহের কারণ প্রমাণিত করার আগে কাউকে অপ-মানিত করার অধিকার কারোরই থাকে না।

একটু থেমে কথায় বেশ একটু ঝোঁক দিয়ে আবার তিনি বললেন, বলুন আপনারা রাজি সুতপার কথার ওপর সিদ্ধান্ত নিতে—? এরপর আপনাদের আর কোন প্রমাণ দরকার হবে না তো? ওর মুখের কথাকেই যথেষ্ট বলে মানতে পারবেন তো? মনে রাখবেন আপনাদের পক্ষে যত সহজভাবে ব্যাপারটিকে নাড়াচাড়া করা সম্ভব আমাদের পক্ষে মোটেই তা নয়। কেননা, আমরা পাত্রীপক্ষ অর্থাৎ বিবাহাদি ব্যাপারে এদেশে আজও আমরা দুর্বলপক্ষ। কাজেই, অবস্থার সুযোগে

যাতে আপনারাও কোন অসম্মানের মধ্যে না পড়েন এবং আমরাও না পড়ি, সেকথা আমাদের খুব ভালভাবে ভেবে দেখা দরকার।

ওপক্ষের শৈলেনবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত যুক্তির অনেক বেড়াজাল তৈরী করেছেন। ওদের তরফ থেকে তিনিই প্রায় সমস্ত ব্যাপারটিকে একটি বিশেষ দিকে এনে ফেলেছেন। কিন্তু এবারে তাঁকেও একটুও বিব্রত বোধ করতে দেখা গেল।

যদিও ঘরে তখন খুব বেশি গরম ছিল না, তবু পকেটের রুমাল বের করে একবার মুখ ও গলা মুছে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে তিনি ঘেমে ওঠা হাতের চেটো ঘষতে লাগলেন।

মনে মনে হয়ত একবার ভেবে নিলেন, মেয়ের মেসো নন্দলালবাবু ঠিক কোন জায়গাটিতে বেশি জোর দিতে চাইছেন এবং কেনই বা তা চাইছেন।

একটু ভেবে নিয়েই শৈলেনবাবু বললেন, যুক্তির দিক থেকে আপনার বক্তব্য সত্যি ভাববার বিষয়। কিন্তু নন্দলালবাবু, যদি মনে করেন বরপক্ষ বলেই আমরা আজ অবস্থার সুযোগ নিচ্ছি, তো নিশ্চয় আমাদের সম্বন্ধে একটু ভুল বিচার করেছেন। কেননা, প্রজাপতির দুটি পক্ষের মধ্যে কোন একটি দুর্বল হলেই সমান ক্ষতিকর, তাতে ওর জীবন বিড়ম্বিত। কাজেই কন্যাপক্ষ বলেই আপনাদের হেয় প্রতিপন্ন করা আমাদের লক্ষ্য নয়। তা যদি হত অনেক আগেই এঁরা চলে যেতে পারতেন। কিন্তু তা ওরা চান না বলেই অর্থাৎ আপনাদের অপমান করতে চান না বলেই দ্বিতীয় কোন পথ খোঁজা হচ্ছিল। তাতে যদি আপনাদের আপত্তি থাকে তো আমাদের করণীয় কিছু নেই।

মোটামুটি নিজের প্রস্তাবটিকে বজায় রেখে শৈলেনবাবু তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। কিন্তু আরো একটি কথা হয়ত বাদ পড়ে গেল ভেবে আবার বললেন, তবে হ্যাঁ, ঐ যে আপনি বলেছেন যে, সুতপা দেবীর কথাই আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে কিনা, ওটা খুবই দামী কথা বলেছেন

কেননা, তাঁর কথা যদি আমরা আদৌ বিশ্বাস না করি তো নিঃসন্দেহে বিষয়টি ঘোরতর লজ্জার কারণ হবে। তাই সে প্রসঙ্গে আমরা আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে, যাকে আমরা চিনি না কিংবা খুবই কম চিনি তাঁর কথায় আমরা অবিশ্বাসও করব না আবার জোর বিশ্বাসে ভরও করব না। আমরা শুধু সমগ্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কথাকে মেলাতে চেষ্টা করব। তাতে যদি ঘটনার জটিলতা কেটে যায় তবে নিশ্চয়ই সর্বান্তঃকরণে আমরা তা মেনে নেব।

কথার শেষে বেশ খানিকটা আন্তরিকতার ঝোঁক এসে গেল যেন। তাতে বরপক্ষের সকলেই নীরবে একটু মাথা ঝাঁকালেন। অর্থাৎ, বড় ভাল বলেছে লোকটি, এমনি এক ধরনের মাথা ঝাঁকুনি।

শৈলেনবাবুর কথার উত্তরে নন্দলালবাবু হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাধা পড়ল।

বাইরে থেকে কে যেন দরজা ধাক্কাচ্ছিল।

নন্দলালবাবুই এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন।

ঘরের ভেতরকার সবাই সেদিকে দৃষ্টি দিল। সবাই যেন কৌতূহলী হয়ে উঠল নতুন কোন সংবাদের জন্য।

নন্দলালবাবু দরজা খুলে দেখলেন সুতপার জ্যাঠতুতো ভাই – বিকাশ বাইরে দাঁড়িয়ে।

জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর, বিকাশ? তুমি হঠাৎ এখানে চলে এলে কেন?

বিকাশ প্রায় হিস্‌হিসিয়ে বলল, কাকাবাবু কোথায়? একবার এদিকে আসতে বলুন।

নন্দলালবাবু নীরেন্দ্রনাথের কানে কানে কি বললেন। নীরেন্দ্রনাথ যোগেশবাবুকে লক্ষ্য করেই বললেন, আমাকে একটু মাপ করবেন। ওদিকে একটু কথা আছে, এক্ষুণি সেরে আসছি।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। তাঁকে যাবার অনুমতি দিলেন যোগেশবাবু। নীরেন্দ্রনাথ ঘরের বাইরে আসতেই বিকাশ বলল, কি আলোচনা

করছেন আপনারা সেই থেকে? এদিকে যে অতিথিরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যাবার জন্য, সেকথা কিছু ভাবছেন? কি বলে ওদের বসিয়ে রাখব বলুন? এটা-সেটা হাজার প্রশ্ন করছে, কিছু বলারও নেই ছাই।

সে যে বেশ বিরক্ত হয়েছে মনে মনে তা তার কথাতেই প্রকাশ পেল।

হওয়াটা স্বাভাবিক। এ অবস্থায় ওদের বলারও তেমন কিছু নেই। দুইপক্ষের কর্তারাই ওপরের ঘরে আলোচনায় ব্যস্ত। তার ফলাফল কিছু না জানলে, অতিথিদেরই বা ওরা কি বলে আটকাবে। এ সবই বোঝেন নীরেন্দ্রনাথ, কিন্তু তিনিই যে কি বলবেন, তাও ভেবে পেলেন না। চিন্তিত মুখে কেবল বললেন, তাই তো কি যে বলি আর কি যে করি আমিও তো কিছু ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না বিকাশ।

—কিন্তু কিছু তো একটা বলতে হবে? আপনাদের ওই কথা কাটাকাটি কখন শেষ হবে, তা কে জানে! কিন্তু ততক্ষণে এরা সবাই যদি চলেই যায় তো কি হবে মিছিমিছি কথা কাটাকাটি করে?

—আঃ! কি, হয়েছে কি বিকাশ? তুমি আবার এসময়ে তর্ক করতে লেগে গেলে? নন্দলালবাবু পেছন থেকে মৃদু ভর্ৎসনায় বিকাশকে শান্ত করতে চাইলেন।

—বলছি কি আর সাধে? সব লোক চলে গেলে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে যে। তখন তো আর কোন পথই থাকবে না।

—সে কি আর আমরা বুঝি না? কিন্তু এদিকে একটা কিছু মীমাংসা না হলে ওদেরই বা বলি কি?

নন্দলালবাবু হতাশ প্রশ্ন করলেন। যেন কোথাও কোন আলো দেখতে পাচ্ছেন না।

তিনজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একসময় বিকাশই বলল, আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? পুরোহিত মশাইকে ডেকে আগে জেনে নিন আজ রাতে আর কোন লগ্ন পরে আছে কিনা। যদি

থাকে তো সবাইকে বলে দেব যে, বিশেষ কোন কারণে আমরা পরের লগ্নে মেয়ের বিয়ে দেব।

—হুম্, কথাটা খুব মন্দ বলেনি বিকাশ, কি বলেন ?

—যে ঝামেলা বেধেছে তা যে খুব সহজে মিটবে তেমন তো কোন লক্ষণ দেখি না। অথচ, অনিশ্চিত সময়ের জন্য এক-বাড়ি লোককে বসিয়েও রাখা যায় না। কাজেই, ওরকম কিছু একটা বলে সময় নিতে পারলে ভালই হয়। কি বলেন আপনি ?

নন্দলালবাবু বিকাশের কথার সারবক্তব্যকে বিস্তারিত করে বোঝালেন নীরেন্দ্রনাথকে।

-তা....হ্যাঁ...খুব মন্দ বলেনি কথাটা। কিন্তু...লগ্ন কি আর আছে ? চিন্তিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন নীরেন্দ্রনাথ।

—দাঁড়ান একটু, দেখছি আমি। বলেই চলে গেল বিকাশ নীচে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুতপা এসবই দেখছিল, শুনছিল।

নীরেন্দ্রনাথ অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে বললেন, উঃ, কি বিপদেই যে পড়েছি ! কিছুই তো আর ভেবে উঠতে পারছি না। কেবলই সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর। কি যে করি ছাই ! উঃ, দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে একেবারে।

একটু নীরবে থেকে আবার খেদোক্তি করলেন, হায় ভগবান ! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে ?

এসব কোন কথাই তিনি আর কাউকেই বলেননি, বলছেন নিজেকে নিজে।

—আচ্ছা নন্দবাবু, সুতপার মাকে একবার জিজ্ঞেস করলে কেমন হয় ? এবারে প্রশ্ন করলেন নন্দলালবাবুকে।

—তা একবার জিজ্ঞেস করতে আপত্তিই বা কি ? নন্দলালবাবু সমর্থন করলেন নীরেন্দ্রনাথকে।

ইতিমধ্যে বিকাশ পুরোহিতমশাইকে নিয়ে উপস্থিত হল।

—কি বিকাশ আছে নাকি আর কোন লগ্ন ? উদ্‌গ্রীব স্বরে প্রশ্ন করলেন নীরেন্দ্রনাথ।

—ঠিক আছে বড় কাকা, লগ্ন আর একটি আছে। তবে সেটা একটু বেশি রাতে। দেখুন তো পুরোহিতমশাই, ঠিক কটায় লগ্ন ?

পুরোহিতমশাই দ্রুত পঞ্জিকার পাতা ওল্‌টাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ এপাতা-সেপাতা করে এক সময় নির্দিষ্ট পাতাটি খুঁজে পেলেন। আর অমনি আঙুল দিয়ে লাইন ঠিক রেখে প্রয়োজনীয় তিথিটিকে খুঁজে বের করলেন।

বললেন, এ্যা, এ্যা, এ্যাই ! এ্যাই ! বৃহস্পতিবার রাত আটটা সাতাশ মিনিট চৌত্রিশ সেকেণ্ড অন্তে প্রথম লগ্ন। আর এর পরেই আছে, কোথায় গেল, এ্যাই যে, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে তিনটা বিয়াল্লিশ মিনিট অন্তে শেষ লগ্ন। উষাকালের প্রাক-মুহূর্তে বিবাহকার্য সম্পন্ন করতে হইবে।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে পুরোহিতমশায়। বিকাশ, তুমি একবার চট করে তোমার কাকিমাকে ডেকে নিয়ে এস তো। বলবে খুব দরকার, আগে যেন একবার দেখে যান।

—যাচ্ছি। বলেই বিকাশ দ্রুত নীচে চলে গেল।

নন্দলালবাবু পুরোহিতমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন, ওতে কোন বিঘ্ন নেই তো পণ্ডিতমশায় ?

— না, না। এ যে শাস্ত্রীয় গণনা, এতে কোন ভ্রান্তি নেই।

— কিন্তু, লোকের মনে তবুও প্রশ্ন থেকে যাবে না তো নন্দবাবু, কেন হঠাৎ নির্ধারিত লগ্ন পিছিয়ে দেওয়া হল ?

চিন্তাকুল প্রশ্ন করলেন নীরেন্দ্রনাথ।

নন্দলালবাবু সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, সে আর এমন কি ! নানা কারণেই লগ্ন পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এ রকম একটা বৃহৎ ব্যাপারে কত রকম অসুবিধাই তো থাকতে পারে। সে নিয়ে কে আর মাথা ঘামাচ্ছে ! ও আপনি কিছু ভাববেন না।

নন্দলালবাবু অবস্থাকে বশে রাখতে চাইলেন।

এরই মধ্যে সুতপার মা এসে হাজির হলেন। সঙ্গে বিকাশও।

নন্দলালবাবু বিকাশকে বললেন বিকাশ, তুমি একটু ওঘরে যাও। ওঁরা আবার অধৈর্য হয়ে না পড়েন।

বিকাশ যাচ্ছিল, নন্দলালবাবুই আবার পেছন থেকে বললেন, হ্যাঁ, দেখ, এমন কিছু এখন ওঁদের বল না যাতে চটে ফটে যেতে পারে। এখন কোন রকম এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ। কাজেই, খুব ভেবে-চিন্তে ওঁদের কথার জবাব দেবে।

—সে আপনি কিছু ভাববেন না। পারতপক্ষে আমি কোন কথাই ওঁদের বলব না।

বিকাশ চলে গেল নির্দেশমত।

বারান্দায় ওঁদের তিনজনের পরামর্শ শুরু হল।

সুতপার মা সুধাদেবী প্রথমেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কি হল শেষ পর্যন্ত তোমাদের কথাবার্তা? কিছু ঠিক করলে?

নীরেন্দ্রনাথ অধৈর্য উত্তর দিলেন। বললেন, করবার আর বাকি কি-ই বা রেখেছ? যা করবার সে তো মা-মেয়েতে করেই বসে আছ। এখন গলায় দেবার মত একটা দড়ি আমায় এনে দাও, মিটে যাক আমার জ্বালা।

নীরেন্দ্রনাথের কথাগুলি অনেকটা গোঙানির মত শোনাচ্ছিল। সুধাদেবীও তেমনি জবাবে বললেন ও, এখন বুঝি যত দোষ আমার? কেন, তুমি ওর বাপ নও? তোমার কোন দায়িত্ব ছিল না? কখনও মুখ ফুটে ওদের বলেছ, ওরে, এটা করিস নে, ওটা করিস নে? চোখ বুজে শিব সেজে বসে থাকলেই সংসার চলে না। মাসে মাসে কিছু টাকা হাতে এনে দিলেই ছেলেমেয়েদের মানুষ করা যায় না ওরা যখন যা চায় তক্ষুণি তা এনে দিয়েছ, কিন্তু একবারও কি জানতে চেয়েছ, ও জিনিস দিয়ে ওরা কি করবে বা করছে? ছেলেমেয়েরা ভাল হবে কি মন্তর দিয়ে?

নানা প্রশ্নে আর অভিযোগে জর্জরিত করে ফেললেন সুধাদেবী নীরেন্দ্রনাথকে।

নীরেন্দ্রনাথও স্ত্রীর কথার জবাবে রুখে বললেন, বলিনি যে সেও তোমারই জন্য বুঝলে শুধু তোমারই জন্যে। বড় সাধ করে না বলেছিলে, নিজের শিক্ষা আর রুচিমত ওদের গড়ে তুলবে! ছেলে-মেয়েদের কি করে শিক্ষা দিতে হয়, তাই তুমি দেখাতে চেয়েছিলে? আজ ভুলে গেছ সেসব কথা? আমাদের পরিবারে কেউ তেমন বেশি লেখাপড়া শিখতে পারেনি, সে নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তুমি করেছ। এমন কি আমাকে কটাক্ষ করতেও তুমি ইতস্ততঃ করনি, মনে নেই সেসব কথা! এখন অবস্থা বেসামাল দেখে উল্টো গীত গাইছ কেন? লজ্জা হয় না নিজের শিক্ষিত নির্বুদ্ধিতায়?

—আঃ! আপনারা আবার এ সময় যদি নিজের নিজের দায়-দায়িত্ব নিয়ে অভিযোগ করতে সুরু করেন তবে তো আরও চমৎকার হবে। নিজেদের কথা বলার এই কি সময়? নন্দলালবাবু অবস্থা বেগতিক দেখে মধ্যস্থতা করলেন। তাঁরাও কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করলেন তাঁর কথায়।

মা আর বাবার মধ্যে বচসা সুরু হতেই সুতপা পা টিপে টিপে নীচে চলে গেল, নিজের ঘরে। মা আর বাবার এই বচসার মূল কারণটা জানে সুতপা। জানে, এখন ওঁরা পরস্পরকে অভিযুক্ত করবেন। একে অন্যের কাঁধে সমস্ত দায়িত্বটুকু ঠেলে দিতে চাইবেন। কারণ, ওঁরা কেউ কারো অন্তরঙ্গ নন। এতকাল একসাথে বাস করেও আত্মীয় হননি ওরা। দুইজনে দুজনই রয়ে গেছে আজও। সুতপা জানে, বিয়ের ব্যাপারে মায়ের মনে একটা আক্ষেপ থেকে গেছে। মায়ের এতটুকুও সায় ছিল না বিয়েতে। বরং প্রচণ্ড আপত্তি। কিন্তু তা তিনি প্রকাশ করতে পারেননি দাদুর ভয়ে।

ঘটনাটুকু সুতপার জানা। বাবা-মার বিয়ের কাহিনী বড় হয়ে সে শুনেছে। সে জানে পারিবারিক কারণেই বিশেষ লেখাপড় শিখতে

পারেননি নীরেন্দ্রনাথ। তবে তাঁর প্রথম যৌবনে চাকরির বাজারে তত দুরবস্থা ছিল না। তাই মোটামুটি একটি ভাল চাকরিই তিনি পেয়েছিলেন। তাছাড়া, তাঁর স্বাস্থ্যটিও সেকালের চাকরিদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাকরিতে উন্নতিও হয়েছিল বেশ।

আর সে কারণেই বোধ করি সুধাদেবীর স্বর্গত পিতা অবিনাশ-চন্দ্রের তাঁকে জামাই হিসেবে পছন্দ হয়েছিল খুব। এ রকম একটা অসম বিয়ের প্রস্তাবে বাড়ির অনেকেই যখন বলেছিল, এ কি করে হয়? ম্যাট্রিকুলেট একটি ছেলের সাথে গ্র্যাজুয়েট মেয়ের বিয়ে! এ যে বিশ্রী ব্যাপার। তাছাড়া, মেয়ের মনই বা কি বলবে এতে?

অবিনাশচন্দ্র ঘোর গর্জনে বলেছিলেন, বলবে আবার কি? এত-গুলি লেখাপড়া শিখেও ও যদি বুঝতে না পারে যে একটা বড় সার্টি-ফিকেটকে কেউ বিয়ে করতে পারে না, তাহলে ওর লেখাপড়া না শেখাই উচিত ছিল। পুরুষমানুষের যা না থাকলে নয়, এ ছেলেটির তা আছে। স্বাস্থ্য আছে শক্তি আছে, কোন কিছুর দায়িত্ব নেবার মত সামর্থ্য আছে। কাজেই তোমাদের ওই ক্লাশ গুণতি শিক্ষার একটু কম-বেশিতে সংসারের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না।

অবিনাশবাবু সেদিন যা বলেছিলেন, কিছু কিছু মানসিক আপত্তি থাকা সত্বেও সবাইকে সেদিন তাঁর কথাই মেনে নিতে হয়েছিল। কারণ অবিনাশবাবু নিজের জীবনেই প্রমাণ করেছিলেন যে, পুরুষ যদি উদ্যোগী হয় এবং কষ্টসহিষ্ণু হয় তাহলে তার উন্নতিতে কেউ বাধা দিতে পারে না।

অবিনাশবাবুর মতে, জীবনের শিক্ষাকে যে গ্রহণ করতে পারে, পুঁথির শিক্ষা দু'পাতা কম হলেও তার কিছু যায়-আসে না। জীবনটাকে সুষ্ঠুভাবে কাটানোর জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন, নতুবা ওটা কিম্ভূত গন্ড-গণ্ডের মতই অবাঞ্ছিত এবং কুৎসিত।

যুক্তি হিসেবে তাঁর সে কথাকে তখন কেউ উড়িয়ে দিতে পারেনি। উপরন্তু বাড়ির লোকেরা জানত যে, অবিনাশবাবুর প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য

করতে চাইলে তার ফল হবে ভীষণ। সবাই জানত, নিজের জিদ বজায় রাখতেই অভ্যস্ত অবিনাশবাবু। তার ব্যতিক্রম সইতে পারেন না তিনি।

অবশ্য তার পরও কথা উঠেছিল, কিন্তু ছেলের রংটাও তো কালো!

অবিনাশবাবু তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, তাতে কি হল? রং ধুয়ে কি জল খাবে সুধা?

গায়ের রং ধুয়ে কেউ জল খায় না, একথা সত্য। কিন্তু তবুও মানুষের মনে রংয়ের প্রীতি থাকে, এ কথাকে তেমন আমল দিতে চাননি অবিনাশবাবু।

তিনি কর্মী পুরুষ এবং বিষয়ী মানুষ, তাই অবশ্য প্রয়োজনের দিক-টাই তিনি যাচাই করে নিয়েছিলেন। অন্যান্য দিকের কথা ভাববার দরকার বোধ করেননি তিনি। কিছু ওজর-আপত্তি থাকা সত্বেও শেষ পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে সেখানেই দিলেন।

সুধাদেবী তখন বাবার মতের বিরোধিতা করার মত সাহস এবং শক্তি খুঁজে পাননি। কাজেই বিনা বাক্যব্যয়ে এবং যথেষ্ট অশ্রুব্যয়ে বাবার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাবার রায়ে মন থেকে সায় দেননি। তাই পরবর্তী জীবনটা বাবা-মা শুধু একটা আপস মীমাংসার মধ্যে কাটিয়ে এসেছে। কোন অন্তরঙ্গতাই বোধকরি সেখানে ছিল না। সেজন্যই হয়ত সময়ে অসময়ে বিরোধের আগুন ঠিকরে বেরোতে চেয়েছে। যেমন আজ, এইমাত্র হল।

সুতপা সাধারণ একটি পোশাক পরে কলকাতার এই অন্ধকার গলিতে একটি পরিচিত দরজায় দ্রুত এবং ঘন-ঘন কড়া নাড়তে লাগল। দরজা খুলল একটু পরেই।

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল সে। এ ঘর তার অনেক দিনের পরিচিত। অতি চেনা সবই। আর ঘরের অন্যান্য আসবাবের মত এ ঘরের বাসিন্দাটিকেও সে চেনে ভালভাবেই। জানে সে, এখন লোকটি এ ঘরে একাই আছে।

সারা রাস্তা একটা দারুণ উত্তেজনা নিয়ে এসেছে সে। তাই ঘরে ঢুকেও হাঁফাচ্ছিল। দরজায় ঠেস দিয়ে প্রথমটা একটু দম নিল সুতপা। তারপর খিল এঁটে দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে ঘরের বাসিন্দাটি দরজা খুলে দিয়ে তার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসেছে। সুতপার এই দারুণ উত্তেজনা আর অস্থিরতার সাথে তার যে বিশেষ কোন যোগ আছে, তা তাকে দেখে কিছুই বোঝা গেল না। যেন সুতপা যে এখন আসবে, এটা তার জানাই ছিল। কাজেই একটা মানসাঙ্কের ফল হুবহু মিলে যাওয়াতে বেশ কিছুটা যেন আত্ম-প্রসাদই পেল সে মনে মনে।

তাই নিরুদ্বিগ্ন আর নিরুত্তাপ কণ্ঠেই বলল, কি ব্যাপার? দাঁড়িয়েই রইলে যে? বস সুতপা, বস।

এখানে, এই নিরিবিলি ঘরটিতে বসে এ লোকটি যে একটা গোটা পরিবারকে নিয়ে কি ভীষণ আর ভয়াবহ কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে, তা যেন খেয়ালই নেই লোকটার। যে জঘন্য কাজ সে করেছে তার গুরুত্বটুকুও যেন সে বোঝে না, এমনি একটা নির্লিপ্ত ভঙ্গী এখনও লোকটার কথায় প্রকাশ পাচ্ছে বলে সুতপার মনে হল। না কি সবটাই ওর ভান তাও যেন বুঝতে পারল না সুতপা। এই ভয় না পাওয়ার ভঙ্গী, এই নির্লিপ্ততার ভঙ্গী সবই যেন ওর ভণিতা।

লোকটির আচরণে এবং কথায় মনে মনে জ্বলে উঠল সুতপা। বলল চিবিয়ে চিবিয়ে, জানো রজত, ভাবতেই অবাক লাগছে যে, তোমার মত একটি কুৎসিত লোকের সঙ্গে কি করে আমি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম! তার চাইতেও বড় কথা তোমার সঙ্গে যে আমার কোনদিন কোন পরিচয় ছিল, একথা ভাবতেই লজ্জায় ঘৃণায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

একটু থেমে আবার বলল, তোমার ঘরে ঢোকার আগে পর্যন্ত মনে মনে ঠিক করেই এসেছিলাম, তোমার কাজের উপযুক্ত শাস্তিই তোমাকে দেব। যে অপমান তুমি আমাকে এবং আমাদের পরিবারকে করেছ তার শতগুণ বেশি অপমান আমি তোমাকে করব। কিন্তু হঠাৎ এখন

মনে হল, তোমাকে অপমান করতে গেলেও সম্মানই দেওয়া হবে। এত নীচ, এত ছোট তুমি যে, তোমাকে অপমান করতেও আমার ঘেন্না হয়। একটু একটু করে সবটুকু বিষ ঢালল সুতপা দুরন্ত আক্রোশে।

প্রত্যুত্তরে রজতও বলল, মাননীয়া সুবচনী আপনার সিনেমা-লব্ধ জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে খুশি হলাম। কিন্তু আপনার এহেন আত্মদর্শন-জনিত জ্ঞানের চে ায়া ঢেকুরটা কি বাড়িতেই তুললেই বেশি ভাল হত না? এখানে আপনার অমন সিনেমা-সংলাপের কদর কে বুঝবে বলুন? অধম ও-রসে বঞ্চিত।

—যাক, নিজেকে চিনেছ তাহলে?

—তা আর চিনব না? সঙ্গ দোষ তো একেই বলে।

—তোমার নির্লজ্জতায় অবাক হয়ে যাচ্ছি, রজত। এখনও তুমি আমাকে অপমান করতে সাহস পাও?

মাননীয়াষু, আপনার নির্বুদ্ধিতায় সত্যি চমৎকৃত হয়েছি। তাই নিজের কথা বা কাজের জন্য লজ্জা পাইনে। আপনি কি মনে কল্লেন, নির্বোধের উক্তিতে যারা লজ্জা পায় তারা মানুষ পদবাচ্য?

—কোনরকম অন্যায় কাজেই যারা লজ্জা পায় না, তোমার মতে তারাই বুঝি সবচেয়ে বড় মানুষ?

– না। রজত দৃঢ়কণ্ঠে বলল।

—তবে? তবে কি তুমি বলতে চাও, কোন অন্যায় তুমি করনি? নিজের সামান্য স্বার্থে একটা পরিবারকে তুমি অপমান করনি? গোটা সমাজের সামনে তাদের মুখে তুমি কালি মাখাওনি?

—উল্টো করে দেখলে তাই দেখায় বটে।

—আর সোজাটা?

—তুমি দেখতে পাবে না।

—তা বটে! অনেক সোজা জিনিসই আমরা দেখতে পাই না। নইলে, অনেক আগেই দেখতে পেতাম তোমার বীভৎস চেহারাটি। যেটা এমনিতে কত সুন্দরভাবেই না সেজে থাকে। অথচ যার ভেতরের

কদর্য চেহারাটা দেখলে যে কোন সুস্থ লোক আতঙ্কে শিউরে উঠবে। মানুষ যে কত বড় শয়তান হতে পারে তা তোমাকে না দেখলে কেউ বুঝবে না, রজত।

রজত একথার জবাবে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হল না। হঠাৎ ঘরের দরজায় কে যেন ঘন-ঘন কড়া নাড়তে লাগল। চমকে উঠল ওরা দুজনেই। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইল একবার। চোখে চোখে কি যেন বুঝে নিতে চাইল। তারপর রজত গিয়ে দরজা খুলে দিল।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল বিকাশ আর সুধা দেবী। ঢুকেই সুধা দেবী বললেন, জানো রজত, এই মুহূর্তে আমি তোমাকে পুলিশে দিতে পারি?

—না, পারেন না। স্থির গম্ভীর জবাব রজতের।

—কি কি বললে? পারি না তোমাকে জেলে দিতে? বেশ তবে দ্যাখ পারি কিনা! বিকাশ, যা তো বাবা একবার থানায়। হতচ্ছাড়াকে এখান থেকেই বেঁধে নিয়ে যাক।

তাঁর একথার পরও বিকাশের নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেল না। সে যেমনি দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই রইল।

রজতও চুপ।

তখন সুধা দেবীই রজতকে লক্ষ্য করে বললেন, কি, কথা বলছ না যে? এখনও ভাল কথায় বলছি, রজত, সুতপার পথ থেকে তুমি সরে দাঁড়াও। নইলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

—ভুল করছেন। আমি মেয়েমানুষ নই, কাজেই জুজুর ভয় পাই না। তাছাড়া, ওটার দরকারই বা কি? আমি তো দূরেই সরে এসেছি, তবে আর কথা কাটাকাটি কেন? আমার কাজ আমি শেষ করেছি, এবার আপনাদের কাজ আপনারা করুন গে।

এবারে হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে সুধা দেবী বললেন, এ রকম বিশ্রী একটা কাজ তুমি কি করে করলে রজত? এতে তোমার কি লাভ

হল? তুমি কি জানো না, সুতপার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না? আমাদের সমাজ তা কোনদিনও মেনে নেবে না? তবু সব জেনে-শুনেও তুমি আমাদের এত বড় ক্ষতি করলে? শত্রুও যা করে না, আত্মীয় হয়ে তুমি তাই করলে?

রজত এবারে মনে মনে কি একটা বোঝাপড়া করে নিল। ওর মানস-চিন্তার ছাপ পড়ল চোখে মুখে। চোখদুটো যেন জ্বল জ্বল করে উঠল। চোয়ালটা শক্ত।

স্পষ্ট উচ্চারণে সে বলল, ক্ষতি আপনাদের কিছু করিনি আমি। শুধু যে সমাজের ভয়ে আপনারা সমাজকেই ফাঁকি দেন কিংবা ঠকান, সেই সমাজের কাছে আপনাদের একটু লজ্জা দিয়েছি মাত্র। আপনারা আপনাদের কৃতকর্মের খানিকটা সাজা পেলেন মাত্র তার বেশি কিছু নয়।

—এর চেয়ে আর কি ক্ষতি তুমি করতে চাও? আজ সুতপার বিয়ে না হলে কাল আমরা একঘরে হব। কেউ কোন সম্পর্ক রাখবে না আমাদের সাথে। ঘৃণিত কোন প্রসঙ্গ উঠলে সবাই আমাদের দিকে দেখাবে আঙুল দিয়ে। সুমিতা নমিতারও বিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে। বল, এর চেয়ে আর কোন সর্বনাশ তুমি করতে চাও? একটা মানুষকে মারলে একটা লোকের ফাঁসি হয়। আর তুমি গোটা পরিবারকে ধ্বংসের মুখ ঠেলে দিচ্ছ! তবু বলছ তুমি কোন ক্ষতিই আমাদের করনি?

—না, করিনি। রজত দৃঢ়কণ্ঠেই জবাব দিল।

—চল মা, ওকে তুমি কিছুই বোঝাতে পারবে না। মানুষই মানুষের কথা এবং ব্যথা বোঝে, অন্য কোন প্রাণী তা পারে না।

ওদের কথার মাঝে হঠাৎ সরোষে কথা বলে ফেলল সুতপা।

—তোমার ঐ অশিক্ষিত চাতুরী তুমি অন্যত্র দেখিও সুতপা, হয় তো হাততালি পাবে। লেখাপড়া যখন খানিকটা শিখেছ তখন অন্তত চেষ্টা

কর খানিকটা বুদ্ধি খাটাতে। পুঁথি মুখস্থ করা আর ধাতস্থ করা যে এক নয়, আজও পর্যন্ত সেটুকু বুঝবার ক্ষমতা হল না ?

—শিক্ষার কথাটা আর না-ই বা তুললে ? ওটা কি তোমার মুখে বড্ড বেশি বেমানান ঠেকে না ?

আবার এক খোঁচা মারল সুতপা।

রজত জ্বলে উঠল মনে মনে, বলল, শোন সুতপা, তোমার যদি সত্যি কোন শিক্ষা থাকত তো লজ্জা পেতে এখানে আসতে। লজ্জা পেতে ঐ বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে। আজ তোমার বিয়ে করার অর্থ বোঝ —এ বিয়ে মোটেই পতিগ্রহণ নয়, পতিতাবৃত্তি গ্রহণ।

হঠাৎ বিকাশ দু' পা এগিয়ে এসে ঠাস করে একটি চড় বসিয়ে দিল রজতের গালে। বলল, স্কাউণ্ড্রেল, যাকে যা নয় তাই বল! তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব, ইডিয়েট —

কথা শেষ করতে পারল না বিকাশ। রজতের এক ঘুষিতে ছিটকে গিয়ে ধাক্কা খেল দেওয়ালে।

টাল সামলে আবার এগিয়ে যাচ্ছিল বিকাশ। রজতও প্রস্তুত রইল। সুধাদেবী চীৎকার করে উঠলেন, রজত!

সুতপা বলল, বিকাশদা। এ তোমরা কি সুরু করলে ?

সুধাদেবী বললেন, ছি, ছি, রজত! তুমি যে এতটা নীচে নামতে পার তা ভাবতেই পারিনি। পারলে কখনই তোমার এখানে আসতাম না। ছিঃ, তুমি নিজের আত্মীয়কে পর্যন্ত এমন কুৎসিতভাবে অপমান করতে পার ? যা একটা বাইরের লোক পর্যন্ত করে না।

একটু আগের ব্যাপারটাতে রজত যথেষ্ট উত্তেজিত হয়েছিল। এর ওপর সুধাদেবীর এই অন্যায় অভিযোগে একেবারে উত্তপ্ত হয়ে উঠল সে। বয়সের এবং আত্মীয়তার কোনরকম সম্মান দেখানোটাকেই তার মনে হল অর্থহীন।

তাই উত্তপ্তকণ্ঠেই রজত বলল, লেখাপড়া শেখার পরও যে মানুষ, বিশেষ করে মেয়েমানুষ কত অশিক্ষিত, আর সেইহেতু সংকীর্ণ হয়

আপনাকে না দেখলে আমি তা কখনও বুঝতাম না। অতটা শিক্ষিত-মূর্খ না হলে আপনি নীচতার প্রশ্ন তুলতে লজ্জা পেতেন। এখন দেখছি, আসলে কোন কুৎসিত ব্যাপারেই লজ্জা পাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। নইলে, লজ্জা পেতেন সামান্য শিক্ষার জন্য স্বামীকে অবহেলা, হয়ত বা অবমাননা করতে। লজ্জা পেতেন, সুতপা নরেন ভট্টাচার্য নামে একটি ছেলের কাছে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও অতি সামান্য কারণে সে প্রস্তাব নাকচ করতে। লজ্জা থাকলে, সুতপা এরপরেও কল্যাণশঙ্কর নামের আর একটি ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে দেখে লজ্জা পেতেন। যদিও সেক্ষেত্রে ছেলেটিই সরে গিয়েছিল দূরে। তারপর তৃতীয় এবং শেষ দফায় আমার সঙ্গে ওর পরিচয়। আর সেই থেকে ভালবাসা। যদিও এমন একটি পরিবেশে আমাদের পরিচয় হয় যে, আমরা আমাদের পূর্ব-সম্পর্কটা কেউ জানতাম না। কিন্তু আমার অপরাধ, একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে জেনেও আমি সরে যেতে চাইনি। কারণ আমি ওটাকে ততটা দোষনীয় মনে করি না যতটা দোষ হয় ওকে ছেড়ে দিলে। আমাদের এই আত্মীয়তার সম্পর্কটা যতক্ষণ আপনিও জানতেন না ততক্ষণ আপনিও খুশি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন আমার সামান্য দাগ-লাগা মেয়েটির যদি কোন গতি হয়ে যায় তো মন্দ কি! অবশ্য অশিক্ষিত চাতুরীতে মেয়ের দাগ ঢাকতেই আপনি সচেষ্ট ছিলেন! জিজ্ঞেস করি, ওসবই কি আপনার উচ্চ মনোভাবের পরিচায়ক?

একটু থেমে আবার রজত বলল, ব্যক্তিবিশেষের কাছে যে অন্যায় আপনি করেছেন তার কোর শাস্তিই আপনাকে পেতে হয়নি। আজ আপনি অশিক্ষিত সাহসে গোটা সমাজটাকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা হতে দিইনি। তাই আজ আমাকে আপনার কুৎসিত মনে হচ্ছে। মাথা আপনার এতই নিরেট যে, আমার ঘরে এসে আমাকে অপমান করার বদলে নিজের বয়স আর আত্মীয়তার দাবীতে সম্মান চাইছেন। আপনার ওরকম অদ্ভুত দাবীর উত্তরে আমি বলতে

বাধ্য হচ্ছি. আমার বাড়ির ঝিটির বয়স আপনার চাইতে বেশি। তাই শুধু বয়সের সম্মান যদি দিতেই হয় তো ওকেই দেব।

—রজতবাবু! গর্জে উঠল বিকাশ।

সমান পাল্লা দিয়ে রজত বলল, অতটা উত্তেজিত হবেন না বিকাশ-বাবু। আমি কিন্তু লোক হিসেবে খুব ভদ্র নই, বৈষ্ণবও নই। অসুবিধা হলে দরজাটা খুলে নেবেন, কিন্তু অযথা চীৎকার করবেন না।

—খুব যে বড় বড় কথা বলছ রজত! তোমার নিজের কাঁধে এরকম একটা বোঝা থাকলে তুমি কি করতে? সমাজকে ডেকে এনে বলতে এই আমার মেয়ে···এই এই করেছে·······অতএব এবারে আপনারা সানন্দে এর বিয়েতে সম্মতি দিন? নিরাপদ এলাকায় বসে সবাই অমন বড় বড় কথা বলতে পারে। সত্যি করে যদি বুঝতে আমাদের অবস্থাটা কি, তাহলে এমন বলতে পারতে না।

—দেখুন, আমার মাথাটা ধরেছে। কাজেই, আর অনর্থক তর্ক করতে পারছি না। তাছাড়া, এর কোন প্রয়োজনও নেই। আমি যা করতে চেয়েছিলাম, তা করেছি। এখন আপনারা যা চান তা করুন গে। এ বিয়ে আপনাদের ভাঙেনি এবং আপনারা না চাইলে ভাঙবেও না। এখন আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন গে।

—তুমি কি বলছ রজত! সুধাদেবী বিস্মিত হলেন রজতের কথায়।

সুতপা আর বিকাশও অবাক হয়ে চেয়ে রইল রজতের দিকে। রজতের কথাকে ওরা কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না।

রজত বলল নিশ্চিত ভঙ্গীতে, ঠিকই বলছি। যে ছেলেটির সঙ্গে সুতপার বিয়ে দিতে যাচ্ছেন সে আমার পরিচিত। এক সময় এক-সঙ্গে পড়েছি। ওঁরা যদি এ বিয়েতে বিশেষ নারাজ হয় তো ছেলের বাবা যোগেশচন্দ্র সেনকে বলবেন, বছর দুয়েক আগে তাঁর ছেলে অসীম সেন কোন একটি বিধবা ভদ্রমহিলাকে নিয়ে নাকি মাসখানেক পুরীতে ছিল। আর সে নিয়ে অনেক কেলেঙ্কারী কাণ্ডই নাকি হয়েছিল। এ

কথায় যদি ওরা প্রতিবাদ করে তো··· দাঁড়ান দেখছি ·· ওদের একটি ফটো ছিল আমার কাছে, সে মহিলাটিও আছেন তাতে · ওটা একবার দেখালেই সব ঠাণ্ডা হবে। তখন বিনা বাক্যব্যয়ে এ বিয়ে তাঁরা দেবে।

তিনটি প্রাণী রজতের কথা শুনে কাঠ হয়ে গেল। যেন অদ্ভূত কোন ভৌতিক গল্প শুনছে ওরা। এমনি হতবাক। কথাগুলি ওরা বিশ্বাস করতে পারছিল না, অবিশ্বাসও না। সবার ওপরে এতবড় একটা নাটকীয় ঘটনার জন্য প্রস্তুতই ছিল না ওরা।

কিন্তু অল্প একটু পরেই রজত যখন ফটোটি বের করে এনে সুধা দেবীর হাতে দিল তখন তিনি সত্যি সত্যিই যেন পাথর হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ঘাড় নীচু করে তিনটি প্রাণী রজতের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিকে একটু দেখে দরজা বন্ধ করে দিল রজত।

২

—কি হল, সুতপা ? এখনও শুয়েই আছিস চুপ করে ? আজ কি যাবি না স্কুলে ? নিজের স্কুলে যাবার প্রস্তুতি প্রায় সেরে নিয়ে ইভা সুতপাকে তাড়া দিল।

নিজের বিছানায় শুয়ে তখনও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল সুতপা। ইভার কথাতেও ওর কোন নড়াচড়ার লক্ষণ প্রকাশ পেল না। যেমন অলস ছাদে শুয়ে ছিল তেমনি রইল।

আজ সকাল থেকেই আকাশটা মেঘলা করে আছে মন খারাপ মেয়ের মুখের মত। বিষণ্ণ। ভার ভার। কি এক অজানা ব্যথায় যেন টনটন করছে মুখটা। সামান্য একটু মেঘ গর্জনে কিংবা বিদ্যুৎ কটাক্ষেই হয়তো কেঁদে ফেলবে আকাশটা। ঝরঝর, অঝোর ধারা বইয়ে দেবে।

দেখে দেখে সুতপার মনটাও কেমন ভার ভার হয়ে উঠেছে। তাই নৈমিত্তিক কাজে কোন উৎসাহই খুঁজে পাচ্ছে না। হাত-পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে থাকতেই ভাল লাগছে ওর।

সুতপাকে একবার তাড়া দিয়েই নিজের শাড়িটার কুঁচিটা ঠিক হয়েছে কিনা দেখে নিল ইভা ঘুরে-ফিরে। কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সর্বত্র ঠিক আছে কিনা শেষবারের মত সেটা দেখে নিয়ে কোমরের ওপরের দিকটা দেখল। শাড়ির আঁচলটা ডান কাঁধের ওপর বড় বেশি ছড়িয়ে আছে বলে মনে হল ওর। তাই সেটাকে আর একটু ভাঁজ করে গুটিয়ে নিল। এতে ওপরের দিকটা একেবারে খোলা থাকে না বটে, কিন্তু উন্নত বুকের আভাষটা স্পষ্টই লোকের চোখে পড়ে। এরকম করে টানটান করে শাড়ি পরতেই ভালবাসে ইভা বোস, ইতিহাসের শিক্ষয়িত্রী।

সুতপাকে তাড়া দিয়েই সে ভেবেছিল সুতপা চটপট তৈরি হয়ে নেবে। কিন্তু ওর শাড়ির ভাঁজ আর ব্লাউজের হাতা ঠিক করে নেবার পরও সুতপা উঠল না দেখে দু পা এগিয়ে ওর কাছে গেল।

বেশ একটু ব্যস্ততার সঙ্গেই বলল, কিরে, তোর হল কি? শরীর খারাপ নাকি? আজ যাবি না?

এবার সুতপা জানালার দিকে তাকিয়েই বলল, না, আজ আর ভাল লাগছে না যেতে।

চিরুণী দিয়ে হাল্‌কা হাতে আর একবার চুল ঠিক করে নিতে নিতে ইভা হাল্‌কা সুরে বলল, ও, মেঘদূতের সাড়া পাওয়া গেছে বুঝি? রামগড়ের কি বার্তা নিয়ে এল? 'পিয়া, আজি যেও না' স্কুলে? এই বার্তা?

দুষ্টুমিতে চোখ দুটো নেচে নেচে উঠল ইভার।

সুতপা এবারে পাশ ফিরল। দেখল ইভার পরিহাসোজ্জ্বল মুখটা। কিন্তু নিজে ঠিক তেমনভাবে যোগ দিতে পারল না। বলল বিষণ্ণ কণ্ঠে, কেমন যেন ভাল লাগছে না যেতে। তুই গিয়ে বলিস সুহাসিনীদিদিকে, আমার শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না।

এতক্ষণ ইভার যে ব্যস্ততা ছিল হঠাৎ যেন সেকথা ভুলে গিয়ে সুতপার খুব কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, সকালবেলা থেকেই লোকটা খুব চেপে ধরেছে বুঝি? না কি কাল রাত থেকেই?

চাপা এক কৌতূহলে ইভার চোখ চক্ চক্ করছিল।

সুতপা একটু গম্ভীর স্বরেই বলল, যা, বড্ড ফাজিল হয়েছিস তো!

—অ, আমি ফাজিল হয়ে গেলাম? সারা রাত কি করেছেন উনি, তার ঠিক নেই। আজ আবার সাত-সকালে উঠে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন তার চিন্তায়। আর তার কথা জিজ্ঞেস করাতে আমি হলাম ফাজিল?

—এখন বুঝি তোর সময় হচ্ছে না?

—সময় আসবে, আবার যাবে। কিন্তু শ্রীমতীর এমন মেজাজ তো সব সময় থাকবে না। আহ্, তুই বল না সুতপা?

বলতে বলতে নিজের হাত দুটোকে অস্থিরভাবে নাড়াতে লাগল ইভা।

সুতপা বলল, কি বলব?

—ঐ যে....এই...এতক্ষণ যার ধ্যানে ছিলি, সে কি কাল রাতে দেখা দিয়েছিল? কেমন দেখতে রে? কি বলল সে? কি করল লোকটা? খুব খারাপ কিছু কি?

আহ্, তুই শুধু ফাজিল-ই নোস, বদমায়েসও হয়েছিস খুব - এখন যা বলছি! নইলে—

ওর কথা শেষ হবার আগেই তড়াক করে একলাফে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে দরজার কোণ থেকে শ্লিপারজোড়াকে পায়ে টেনে নিল ইভা।

তারপর সেদুটোকে পায়ে গলিয়ে বলল, ঠিক আছে, এখন যাচ্ছি। কিন্তু ফিরে এলে বলা চাই। নইলে—

নইলে যে ইভা কি করবে তা কিছুই বলে গেল না। হয়ত এসে আবার সে জ্বালাতন করবে। আবার খোঁচা মেরে জানতে চাইবে সত্যি কোন লোকের জন্য সুতপার মন খারাপ হয়েছে কিনা! যদি হয়ে থাকে তো কেমন সে লোক? কোথায় থাকে? কি করে সে? কতদিনের পরিচয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্নের আর শেষ নেই ইভার। জানবার ইচ্ছাটা কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না।

এইজন্য লোকের কাছে বকুনিও কম খায় না। কিন্তু তাতে ওর তেমন ভ্রূক্ষেপ নেই। একটু বকা-ঝকা না হয় কর, কিন্তু ব্যাপারটা কি তা বল। নইলে যে আমি শান্তি পাই না, এমনি একটা মনোভাব ওর।

হয়ত সবার সব কথা জেনে নিজের কোন একটা হিসেব মেলাতে চায় ইভা। অন্তত সুতপার তাই মনে হয়। মনে হয়, ওরও জীবনের কোন একটা কথা আছে যে কথাটাকে আজও ভালভাবে বুঝে উঠতে

পারেনি। তাই কেবলই এর ওর তার কথা শুনে শুনে মেলায় নিজের কথাটাকে। হয়ত মেলে, হয়ত বা মেলে না। কিন্তু এমনি করেই অনেকের অনেক কথা জেনেছে ইভা। জেনেছে, সরলাদি কেন স্কুলের ছুটিতেও বাড়ি যান না। বাড়িতে শান্তি নেই সরলাদির। স্বস্তিও নেই।

বিয়ে হয়েছে তাঁর বার বছর হল। কিন্তু এতদিনেও কোন ছেলে-পুলে হল না তার। হবেও না।

বিয়ের প্রথম দু'চারটে বছর ভালই কেটেছিল। নতুন এক আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ছিল ওরা। স্বামীর লোহার ব্যবসা। পয়সাও আছে বেশ। তাই প্রথমটায় খুব ফুর্তিতে আমোদে ছুটোছুটি করেছিল ওরা। একমাস হাজারিবাগে, একমাস দার্জিলিংয়ে আবার কিছুদিন পুরীতে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিল। হাসি আর ঠাট্টা, আশা আর উত্তেজনা লেগেই ছিল। মুঠো মুঠো টাকা উড়িয়ে প্রতিটি দিনের আনন্দ কুড়িয়েছে। কিন্তু একটু একটু করে এতে ভাঁটা পড়ল। অবসাদ এল জীবনে।

ওর স্বামী খুব তাড়াতাড়ি সন্তানের জনক হতে চেয়েছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি তো নয়ই, বিয়ের পাঁচটা বছর পরও ওদের কোন সন্তানই এল না। অল্প অল্প করে বিরক্ত হতে লাগল স্বামী। ছুটোছুটি কমল। আর যখন-তখন যেখানে সেখানে যাওয়া নয়। আর কথায় কথায় হাসি নয়। কেমন যেন একটু একটু করে গম্ভীর হয়ে যেতে লাগল লোকটা।

বছর পাঁচেক পরে প্রকাশ্যেই একটু একটু করে কথা কাটাকাটি হতে লাগল স্বামী-স্ত্রীতে। স্বামী ব্যবসায়ী লোক। কথায় রস-কষ তেমন নেই। মনে যা ভাবে মুখে কাঠ কাঠ তাই বলে ফেলে। শুনে সরলাদির চোখ কপালে ওঠে।

বলে কি লোকটা? দোষ কি তার একার? ওর কোন দোষ নেই?

তবুও প্রথমটায় প্রতিবাদ করতেন না সরলাদি। অবাক হয়ে শুধু

চেয়ে থাকতেন। আর ঘৃণায় লজ্জায় এতটুকু হয়ে যেতেন। নিজেকে বড় ছোট মনে হত তাঁর।

লেখাপড়া শিখেছেন তিনি। কোন ভদ্র ব্যক্তি যে নিজের স্ত্রীকে অমন করে বলতে পারে. ভাবতেই পারেননি। এতদিনে তার মনে হল, লোকটার টাকা আছে, শিক্ষা নেই।

কিন্তু সে সত্ত্বেও মানিয়ে চলতে চেষ্টা করলেন তিনি। স্বামীর অভদ্র উক্তির জবাবে নীরবতা দিয়ে শিক্ষা দিতে চাইলেন। তাতে ফল হল না কিছুই। বরং তাঁকে দুর্বল ভেবে বেঁকিয়ে আরও কথা শোনাতে লাগল। অপমানের একশেষ।

একদিন লোকটি একবাক্স সন্দেশ এনে টেবিলের ওপর রাখল। সরলাদি জিজ্ঞেস করলেন, আজ আবার এতগুলো সন্দেশ নিয়ে এলে কেন বল তো?

ফস করে লোকটি বলল, ভয় নেই, তোমার জন্য আনিনি।

সরলাদি অবাক হয়ে বলল, তার মানে?

—মানে আর কি? ঐসব ভালোমন্দ খেয়ে খেয়ে তো কেবলই খাঁজা হচ্ছ, তাছাড়া আর কিছুই তো লাভ হচ্ছে না।

—তুমি না···তুমি একটা অতি অসভ্য পুরুষমানুষ। ভদ্রভাবে 'কথা বলতে পর্যন্ত জান না।

স্ত্রীর কথায় কিছুমাত্র লজ্জা না পেয়ে লোকটি কুৎসিত একরকম হাসি হেসে বলল, তা ঠিক। আমরা কাজের মানুষ, কাজটাই বুঝি আর করি। ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলা আমাদের পোষায় না বাপু, হ্যাঁ।

—তাই বলে গোটা দুনিয়াটাকে তোমার ব্যবসার গদী ভেবেছ নাকি? ঝাঁজালো গলায় প্রশ্ন করলেন সরলাদি।

আবার বললেন, মা-বাপ, স্ত্রী-পুত্র, এদেরও কি তোমার খদ্দের পেয়েছ?

—তা সত্যি কথা বলতে গেলে ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায় বটে।

দুনিয়ার আসল কথাই হচ্ছে দেয়া-নেয়া। মা-বাপই বল আর যা-ই বল, সব শালাই নিজের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিতে ওস্তাদ।

—তুমি শুধু অসভ্যই নও, অত্যন্ত ইতর।

গড়াতে গড়াতে সেদিনই হয়ত চরম একটা কিছু ঘটে যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকটা চুপ করে যাওয়াতে তা আর হল না। কোন রকমে সেদিন টাল সামলে গেল।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সহজ সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন একটা বড় রকমের ফাটল ধরে গেল সেদিনই। এরপর থেকে কথায় কথায় আর নানা টুকিটাকি ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে সেই ফাটলের মুখটা বড় হতে লাগল। একদিন শেষে চরম এক আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল স্বামী আর স্ত্রীর জীবন।

টাকা ছিল লোকটার, কিন্তু মাথার ওপর মা-বাপ কেউ ছিল না। কাজেই, অনায়াসে আর একটি বিয়ে করতে পারত। তাতেও হয়ত সরলাদি আপত্তি করতেন না। দুঃখ পেতেন নিশ্চয়ই, তবু দাঁতে দাঁত চেপে তা সইতে পারতেন। কিন্তু লোকটা তাকে শুধু দুঃখ দিয়েই খুশি হতে পারল না। নিদারুণ অপমান করল তার নারীত্বের। দুর্বল ভেবে চরম সুযোগ নিল লোকটা। নারীত্বের কিংবা মনুষ্যত্বের এত জঘন্যতম অপমান যে কেউ করতে পারে, তা কখনও কল্পনাও করতে পারেননি সরলাদি।

ব্যবসায়ী লোক। বাড়ি ফিরতে যথেষ্ট রাতই হয়। এটা রোজকার নিয়ম। ও নিয়ে এখন আর কোন কথাও তাদের হয় না। সেদিন হঠাৎ সন্ধ্যার দিকেই বাড়ি এল লোকটা। তার এই অসময়ে উপস্থিতিতে একটু অবাকই হলেন সরলাদি। হাতের কাজ রেখে তাড়াতাড়ি ওর জন্য এককাপ চা আর জলখাবার নিয়ে এলেন তিনি।

লোকটা এসেই নিজের জামাকাপড় বদলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সরলাদি যে ঘরে ঢুকেছেন, তা যেন টের পেল না সে।

চা-জলখাবার টেবিলের ওপর রেখে সরলাদি জিজ্ঞেস করলেন ওকে,

কি ব্যাপার? আজ হঠাৎ অসময়ে এলে যে? তার প্রশ্নের তৎক্ষণাৎ কোন জবাব না দিয়ে লোকটা নিজের বেশবাসটা আগে ঠিক করে নিল।

তারপর দেরাজ খুলে একটি বাক্স বের করে নিয়ে টেবিলের সামনে বসল। দু-এক চুমুক চা খেয়ে স্ত্রীর দিকে বাক্সটা এগিয়ে দিয়ে বলল, ছাখ তো জিনিসটা কেমন? সরলাদি দেখলেন হালফ্যাসানের একটি সোনার নেকলেস। অজান্তেই একটু খুশি হয়ে বললেন তিনি, বাঃ চমৎকার ডিজাইনটা তো!

স্ত্রীর খুশিতে স্বামীও উল্লসিত হয়ে বলল, তবে? আজেবাজে একটা জিনিস দিলেই হল? বলেছি যখন ভাল জিনিস দেব তখন ভালই দেব। আমার বাবা, যে কথা সেই কাজ। তুমি আমার পাওনা মিটিয়ে দাও, আমি তোমার চাহিদা মেটাবই। আমার হিসেবে কোন জাল-জোচ্চুরি পাবে না, হ্যাঁ!

নিজের মনেই একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল লোকটা।

সরলাদি হতবুদ্ধি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কার পাওনা?

—কেন, পারুলবালার?

—পারুল····পারুল কে?

একটু যেন সজাগ হয়ে উঠল লোকটা।

বলল, সে তুমি চিনবে না। তবে মেয়েটা ভাল। কথার দাম আছে। বছর না ঘুরতেই···।

লোকটার কথার ইঙ্গিতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন সরলাদি। ঘৃণায় রি-রি করে উঠল তার দেহ-মন। লোকটা যে এতবড় একটা পশু ভাবতেই মনটা কুঁচকে গেল তার।

কিন্তু তার অপমান এখানেই শেষ হয়নি। হল একটু পরেই। যখন লোকটা চা-জলখাবার খেয়ে বাক্সটি পকেটে নিয়ে বেশ হৃষ্ট-চিত্তেই বলতে বলতে ঘর থেকে থেকে বেরিয়ে গেল, বাপ হলাম, ছেলের মুখ দেখার সময় একটা কিছু না দিলে কি ভাল দেখায়! তাছাড়া

পারুলেরও তো একটা পাওনা আছে। সে-সব না মেটালে অধর্ম হবে যে!

বলতে বলতে ধার্মিক স্বামী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর সরলাদি লজ্জায় ঘৃণায় কাঠ হয়ে গেলেন।

সেই থেকে সব শেষ। স্বামীর সংসার ঐ পর্যন্তই।

আর, বাপের বাড়ি অবশ্য তিনি যেতে পারেন, কিন্তু দারুণ এক সঙ্কোচে সেখানেও যান না সরলাদি। তারাও ধীরে ধীরে সব জেনে গেছে যে। কোন্ লজ্জায় আর সেখানে মুখ দেখাবেন তিনি!

তাই গত তিনটে বছরের মধ্যে এই বোর্ডিং ছেড়ে কোথাও যাননি সরলাদি। যাননি যাবার জায়গা নেই বলে।

সরলাদির জীবনের এই কথা যেদিন ইভা বলল সুতপাকে সে দিন রাত্রে ঘুমোতে পারেনি সুতপা। কেমন একটা অস্বস্তিতে সারা রাত ছটফট করেছে সে।

সরলাদি মেয়েমানুষ, সুতপাও। তাই বোধহয় তার ব্যথার কথা শুনে ব্যথা পেয়েছিল সুতপা। ব্যথার সূত্রে দুই নারী আত্মীয় হয়ে উঠে ছিল।

*   *   *

ইভা চলে যাবার পর একটু অলসভাবে গা ছড়াল সুতপা। মাথার বালিশটাকে বুকের কাছে কোনাকুনিভাবে চেপে শুলো। বালিশের এক কোণে মাথা অন্য এক কোণ বুকে চেপে রইল। মুখটা এক পাশে কাৎ।

পাশুঁটে কালো মেঘের এক একটা পাহাড় যেন আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ভেসে যাচ্ছে। বড় ধীর গতি। অনেকটা যেন ভরা পোয়াতি বউয়ের চলন। চলার ইচ্ছে কিংবা শক্তি নেই, তবু চলতে হচ্ছে।

এমন দিনে মানুষকে বড় ভাবুক করে তোলে। মানুষের মনেও নানা ভাবনার স্রোত বয়ে যায়। মেঘলা আকাশের দিকে তাকালে

মানুষের মনও মেঘলা হয়ে যায়। চিন্তার মেঘ। সে মেঘের রংও কখনো ধূসর। কখনো কালো। কখনো বা সাদা পালের মত হাল্কা খুশির মেঘ।

সুতপার মনটাও আজ মেঘে মেঘে ছেয়ে আছে। সরলাদির কথা ভাবতে ভাবতে নিজের ভাবনাটাও হাজির হয়েছে।

জীবনটা কি বিচিত্র গতিতেই না চলে, সুতপা মনে মনে ভাবল, কোথা থেকে যে কি হয়ে যায়, এক মুহূর্ত আগেও মানুষ তা ভাবতে পারে না। অথচ ভাবনার কোন শেষ নেই মানুষের। এ এক আশ্চর্য স্বভাব মানুষের। ভেবে-চিন্তে মাথার ঘাম ঝরিয়েও মানুষ তার জীবনের একটা হিসেব মেলাতে পারে না। তবুও জীবনের ভাবনাও সে ছাড়ে না। আবার নতুন করে অঙ্ক কষতে বসে। যেন মেলা না-মেলার দায়িত্ব তার নেই। সে শুধু ভাবনার জন্যই ভাবে। আর কিছু নয়। হিসেব মিলুক না মিলুক অঙ্ক কষাটাই তার কাজ। আর সারা জীবন-ভর সে তাই করে।

নইলে, সুতপা নিজেও তো ওর জীবনটাকে নিয়ে কম হিসেব-নিকেশ করেনি। কিন্তু কোন্ হিসেবটা ওর মিলল? ওর সব কটা অঙ্কই তো ভুল হল।

—আমার ছাব্বিশ বছরের জীবনটাতে একটা অঙ্ক তাহলে মিলল না।

মনে মনে কথা কটি আবৃত্তি করল সুতপা সেন। নিজের অজান্তেই বুক ঠেলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল ওর। দূর আকাশের বুকে চোখ রেখে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

আজ নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছে ওর। বড় একা। পৃথিবীর সবকিছু থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সে। ওর মনে হচ্ছে, কোন দূর গ্রহ থেকে যেন সে এই পৃথিবীটাকে দেখছে। নিজে সে এ পৃথিবীর কেউ নয়। এখানে কারও সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। কোন বাঁধন নেই মাটির এ পৃথিবীর সঙ্গে।

আর এই নির্বিকার চিন্তার ঘোরে থেকেই অতীত কোন জীবনের স্মৃতির মত ওর মনে নানা ছবি দেখা দিতে লাগল। কত টুকরো টুকরো ছবি। কত বিচিত্র তার রং আর রেখা।

সুতপার মনে হল, ওর নিজের জীবনের নয়, অন্য কোন মেয়ের নানা টুকিটাকি ছবি সে দেখছে। সে মেয়ে সুতপা সেন নয়। তার বয়স ছাব্বিশ নয়। চৌদ্দ বছরের এক উচ্ছল মেয়ে। পিঠে একটা বেণী ঝুলিয়ে নাচতে নাচতে চলে। কারণে অকারণে হাসে সে মেয়ে।

একদিন ওর বাবা নীরেন্দ্রনাথ একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি এলেন। ছেলেটির হাতে একটি রং-চটা টিনের সুটকেশ। বেশ-বাস তেমন ধোপ-দুরস্ত নয়। খুব হাল ফ্যাশানেরও নয়। হাবে-ভাবেও তেমন চালাক-চতুর বলে মনে হল না ওর। তবুও বাইরের একটি ছেলেকে দেখে একটু বিস্মিত এবং একটু সংযত হয়েই রইল মেয়েটি।

নীরেন্দ্রনাথ ওকে দেখে বললেন, ওর নাম নরেন। আমাদের গ্রামেই ওদের বাড়ি। ওর বাবা আমার বিশেষ বন্ধু। তাই ছেলেকে পাঠিয়েছে আমাদের এখানে থেকে টেকনিক্যাল ট্রেনিং নেবার জন্য। বুঝলি বেবী, আজ থেকে ও আমাদের এখানেই থাকবে।

বেবীর তখন অত সব বোঝার দায় নেই। শুধু বুঝল, ছেলেটি এখানে থাকবে। তাতে ওর আপত্তির কিছু ছিল না। তাই বাবার কথায় ঘাড় নাড়ল মাত্র। তার পরই সেখান থেকে চলে গেল মেয়েটি।

ব্যবস্থা বন্দোবস্ত একরকম ভালই হল। ছেলেটি নিজের ঘরে বসে পড়াশুনা করে। সময়মত খাবার খায় আর ট্রেনিং স্কুলে যায়। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে আবার পড়া।

প্রথম কিছুদিন এ নিয়মেই চলল।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে নিয়ম একটু একটু করে বদলাল। পরিচিত হল একে একে সবার সঙ্গে। প্রথম পরিচয়ের লজ্জা ভাঙল একটু একটু করে।

একদিন সকালে চা দিতে গিয়েছিল মেয়েটি। ছেলেটি নিজের কি পড়া করছিল। শব্দ পেয়ে ওর দিকে তাকাল।

কি ভেবে হঠাৎ বলল, তুমি কি পড় খুকী ?

মেয়েটি আপত্তিসূচক ঘাড় বেঁকিয়ে রইল। ছেলেটির কথার কোন জবাবই সে দিল না।

ছেলেটি চায়ের কাপে একটি চুমুক দিয়ে আবার বলল, কি হল, জবাব দিলে না যে ?

এবারে ঝাঁজের সঙ্গে মেয়েটি বেণী ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, দেব না জবাব।

—কেন ?

—আপনি লোক ভাল নন।

—সেকি ? কি করে জানলে ? বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করল ছেলেটি।

—আপনি আমায় খুকী বললেন কেন ?

—তোমার নামই তো তাই। তোমার বাবা-মা বেবী বলেন, আমি বাংলায় খুকী বলেছি, এতে দোষটা কি হল ? ঠিক আছে, এবার থেকে না হয় ইংরেজীতেই বলব।

—না, কিচ্ছু বলতে হবে না আপনাকে।

বলে দুপদাপ করে চলে গিয়েছিল মেয়েটি।

কিন্তু তবুও মেয়েটির সে রাগ থাকেনি। ওই মন্দ ছেলেটির সঙ্গেই ভারি ভাব হয়ে গেল মেয়েটির। যেদিন ছেলেটির একটি গুণের কথা সে জানল।

একদিন ওকে ডেকেই ছেলেটি বলল, একটি মজা দেখবে ?

যেন খুব আগ্রহ নেই এমনিভাবেই মেয়েটি বলল, কি ?

—এখানে এস, দেখাচ্ছি। বলেই ছেলেটি এক প্যাকেট তাস নিয়ে ওকে কয়েকটি ম্যাজিক দেখাল।

কাণ্ড দেখে তাজ্জব মেয়েটা।

—ওমা, কি মজা! আপনি ম্যাজিক জানেন! বলে খুশিতে প্রায় লাফাতে লাগল মেয়েটি।

আর তার পরই ছেলেটিকে চেপে ধরল, ওকে ম্যাজিক শেখানোর জন্য।

বাড়ির সবাইকে ডেকে ডেকে বলল নরেনের ক্ষমতার কথা এবং নিজে সময় সুযোগ পেলেই ওর ঘরে আসত ম্যাজিক শিখতে।

ধীরে ধীরে দু' একটা খেলাও সে শিখে নিল। তখন আর ওকে পায় কে! নিজের বন্ধু-বান্ধবদের দেখাল নিজের কেরামতি। আর গুরু মানল ছেলেটিকে।

তাসের খেলা ছাড়াও অন্য খেলা জানত নরেন। সম্মোহন করতে জানত সে। প্ল্যানচেটও করতে জানত।

কিন্তু ওই সম্মোহনের খেলা খেলতে খেলতে কখন যে মেয়েটি সর্বান্তঃকরণে সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল তা সে টের পায়নি।

টের পেল সেদিন, যেদিন দুপুরের দিকে নির্জন ঘরে ছেলেটির মানসিক ইচ্ছার প্রভাবে মেয়েটি দুই হাতে শক্ত করে ছেলেটিকে চেপে ধরেছিল। আর ছেলেটি প্রবল এক উত্তেজনায় অজস্র চুম্বন করেছিল ওকে।

কিন্তু ঠিক ওই সময়েই একটি তীক্ষ্ণ চীৎকার হওয়াতে ছেলেটি হকচকিয়ে মেয়েটিকে ছেড়ে দেয়।

ঘরের বাইরে থেকে সুধাদেবী গর্জে উঠলেন, খুকী। শিগ্‌গিরি আয় এদিকে। তার পরই সমান তীক্ষ্ণতায় বললেন, নরেন, দরজা খোল।

ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিয়েছিল নরেন। সুধাদেবী এক ঝটকায় মেয়েকে টানতে গিয়ে দেখলেন, শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে খুকীর। ঠাণ্ডা পাথর যেন।

এত বড় একটা ব্যাপারের পরও অবশ্য কোনরকম একটা মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। কারণ বোধকরি এই যে, মেয়েটি তখনও চৌদ্দ

বছরের এবং ছেলেটি উনিশ। তাঁরা ভেবে দেখেছিলেন, নেহাতই অল্প বয়সের একটি ছেলে আর মেয়ের ছেলেমানুষী ওটা। ততটা গুরুত্ব না দিলেও চলে।

নইলে হয়ত নরেনকে সেদিনই তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশে যেতে হত। কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ ওইটুকু ছেলেকে অত বড় একটা কঠিন সাজা দিতে চাইলেন না। একটি ছেলের গোটা ভবিষ্যৎ ওই সামান্য কারণে নষ্ট করতে চাইলেন না তিনি।

সে যাত্রায় তিনি নরেনকে ডেকে কঠিন সুরে শুধু বললেন, নরেন, বুঝে-সুঝে চলতে না পারলে নিজের আখেরটাই শুধু খোয়াবে আর কোন লাভ হবে না, বুঝলে?

নরেনের তখন অতশত বুঝবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। ভয়ে আর ভাবনায় সে কাঠ হয়ে ছিল।

তাই, নীরেন্দ্রনাথের ভৎর্সনার জবাবে সে শুধু ঘাড়টা নাড়ল। আর সুধাদেবী মেয়েকে শাসিয়ে বললেন, আর যদি কখনও দেখি, হয় কথায় নয় কথায় ও ঘরে গিয়ে ঢুকিস তো চুলের মুঠি সব টেনে ছিঁড়ব, মনে থাকে যেন!

মনে ঠিকই ছিল মেয়েটির। কিন্তু বেশীদিন রইল না। তবে তাতেও কোন অঘটন আর ঘটেনি।

কেননা, মায়ের বকুনিটা খুব বেশীদিন মনে না থাকলেও ছেলেটির সম্বন্ধেই একটা ভয় ঢুকে গিয়েছিল মেয়েটির মনে। তাই সহজে সে আর ছেলেটির সামনাসামনি হত না। ওকে দেখলেই কেমন একটা আতঙ্কে শিউরে উঠত মেয়েটি। শরীরটা শক্ত হয়ে যেত এক অজানা আশঙ্কায়।

কিন্তু যাকে নিয়ে ওর এত ভয় তাকে নিয়ে না ভেবেও সে পারত না। একটা অশরীরী ভয়ের ছায়া যেন সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়াত ওর চারপাশে। ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে লাগল মেয়েটা। খাওয়াতেও রুচি কমে এল। বাড়ির লোকের নজরে পড়ল সেটা।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কিরে খুকী, কি হয়েছে তোর ?

ভয়ে তখনও মেয়েটি কিছু বলতে পারল না।

বলল, কই না তো, কিছু হয়নি তো !

—তবে ওরকম ছিরি হচ্ছে কেন দিন দিন ?

—কি আবার হল ? কিছুই হয়নি তো !

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আর চাপা রইল না। সবাই জানল, খুকী ভয় পায় ঐ ছেলেটির যাদুবিদ্যাকে ! ভয় পায়, যাদুকর ছেলেটিকে।

প্রথমটায় সবাই একটু হাসল। তারপর একে একে সবাই বোঝাল, দূর বোকা মেয়ে, ওতে ভয় পাওয়ার কি আছে ? ভীতু মেয়ে কোথাকার ! ম্যাজিক দেখে ভয় পাস তুই ? ওরা কি আর সত্যি-সত্যি কিছু করতে পারে নাকি ? ও সবই তো চালাকি। চোখে ধুলো দেওয়া। তা না হলে ম্যাজিসিয়ানদের সব পুলিশে ধরে নিয়ে যেত না !

পুলিশে ধরত কি-না ভেবে দেখার অত দরকার হয়নি মেয়েটির। ধীরে ধীরে সে নিজেই বুঝল আসলে ব্যাপারটা সত্যি অত ভয় পাবার মত নয়। নইলে নমিতা, সুমিতা ওরাও ভয় পেত ছেলেটিকে। কিন্তু ওরা তো পায়নি।

ধীরে ধীরে নরেন সম্বন্ধে ভয়ের ভাবটা ওর কেটে গেল। কিছুটা বয়সের গুণে আর কিছুটা বুদ্ধির।

অবস্থাটা সামলেই উঠেছিল মেয়েটি। কেননা, ছেলেটিও তখন যথাসাধ্য দূরত্ব বজায় রেখে চলত।

বছর দুয়েক পর নরেন ওর ট্রেনিং শেষ করল। এবারে কোন একটা কাজ খুঁজছে সে। কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই চলে যাবে সে। এবং পেয়েও গেল একটা।

যাবার সময় ওর পক্ষে যা সম্ভব ছিল তা সে উপহার দিল নীরেন্দ্রনাথের পরিবারকে।

বলল, আপনাদের কাছ থেকে যা পেয়েছি তার প্রতিদান দেওয়া

আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর তা আমি করতেও যাচ্ছি না! শুধু যেটুকু না দিলে নিজেই শান্তি পাব না সেটুকুই দিচ্ছি। আর এ প্রতিশ্রুতিও আমি আপনাদের দিচ্ছি যে, জীবনে আর কখনও আমি ম্যাজিক দেখাব না। ও আমি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি। আশা করি, আমার একটা ভুলের কথা আপনারা মনে করে রাখবেন না।

খুশি হয়েছিলেন নীরেন্দ্রনাথ ও সুধাদেবী ছেলেটির কথায়। বলেছিলেন না, না, নরেন। তুমি ওকথা মনেও ভেব না। তখন তো তুমিও ছেলে মানুষই ছিলে? ওরকম এক-আধটু দোষ-ক্রুটি কারই বা না থাকে? ওর জন্য তুমি মনে কিছু কর না। সময় সুযোগ পেলে আসবে আমাদের এখানে।

নরেন অবশ্য আর আসেনি। কিন্তু ওর চিঠি এসেছিল একটা—খুবই দুঃসাহসিক সে চিঠি।

নরেন লিখেছিল সুধাদেবীকে—"আসবার সময় আপনারা অভয় দিয়েছিলেন আমার জীবনের একটা ক্রুটির কথাই শেষ কথা নয়। আপনাদের সেই মানবিক বিচারে খুশি হয়েছিলাম। মানুষের প্রতি বিশ্বাসীও হয়েছি। আর সে বিশ্বাসেই আজ এই চিঠির ভাব ও ভাষা স্পষ্ট করছি। আমার ধারণা, আমাদের আচরণের চাইতেও আচরণের ইচ্ছাটাকে বিচার করতে পারলেই ন্যায় বিচার করা হয়। কেননা, ইচ্ছার টানেই আমরা কোন একটা কাজ করে থাকি। কোন লোকের ন্যায়-অন্যায় বিচার শুধু তার কাজের ওপর নির্ভর করে না। আসলে, লোকটার মানসিক অভিপ্রায় কি ছিল, তাই বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। অর্থাৎ কোন একটি লোক যদি নিজের কোন অক্ষমতায় পরম হংসের ভূমিকাও নেয় তো তাকে প্রশংসা করার কোন হেতুই থাকে না, যদি বোঝা যায়, মনে মনে সে সেই জিনিসটিকেই কামনা করে। ওতে প্রমাণ হয়, লোকটির লোভ আছে কিন্তু ক্ষমতাও নেই, আর সততাও নেই। যদিও দুঃখের বিষয় আমরা আজও প্রকাশ্য আচরণেরই সম্মান দিয়ে থাকি।

তা সে যাই হোক, আপনাকে স্পষ্টই জানাচ্ছি, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো সুতপাকে আমি বিয়ে করতে চাই। কেননা, পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই আমি ওকে ভালবাসি। তখন ছোট ছিলাম, অতটা বুঝিনি। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, সেদিন ওকে সম্মোহন করার পেছনে আমার ভালবাসার ভয়টাই ক্রিয়া করেছে। তখন থেকেই ভয় ছিল যাকে ভালবাসছি শেষ পর্যন্ত তাকে যদি না পাই? তাই ভয়ে-ভাবনায় আগেই ওকে নিজের করে নিতে চেয়েছিলাম। পথটা ভুল ছিল। তাই লজ্জা কুড়িয়েছিলাম।

আমার কথা আমি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে আপনাদের জানালাম, এবারে আপনাদের মতামত জানতে পারলে খুশি হব।

নরেনের সে চিঠির জবাব অবশ্যই সে পেয়েছিল। কিন্তু তাতে সে বোধ করি খুশি হতে পারেনি।

কারণ, সুধাদেবী দুই ছত্রে শুধু লিখেছিলেন, তোমার জ্ঞানগর্ভ চিঠিটি পড়ে খুশি হলাম। আরও খুশি হব, যেদিন তুমি বুঝতে পারবে যে, ভিখিরীর হাতে মোহর তুলে দেওয়াকে আর যাই বলুক মহত্বও বলে না, উদারতাও নয়। তা সে নিজের ইচ্ছার যত বহরই দেখাক না কেন?

ব্যস, শেষ হয়ে গেল নরেন-পর্ব।

অপমানেই হোক আর ঘৃণাতেই হোক, আর কোন যোগাযোগ সে রাখেনি, এ বাড়ির সঙ্গে।

আর যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে মেয়েটি তখন ওসব ব্যাপারের অনেক কিছুই বুঝল না। যদিও মেয়েটির বয়স তখন ষোল। কিন্তু তবুও সে তখন তার মায়ের অতি আদরের বেবী হয়েই রইল। জীবন সম্বন্ধে তার তখনও কতকগুলি আবছা কল্পনা আছে মাত্র। কোন স্পষ্ট রূপ সে দেখতে পেত না। হয়ত সে দেখতে পেত না। হয়ত চাইতও না দেখতে।

তা যদি চাইত তো আজ এই মেঘলা সকালে একা ঘরে শুয়ে নানা

দুর্ভাবনার জাল বুনতে হত না সুতপাকে। হয়ত সহজ একটা জীবনের আনন্দই সে পেত।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল সুতপার বুক থেকে।

আজ সুতপার মনে হচ্ছে, সেদিন নরেন-প্রসঙ্গে ওরও একটা দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তা সে পালন করেনি। সেদিন মার ইচ্ছাকেই সে শুধু দাম দিয়েছে। হয়ত মার ইচ্ছাটাই ওর ইচ্ছা হয়েছিল। একটু হাল-ফ্যাশানের মেয়ে হবার ইচ্ছা। একটু বাড়াবাড়ি রকমের শহুরে হবার ইচ্ছা। একটু রং আর জৌলুসকে নিয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছা।

আজ সুতপা স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ওর মা হালের শিক্ষার খবর পায়নি। সে শুধু জানত, তার মেয়েরা সবাই ভাল লেখা-পড়া শিখবে। ভাল জামা-কাপড় পরবে। বড় ঘরে বিয়ে দেওয়াটাও তাহলে সহজ হবে।

কিন্তু ওর মা জানত না, ভাল ঘর আর বড় ঘর এক নয়। তার ধারণা, বড় লোকই ভাল লোক। আর উচ্চশিক্ষা পেলেই লোক ভাল হয়।

তাই বড়লোকের ছেলে কল্যাণশঙ্করকে প্রথম থেকেই মার বড় পছন্দ। তাকে দেখেই মনে মনে কি যেন একটা হিসেব ঠিক করে নিয়েছিল ওর মা। কল্যাণের দামী পোশাক আর গৌরকান্তি দেখেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সুধাদেবী।

প্রথম যেদিন কল্যাণ ওদের বাড়িতে এল সেদিনই খুব খাতির-যত্ন করে ওকে বসালেন সুধাদেবী।

বললেন, তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না?

সুতপার সঙ্গে যায়নি কল্যাণ। একাই গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। অবশ্য ব্যবস্থাটা সুতপাই করে দিয়েছিল। সে খবর জানতেন না সুধা-দেবী।

কল্যাণশঙ্কর তাঁর প্রশ্নে একগাল হেসে বলল, আমাকে আপনি

চিনবেন কি করে মাসীমা! আমি আপনার মেয়ের সঙ্গে এক কলেজে পড়ি।

—ও, তাই বুঝি! তা বেবী তো কই আমায় কিছু বলেনি!

—এতে বলার কিছু নেই বলেই বলেনি। উনিও তো আমাকে ঠিক চেনেন না। আমি-ই নিজের গরজে আপনাদের চিনে নিলাম।

—তা বেশ করেছ। থাক কোথায়? আর কোন্ গরজেই বা এলে?

—আপনাদের পাড়াতেই থাকি। ঐ রাস্তার মোড়ে, এই কেশব বসু লেনের মোড়ে যে চারতলা বাড়িটা, ওটাই আমাদের বাড়ি। কিন্তু কথা দিন মাসীমা, আমার আজকের অনুরোধটা আপনি রাখবেন। এই আপনাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, নিশ্চয় খুব অন্যায় কিছু অনুরোধ করব না।

বেশ গুছিয়ে নিয়েছিল কল্যাণশঙ্কর তার কথার ভাঁজে।

তাই কিছুটা ভদ্রতা আর কিছুটা বা অন্য কোন কারণে সুধাদেবী ছেলেটিকে আশাহত করতে চাইলেন না।

বললেন, আহা, বলই না কি কথা?

কথার উচ্চারণে একটা প্রশ্রয়ের সুর প্রকাশ পেল।

কল্যাণ তখন বলল, দেখুন, ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়। আমাদের কলেজ সোশ্যালে আপনার মেয়ে যদি দুটো গান বাজায় তো সত্যি আমরা খুশি হব। ওকে এসব কথা কিছু বলিনি। জানি আপনাকে বললেই ওকেও বলা হবে। বলুন, তাই কিনা?

বক্তব্যের শেষে এমনভাবে প্রশ্নটাকে জুড়ে দিল শঙ্কর যে, সুধাদেবী মাতৃত্বের গৌরবে বেশ একটু গর্বিত বোধ করলেন

বললেন, সে তো ঠিকই। আমাদের না জানিয়ে মেয়েরা তো আমার কিছু করে না। আজকালকার মেয়েদের মত বেপরোয়া শিক্ষা ওরা পায়নি। সাহসই পায় না আমাদের কথার বিরুদ্ধে কিছু করতে বা বলতে। তা তুমি যখন বলছ অত করে তখন যাবে খুকী। আমি

অবশ্য মানাই করে দিয়েছিলাম ফাংশান-টাংশানে বাজাতে। ওতে একাগ্রতা নষ্ট হয়। তাছাড়া খুকীর বাবাও বলে সস্তায় হাততালি পেলে আসল জিনিস কিছুই শিখতে পারবে না।

শঙ্করও যতদূর সম্ভব বিনীত কণ্ঠে বলেছে, খুব দামী কথা বলেছেন মেসোমশাই। ওটাই প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে পথ ভুল করিয়ে দিচ্ছে। কি যে সে শিখতে যাচ্ছিল আর কি যে শিখেছে, সে হিসাব সে আর কোনদিন ঠিক করতে পারে না। তাই ডুবেও যায় মাঝপথে।

এমনি নানা কথার পর চা-খাবার খেয়ে এবং সুতপার প্রোগ্রামের কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে শঙ্কর যখন ভাল মানুষের মত বাইরে বেরিয়ে এল তখন দেখে বাড়ির গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সুতপা।

শঙ্করকে দেখেই চাপা একটু হেসে সে বলল, উঃ, মিছে কথাও তুমি বলতে পার?

শঙ্করও একটু হেসেই বলল, পারি। তবে সবার জন্যে নয়।

—বাজে কথা। আসলে মিথ্যে বলতে তুমি ওস্তাদ।

--কি রকম?

মনে নেই, আমাকে প্রথমে কি বলেছিলে?

—কি? যেন কিছুই জানে না, এমনি ভঙ্গীতে বলল শঙ্কর।

—থাক। আর শুনে কাজ নেই। হ্যাঁ, শোন, কাল কিন্তু আমি ক্লাশ ফেলে তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। এমনি করে ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে আমার।

—তার জন্য দুঃখ কি? সব ক্ষতির ওপর যে লাভ তা তো হবে?

--লাভ না হাতি! কপট ঝাঁজের সুরে সুতপা বলল।

—And sincerely its love……my……

—থাক, আর নাটক করতে হবে না।

পায়ে পায়ে বেশ খানিকটা চলে এসেছিল সুতপা। এখন হঠাৎ বলল, তাহলে এখন আমি যাই, উ?

চলে এসেছিল সুতপা। শঙ্করও চলে গিয়েছিল। সুতপার

অভিযোগটা মিথ্যা নয়। প্রথম পরিচয়েই ওকেও মিথ্যা বলেছিল শঙ্কর। যদিও সে মিথ্যা তেমন ক্ষতিকর নয়।

সুতপাকে দেখছিল অনেকদিন থেকেই, কিন্তু পরিচয় করার মত কোন সুযোগ পাচ্ছিল না। একদিন তারপর সে নিজেই একটা সুযোগ সৃষ্টি করে নিল।

কলেজের বারান্দায় একদিন সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পড়ল কল্যাণ-শঙ্কর। হাত জোড় করে বলল, নমস্কার সুতপা দেবী!

আচমকা সামনে একটি লোক দেখে এবং নিজের নামটা শুনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সুতপা। হকচকিয়ে গিয়ে প্রতি-নমস্কার করতেও ভুলে গেল সে।

শঙ্করই তখন সপ্রতিভভাবে বলল, অনেকগুলো দিন তো গা ঢাকা দিয়ে বেড়ালেন। কিন্তু এবারে আর পারলেন না, ধরা পড়ে গেলেন।

মনে মনে একটু বিরক্তই হল সুতপা শঙ্করের কথায়। ছেলেটাকে বড় বিশ্রী রকমের বেয়াড়া বলে মনে হল ওর।

তাই একটু কঠিন সুরেই বলল, কি বলতে চাইছেন আপনি? বলতে হয় স্পষ্ট করে বলুন। নয়ত পথ ছাড়ুন। আমার এখন ক্লাশ আছে।

—বাঃ, আপনি তো বেশ সহজেই চটে যান দেখছি! কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হয়ে শঙ্কর বলল।

—অসভ্যতা সহ্য করবার ক্ষমতা তো সকলের থাকে না। বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গেই বলল সুতপা।

শঙ্কর কিন্তু ওর এই শ্লেষোক্তিতে চটল না। বরং আশ্চর্য ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমি দুঃখিত যে আপনি চটে গেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনাকে চটাবার জন্য আমি কিছু বলিনি। আমি বলছিলাম···

—বলুন!

সুতপা বোধ করি নিজের ব্যবহারে একটু লজ্জিত হয়েছিল।

—বলছিলাম যে……আপনি এত সুন্দর গীটার জানেন তো আমাদের কলেজ-ফাংশনে বাজান না কেন? এর মধ্যে দুটো-তিনটে ফাংশান তো আমাদের হয়ে গেল, কোনটাতেই তো আপনি বাজালেন না!

—ও, এই কথা! একটু আশ্বস্ত হল সুতপা। বলল, তা আমি যে গীটার জানি, একথা কে বলল আপনাকে?

—সাক্ষীর কোন প্রয়োজন আছে কি?

শঙ্কর পাল্টা-প্রশ্ন করল।

—তবু শুনি। কৌতূহলী জবাব সুতপার।

—যদি বলি, নিজের কানে শুনেছি? শঙ্করের রাখ-ঢাক কথা।

—অসম্ভব। নিশ্চিত অবিশ্বাস মেশান জবাব সুতপার।

—তাহলে যদি বলি, আপনার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেছে!

—কে?

—নেহাতই নামটা না জানলে যদি বিশ্বাস না-ই করেন, তবে বলি, তার নাম মালা মুখার্জী।

কথা বলার সময় মনে মনে বোধ হয় হাসছিল শঙ্কর। আর তীব্র নজর রাখছিল সুতপার মুখের ওপর।

মালা সত্যি সুতপার আন্তরিক বন্ধু। ওরা দুজনে দুজনার অনেক কথাই জানে। মনে মনে মালাকে সহস্র গালাগাল দিল সুতপা ওর এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য।

—কি, এবার বিশ্বাস হল তো? নিঃশংসয় হতে চাইল শঙ্কর।

ওর একথার কোন জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না সুতপার। তাই সে চুপ করেই রইল।

একটু পরে শঙ্কর বলল, আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে তাহলে যোগ দেওয়া চাই কিন্তু!

এমনভাবে কথাটা বলল শঙ্কর যেন এবারে আর না বাজানো কোনরকমেই চলবে না। যেন এতকাল যে সুতপা কোন অংশ নেয়নি এটাই রীতিমত একটা অপরাধ। আজ যখন সে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে তখন আর 'না' বললে চলবে না কোনমতেই।

হ্যাঁ-না কিছুই না বলে সুতপা চলে গেল।

আর শঙ্কর মনে মনে একটা পরিতৃপ্তির হাসি হাসল। ওর চালটা মোটেই ধরতে পারেনি মেয়েটা। একটু কৌশলী চাল দিতেই ধরা পড়ে গেল। অথচ জানতে পারল না, মালা মোটেই কল্যাণশঙ্করকে সুতপার সম্বন্ধে কোন কথা বলেনি। বলেছিল মালার নাম করে একটি ছেলে। সে এও বলেছিল, মালার নাম করে বলিস কথাটা। তাহলে আর অস্বীকার করতে পারবে না।

ঠিক তাই হল। প্রথম চালেই জিতে গেল শঙ্কর। পরে অবশ্য নিজেই সেকথা বলেছে ওকে!

বাড়ির পথে যেতে যেতে শঙ্কর ভাবছিল, সুতপা কি জানে, স্থান এবং পাত্র বিশেষে মিথ্যাও কত সুন্দর! ঐটুকু মিথ্যা যদি সে সেদিন না বলত তো অনেক কিছুই বাদ পড়ে যেত তার জীবনে।

একটি মেয়ের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হত সে। ফাল্গুনী সন্ধ্যায় কিংবা শরতের দুপুরে একটি নিঃসম্পর্কীয় ছেলে আর একটি মেয়ের খেয়াল খুশিমত ঘুরে বেড়ানর যে কি স্বাদ তাই হয়ত কোনদিন জানত না সে। জানত না, কেমন করে একটি ভাল-লাগার মেয়ে ভালবাসার মেয়েতে রূপান্তরিত হয়। ভালবাসার দুরন্তপনা যে কি বস্তু তা কোনদিনই বুঝতে পারত না সে।

* * *

উঃ, কি কাণ্ডটাই না ওরা করেছে সে সময়টাতে!

আজ এতদিন পর, সেসব কথা ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যায় সুতপা। আজ ওর কেবলই মনে হচ্ছে, কল্যাণশঙ্কর ওর জীবনে একটা

ঝটিকার মত উপস্থিত হয়েছিল। প্রথমে নজরেই পড়ে না এমনি ছোট আর বিনীত এক টুকরো মেঘ দেখা যায় আকাশের কোন এক কোণে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সে মেঘের টুকরোটা। তারপর সুযোগ বুঝে একেবারে হুড়মুড় দুড়দাড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্ত পৃথিবীর বুকে। সহস্র হাতে একেবারে তছনছ করে দিতে চায় নিরীহ ধরিত্রীকে।

শঙ্কর নিশ্চয়ই ওর জীবনে সেই ঈশান কোণের মেঘ, আজ সুতপার চিন্তায় একথা সুস্পষ্ট ধরা পড়ল। নইলে, সে নিজে তো কত চেষ্টাই করেছে স্থির থাকতে। শান্ত সংযত থাকতেই চেয়েছে সে।

কিন্তু পারল কই? ওর সব চেষ্টাই তো নিষ্ফল হল।

শঙ্করের দুরন্তপনার দাপটে ওর সব চেষ্টাই তো ব্যর্থ হল শেষ পর্যন্ত।

প্রথমটায় কলেজের অফ পিরিয়ডে দু' চারটে কথাবার্তা। দিনে দিনে সেটা বেড়ে গোটা পিরিয়ডগুলিই অফ হতে লাগল। কলেজ কম্পাউণ্ডটাকে মনে হতে লাগল একটা দুস্তর বাধা।

শঙ্কর বলত, ধুত্তোর ছাই, কলেজে পড়ে লোকে উদার হবে কি! ওটা নিজেই তো অনুদার, সংকীর্ণ। এখানে পড়ে কেউ মানুষ হতে পারে!

শঙ্করের বিরক্তির কারণটা বুঝতে পারত সুতপা, এবং ওর বিরক্তিতে খানিকটা খুশি হয়েই বলত, তাই বুঝি?

বলতে বলতে ঠোঁট চেপে হাসত সে।

আর শঙ্কর গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলত, তা নয়। আচ্ছা, তুমিই বল তো, সীমিত পরিসরে কি অসীমের শিক্ষালাভ করা যায়?

নিজের বক্তব্যকে নিজেই সমর্থন করে বলত, যায় না। বুঝলে, তা কোনমতেই যায় না। তাই তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষায়তনকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

নিজের আবেগে তন্ময় হয়েই বলছিল শঙ্কর। তাই ওর কথার ফাঁকটা নজরে পড়েনি। সেটুকু ধরিয়ে দিল সুতপা।

বলল, সেখানেও তো একটা সীমানা আছে, শঙ্কর।

নিজের গোঁ ধরেই শঙ্কর বলল, থাকলেও সেটা এমন নয়। কিন্তু এমন না হলেও কেমন যে সে সীমানা সেকথা কিছু বলল না শঙ্কর।

তবে সুতপা মোটের ওপর বুঝল, শঙ্কর আসলে এখন কোন কিছুরই সীমা মানতে চায় না।

প্রতিদিন নানা অজুহাত নিয়ে সে উপস্থিত হত। আর একবার দুজনে কলেজ কম্পাউণ্ডের বাইরে যেতে পারলেই ওর হাতে-নাতে স্বর্গলাভ হত। সময়ের হিসাব নেই। পথেরও কোন দিশা নেই। চলেছে তো চলেইছে। মাঝে মাঝে সুতপা বলত, এমনি করেই কি দিন যাবে?

—কিছু না করলেও দিন যায়। কাজেই কিছু করেই দিন কাটানোটা বুদ্ধিমানের লক্ষণ। চটপট জবাব দিত শঙ্কর।

—এর মানে বুঝি কিছু করা?

—তবে? পাল্‌টা-প্রশ্ন শঙ্করের

—এর মানে, গোল্লায় যাওয়া, বুঝেছ বুদ্ধিমান? সুতপার কথার ঢংয়ে বেশ একটু মুরুব্বিয়ানার প্রকাশ।

—বুঝেছি এবং খুশিও হয়েছি। ছোটবেলা থেকেই সবাই বলত, ছেলেটা গোল্লায় যাবে। তখন মানে বুঝতাম না, তাই ভয় পেতাম। কিন্তু আজ হলফ করে বলতে পারি গোল্লায় যাওয়ার পথে যে সুখ আমি পাচ্ছি তা ছেড়ে সগ্‌গেও যেতে চাই না।

সুখ অবশ্য খানিকটা পেয়েওছিল শঙ্কর। এবং সুতপাও।

পরিণত বয়সের একটি ছেলে আর মেয়ের একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে বসে সিনামা দেখায় আনন্দ আছে। পরস্পরের দেহের সামান্যতম ছোঁয়াছুঁয়িতেও দেহে-মনে কি দারুণ রোমাঞ্চের সৃষ্টি হয় তা বুঝেছিল সুতপা।

কিংবা ওসব কিছু নয়। দেহের ছোঁয়া না হলেও নানা অদ্ভুত মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় মনে। কখন কখন, সুতপা এখন স্পষ্টই মনে করতে পারছে, দুটি শরীরের যথেষ্ট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র

শঙ্করের কোন একটি কথায় কি ভীষণ রোমাঞ্চিত হত ওর মন। সারা শরীরটাতে একটা রিমঝিম রিমঝিম আওয়াজ তুলে যেত সেই শব্দ। অথচ, কি সাধারণ শব্দই না সেগুলি ছিল!

শঙ্কর হয়ত তা খেয়াল করত না, নিজের আবেগেই বলে যেত সে। আর সুতপা চুপ করে কান পেতে তা শুনত।

কিন্তু ওই একটি বা দুটি কথাই। তার বেশি আর নয়। শঙ্কর অবশ্য এক-একসময় অনর্গল কথা বলে যেত। তবে সুতপা তার পরের আর কোন কথাই হয়ত শুনতে পেত না। সে তখন ওই দুটি-একটি শব্দকেই মনে মনে নাড়াচাড়া করত। ছোট শিশু যেমন করে প্রিয় খাদ্যটি খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে খায়, তেমনি সুতপাও শব্দ চুষে চুষে কি এক রস পেত।

আজ সুতপার মনে হচ্ছে, ওটাই ছিল ওর রোগ। ওই রোগেই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল কল্যাণশঙ্কর। সে চাইত সমগ্রভাবে জীবনের উপভোগ। হাতের কাছে যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে সেটুকুকে হেলায় হারাতে সে রাজি নয়। আর ওই নিয়েই প্রথম বিরোধ বাধল ওদের মধ্যে।

একদিন কোন একটা সিনেমা দেখতে গিয়েই সুতপা প্রথম টের পেল। শঙ্করের লোভটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে সামান্য অন্ধকারের সুযোগে। ওর লোভী হাতটার বেয়াড়া গতিবিধিতে বিরক্ত হল সুতপা। প্রথমেই কিছু না বলে নিজেকেই একটু গুটিয়ে নিল সে। পর্দায় মন-সংযোগ করতে চাইল নতুন করে।

কিছুক্ষণ সংযত হয়েই রইল কল্যাণশঙ্কর। যেন গভীর মনযোগে সিনেমা দেখছে। কিন্তু সে খুবই সামান্য সময়। ওর অশান্ত স্বভাবই ওকে আবার অস্থির করে তুলল। আবার সেই একপাশের হাতলে ভর দেওয়া। আবার একটু কাৎ হয়ে বসা। হাত দুটোর অস্থির গতি।

আঃ, চুপ করে বসে দেখ না! অত ছটফট করছ কেন? এবারে প্রকাশ্যেই বলল সুতপা।

আর ওই আবছা অন্ধকারে স্পষ্টই দেখল সুতপা, শঙ্করের মুখটা কেমন যেন কাঁচুমাচু হয়ে গেল। আশ্বস্ত হল সুতপা।

এবারে হয়ত আর ওকে বিরক্ত করতে সাহস পাবে না লোকটা। তাছাড়া নিজের অবস্থাটাও বুঝতে শিখবে।

কিন্তু কিছুই হল না। একটু বাদেই যে কে সেই। বিশ্রী ক্লেদাক্ত হয়ে গেল সুতপার মনটা। কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করে উঠল ওর। মনে হল ছেলেটা শুধু অশান্তই নয়, অসংযত এবং অসভ্যও বটে।

ছবির বিরতির সাথে সাথেই সীট ছেড়ে উঠে পড়ল সুতপা।

শঙ্কর অবাক।

বলল, কোথায় যাচ্ছ ?

—বাড়ি চল। ভাল লাগছে না ছবিটা।

—সে কি ? এখন চলে গেলে লোকেরা কি ভাববে ?

—কিছু ভাববে না, চল। বলেই এগুতে লাগল সে।

আবার বলল, আমি একাই বাড়ি যেতে পারব, তুমি না হয় দেখেই এস পুরোটা।

—নাঃ, থাক। চল, আমিও যাচ্ছি।

আর কোন কথা না বলে দুজনেই বেরিয়ে এল হল থেকে।

পথে বেরিয়েই শঙ্কর একটা সিগারেট ধরাল। অনেকক্ষণ নেশা করা হয়নি। তাই পর-পর কয়েকটা লম্বা টান দিল সে। তারপর ধীরে ধীরে অল্প একটু ধোঁয়া মুখে নিয়ে ছাড়তে লাগল। ঘাড় নীচু করে পথ চলছিল শঙ্কর। হয়ত মনে মনে কোন একটা চিন্তাকে ভাঁজ করে নিচ্ছিল।

অবশেষে সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে জড়িয়ে বলল, তুমি কি সত্যিই খুব রাগ করেছ, সুতপা ?

সুতপা চুপ করেই পথ চলতে লাগল। ওর কথার কোন জবাব দিল না। হয়ত জবাব দিতে গেলেই কতগুলো কথা কাটাকাটি করতে

হবে, এই ভেবে নীরব রইল সে। কিংবা অপ্রিয় প্রসঙ্গটা আপাততঃ আর তুলতে চায় না বলেই মুখ বুজে চলছিল সে।

একটু পরে শঙ্করই আবার বলল, মানুষের সব কটি আচরণই সুন্দর হয় না সুতপা। আশা করি সেকথা তুমি মানবে।

সুতপাকে নয়, নিজের কাছেই আচরণের একটি কৈফিয়ৎ দিচ্ছিল যেন কল্যাণশঙ্কর।

কিন্তু তার ফল বিশেষ কিছু হল না। সুতপা সেদিন সারাটা পথ আর কোন কথাই বলল না। সে নীরবতা দিয়েই বুঝিয়ে দিল যে, শঙ্করের আচরণ সেদিন ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হয়েছিল।

ও ঘটনার পর শঙ্করের তরফ থেকে সিনেমা দেখার নিমন্ত্রণকে কয়েকবার অগ্রাহ্যও করল সুতপা। কোন-না-কোন অজুহাতে সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হত।

শঙ্কর রাগ করত মনে মনে। অপমানিতও বোধ করত। কিন্তু তবুও সুতপার ওপর ওর তখনও বিশেষ কোন অধিকারই ছিল না বলে বাধ্য হয়েই সে অপমান সে সহ্য করত।

মাঝে মাঝে বলত, ঠিক জানি না সুতপা, তবুও বলি, কোন একটা অন্যায়ের জন্য গোটা মানুষটাই কি বাতিল হয়ে যায়?

—এর মধ্যে বাতিল আর গ্রহণের প্রশ্নটা আসছে কোথায়? সিনেমা দেখতে আমার বেশি ভাল লাগে না, আর, তাছাড়া বাড়ি থেকে বেরোনোরও কিছু অসুবিধা আছে বলেই তোমার সঙ্গে যেতে পারছি না। তার বেশি আর কোন কথাই এখানে আসে না।

অবুঝকে সান্ত্বনা দিল সুতপা। দরকার কি কারও মনে ব্যথা দেবার!

—কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না, সুতপা। হঠাৎ সেদিন থেকে তোমার সিনেমা দেখায় অরুচি ঘটল, আর সেই থেকে বাড়ির বাইরে বেরোনোর কড়াকড়ি হল এটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য? আমাদের

একটা সুবিধে আছে সুতপা। ন্যায় বা অন্যায় যা-ই আমরা করি না কেন, খুব স্পষ্টভাবে করি। মনে হয় সেটাই আমাদের নির্বুদ্ধিতা।

কিন্তু অত শক্ত জালে জড়িয়েও শঙ্কর সেদিন খুব সুবিধে করতে পারল না। কারণ হাতের সামনেই সুতপা একটা মস্ত অজুহাত খুঁজে পেল এবং সে অজুহাতকে উপেক্ষা করার কোন সুযোগ শঙ্করের ছিল না।

তাই সে পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, বিশ্বাস করা না-করাটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু আমার পরীক্ষাটা আমার ব্যাপার। আর এও তুমি জান, মাস-খানেক বাদেই আমার পরীক্ষা। এ সময় বাড়ির বাইরে ঘুরে বেড়াতে চাইলেই কোন মা-বাবা তা করতে দেয় না। কাজেই···কাজেই, সুতপা যে নাচার সেদিন আন্তরিকভাবে না হলেও শঙ্করকে তা মানতে হয়েছিল।

কিন্তু ওর পরীক্ষার পরই আর এক ঘটনা ঘটল। যদিও ইতিমধ্যে সুতপার মা কল্যাণশঙ্করের আপাদমস্তক আপন করে নিতে চেয়েছিলেন। কেননা তাঁর বিচারে কল্যাণশঙ্কর জামাই হবার মত ছেলে। লেখাপড়া জানে মোটামুটি ভালই। আর কয়েকদিন বাদে গ্র্যাজুয়েট হবে ছেলেটা। নিজেদের বাড়ি ঘরদোর আছে এই কলকাতা শহরে। দেখতে-শুনতেও চমৎকার। এমন একটি ছেলেই চেয়েছিলেন তিনি, পেয়েও গেছেন হাতের কাছে।

আর তাছাড়া সুধাদেবী এও দেখেছেন সুতপারও একটা আকর্ষণ আছে কল্যাণশঙ্করের প্রতি। আর কল্যাণশঙ্কর! ওর কথা ওর চোখেই স্পষ্ট লেখা।

মিল মিল মিল, একেবারে চারদিক থেকে এমন মিল বড় একটা চোখে পড়ে না। সুধাদেবী মনে মনে তাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

মাঝে মাঝে মেয়েকে বলেন, হ্যারে খুকী, এতদিন যাবৎ তো মেলা-মেশা করছিস, কিছু বলে না শঙ্কর?

তিনি জানেন মেয়েকে এমন কথা জিজ্ঞেস করাটা খুব ভাল দেখায়

না। তবু না-জিজ্ঞেস করেও পারেন না। আশা আর আকাঙ্ক্ষার একটা চাপেই ওকথা জিজ্ঞেস করেন তিনি।

সুতপাও এমন করেই জবাব দেয়, যেন মার আসল বক্তব্যটাই সে বুঝতে পারেনি।

অত্যন্ত নির্লিপ্তকণ্ঠে সে বলে, কি বলবে?

পরের কথাটা বলতে সুধাদেবীর মুখ আটকে যায়। তবু শেষ পর্যন্ত মুখ ফস্কে বলে ফেলেন,...এ...ই, বিয়ে-টিয়ের কথা!

বাঃ, এই তোমার বুদ্ধি, মা? একটু মেলামেশা করলেই বুঝি অমনি তাকে বিয়ে করতে হবে? মা যেন কতই ছেলেমানুষ। কথা বলেছে এমনি ভঙ্গীতে বলল সুতপা।

— না, বলছিলাম কি... কিছু বলেছে কিনা? কথা বলে একবার ঢোঁক গিললেন সুধাদেবী।

—সে তুমি কিছু ভেব না মা। বলার কিছু হলে ও আমাকে বলার আগে তোমাকেই হয়ত বলবে।

মাকে আশ্বস্ত করল মেয়ে।

— তা যা বলেছিস! ভারি সরল ছেলে। ওই জন্যই ওকে আমার খুব পছন্দ।

সুযোগ বুঝে নিজের ইচ্ছেটা মেয়েকে জানিয়ে রাখলেন মা।

আর রাত্রে সেকথাই স্বামীকে বললেন সুধাদেবী। ওদের পাশের ঘরেই সুতপা শোয়। কাজেই গভীর রাতের নিস্তব্ধতায় স্বামী-স্ত্রীর ফিসফিসানি সবই কানে আসে ওর।

—তুমিও তো কিছু বল না। এতদিন যাবৎ দেখছ, কিছু একটা বলবে তো? মিহি গলার প্রশ্ন।

— কি বলব? ভারি গলার প্রশ্ন।

—এই যে একটা পরের ছেলে রোজ রোজ বাড়িতে আসছে, সে কি কিছু দেখ না, না বোঝ না? মিহি গলাটা একটু চড়ে গেল।

—শুধু দেখেই আমি কি বুঝব?

—কেন, কথা বলে দেখতে পার না ওর সঙ্গে ?

—ও তো আমার সঙ্গে কথা বলতে আসে না। হয় খুকীর সঙ্গে, নয় তোমার সঙ্গে গল্প করে।

— তুমি কখনো বলেছ ওর সঙ্গে কোন কথা যে, ও তোমার সঙ্গে গল্প করতে যাবে ?

—তুমি গিয়েছিলে ওর সঙ্গে গল্প করতে, না ও-ই এসেছিল ?

—আমি মেয়ের মা, আমার সঙ্গে কথা না বললে চলে ?

—আমিও তো মেয়ের বাপ !

—তোমার আছে শুধু কাঠ-কাঠ কথা। ওই জন্যই তো কেউ কথা বলতে চায় না।

—তাহলে ঘুমিয়ে থাক। আর কথা বল না।

একটু ক্যাঁচকোঁচ করে আওয়াজ হল। সুতপা বুঝল, বাবা পাশ ফিরে শুলেন। অতএব আজ আলোচনা ঐ পর্যন্তই।

এমনি টুকরো টুকরো অনেক আলোচনা ওঁদের মধ্যে হয়েছে। সুতপা শুনেছে সে-সব কথা। আর ওঁদের ঐ আলোচনার সময় সুতপা প্রায়ই লক্ষ্য করেছে, বাবা যেন কখনই খুব বেশি আগ্রহ দেখান না এসব বিষয়ে। কেমন যেন একটা হচ্ছে-হোক গোছের ভাব। কিংবা হয়ত, তুমিই তো সব দেখছ শুনছ, যাহোক একটা ভাল বুঝে তুমিই কিছু কর। আমি আর কিই-বা করতে পারি. এমনি একটা মানসিক ভাব বাবার।

নিজের চাকরি আর এক্সটেনশন নিয়েই ব্যস্ত তিনি। সংসারের খরচ যোগাতেই প্রাণান্ত। অন্যকিছু আর দেখবেন কখন ? তিন-তিনটে মেয়ে, স্বামী আর স্ত্রী, খরচের অঙ্কটা বিরাট এক আতঙ্ক তাঁর কাছে।

অথচ চাওয়ামাত্র টাকা হাতে না পেলেই সুধাদেবীর মুখে আর সুধা ঝরে না বিন্দুমাত্র।

সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, এমনিতে তো শুধু শিব-নেত্র হয়েই বসে থাক,

কোথা দিয়ে যে কি হচ্ছে খবরও তো রাখ না। তার ওপর আবার যদি সংসার খরচের টাকাটাও না দিতে পার তো বল, আমিই না হয় রোজগার করতে বেরোই ?

বাবা যথাসম্ভব শান্ত গলাতেই বলতেন, টাকাটা অবশ্য আজই পাবার কথা, কিন্তু ভবেশের স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতেই সব গণ্ড-গোল হয়ে গেল। দেখি কাল কি করতে পারি !

দেখাটা যেন একটু ভাল করেই দেখেন, সেজন্যই মা বলতেন, দয়া করে একটু ভাল করে দেখ। খুকীর শাড়িটা ছিঁড়ে গেছে, ও পরে কলেজে যাওয়া যায় না। নমির মাস্টারের মাইনেটাও কাল দিতে হবে। খরচ কি কম ? কাকে কি বলে আর ঠেকাব ?

আজ সুতপার মনে হল, মা যেন চিরটা কালই বাবার ওপর কি এক প্রতিশোধ তুলছেন। লোকটাকে যত রকমে সম্ভব নস্যাৎ করতে পারলেই খুশি মা। তার যেন একটাই কথা সব কাজে আর কথায় প্রকাশ হতে চায় যে, আমার মত একটি স্ত্রী পেয়েছে বলেই বর্তে গেছ। সংসারের কোন্ কাজটা তুমি বোঝ ? আর কতটুকুই বা করার ক্ষমতা তোমার ? নেহাৎ সেকালের দিনে চাকরির বাজারের অত টানটানি ছিল না, নইলে তোমার মত লোক চাকরিই বা পেত কোথায় ?

বিশ্রী লাগত সুতপার মার এরকম মানসিকতায়। কেমন যেন অত্যন্ত স্বার্থপর মনে হত মাকে। মনে হত লেখাপড়া শেখা সত্ত্বেও মার মনটা যেন ছোটই রয়ে গেছে। যে বাবাকে মা মনে করেন প্রায় অশিক্ষিত, আসলে তার চেয়েও অশিক্ষিত মায়ের মন। মানসিক কোন প্রশান্তি নেই মার। ধৈর্য নেই। সহ্যও নেই। আছে শুধু এক উগ্র উন্নাসিকতা। এক বিচিত্র বিলাসী মন। রজত তাই প্রথমদিকে একবার বলেছিল, শিক্ষাটা যদি চরিত্রের সঙ্গে না মেশে তাহলে কি কুৎসিতই না দেখায় সেটা !

সুতপা তখন বুঝতে পারেনি রজতের কথা। বুঝতে পারেনি, রজতের এ কথার লক্ষ্য কে।

কিন্তু আজ বুঝতে পারছে সুতপা, কাকে আর কেনই বা সেকথা বলেছিল রজত। আজ মনে হচ্ছে, রজতের সেদিনের উক্তিটা কটু ছিল, কিন্তু অসত্য ছিল না।

ওটা ওর স্বভাব। অনেক দেখেছে সুতপা, রজতের কথাগুলো যেন অতিমাত্রায় শ্রুতিকটু। কানে লাগে। মনেও।

এ নিয়ে সেও বলেছে, আচ্ছা রজত, সত্য কথা বলতে হলেই কি শক্ত করে বলতে হয়? একটু ভালভাবে বলতে পার না?

—পারি। চটপট জবাব দিয়েছে রজত।

আবার বলেছে, কিন্তু বলি না। কেন জান?

—তুমিই বল। রজতের কথাটাই শুনতে চেয়েছে সুতপা। জানতে চেয়েছে ওকে। বুঝতে চেয়েছে ওর মানসিকতাকে।

—তার কারণ, ভালভাবে বললে শ্রোতার মনে তা দাগ কাটে না। গতানুগতিকতায় মনের চামড়াও মোটা হয়ে যায়। তাই ওখানে কিছু রদবদল করতে চাইলে কঠিন আঘাতের প্রয়োজন।

—এতে লোকে তোমার প্রতি বিরূপ হবে।

আশ্চর্য সুতপা, এ দেশের এমনি নির্বোধ শিক্ষা যে, ওতে ওরা বিরূপও হয় না। বরং কেমন একরমক হাসি হাসে। যেন কথাটা তেমন অপমানকর কিছু নয়। ওরা যদি রাগ করত, প্রতিবাদ করত তীব্রভাবে তো আমিই খুশিই হতাম সুতপা!

রজতের কথা কোনদিনই খুব স্পষ্ট বুঝতে পারত না সুতপা। সেদিনও তেমন পারেনি। ওর কথা শুনে সুতপার কেবলই মনে হত, কথাগুলো ওর প্রায়ই জানা কথা। কিন্তু তবু যেন ঠিক সে জানে না তা।

কিন্তু আজ মনে হল, রজত অন্তত ওর মায়ের ক্ষেত্রে ঠিকই বলেছে কথাটা। মার জীবনে অনুভূতির বড় অভাব। বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক মার মন।

আবার একথাও সত্য যে, মায়ের ওরকম মানসিকতা সত্ত্বেও

সুতপারা কেন যেন ওদের মায়ের এক্তিয়ারেই ছিল। ওদের ব্যাপারে মায়ের আধিপত্যটাই ওরা মেনে নিত। যেন মেয়ে হিসাবে মায়ের পক্ষ সমর্থন করাটা ওরা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করত। ওদের ধারণা, ওদের সুখ-দুঃখ মা যতটা বুঝবেন, বাবা কিছুতেই ততটা বুঝতে পারবেন না। কেননা, বাবা পুরুষমানুষ। মেয়েদের সমস্ত রকম সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকাটাই অসম্ভব। পুরুষমানুষ কর্তব্য বোঝে, দায়িত্বও নিতে জানে। কিন্তু কর্তব্যবোধই তো জীবনের সর্বাঙ্গীন বোধ নয়। খাওয়াপরার দায়িত্ব ঠিক ঠিক মেটালে পেট শান্ত থাকতে পারে। কিন্তু মন ?

মন তো কই তাতে শান্তি পায় না। সে তো আরও কিছু চায়। অনেক কিছু। আর সেগুলো তো কোন পুরুষের অবশ্য কর্তব্যের কোঠায় পড়ে না।

সেগুলো মেয়েরা বোঝে। মায়েরা। তাই মায়ের কথায় সায় দিয়ে চলত ওরা।

যদিও কখনো কখনো মায়ের মতের সঙ্গেও ওদের বিরোধ বাধত। প্রচণ্ড বিরোধ। তবুও সে বিরোধে বাবার মধ্যস্থতা বা নির্দেশ মানতে ভাল লাগত না ওদের। শেষ পর্যন্ত হয়ত নিজেদের অমতে গিয়েও মায়ের নির্দেশটাই মানত ওরা। শুধু এই ভেবে যে, নইলে মার অসম্মান হবে। আর মেয়ে হিসেবে সেরকম কিছু করা উচিত নয়।

আশ্চর্য, আমরা কবে থেকে যে মেয়ে হলাম, হয়ে পুরুষকে আমাদের বিপক্ষ ঠাওরালাম, সেকথাও আজ আমাদের মনে নেই।

অলস চিন্তার ঘোরে সুতপা মনে মনে আবৃত্তি করল।

আজ এ মুহূর্তে সুতপার মন বলছে, আমরা এক নির্বোধ চেতনায় নিজেদের মেয়ে বলে ভাবি. আর পুরুষকে বিপক্ষ বা শত্রুপক্ষ মনে করি। আবার এমনি অদৃষ্টের পরিহাস যে, ঐ পুরুষের মধ্যেই নিজে-দের নিরাপত্তা আর নির্ভরতার আশ্রয় খুঁজি। নইলে আমার অন্তত পুরুষদের সংসর্গ এড়িয়ে চলাই উচিত ছিল। কল্যাণশঙ্করের মধ্যে

আমি যে পুরুষমানুষকে দেখেছি তারপর আর পুরুষদের কাছ থেকে কিছু আশা করা আমার পক্ষে মূঢ়তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তবুও, রজতকে দেখেই কি এক গোপন আশা উঁকি-ঝুঁকি মেরেছিল মনে।

কি এক অজানা উল্লাস!

যদিও মনের ভাব আপ্রাণ ঢেকে রেখেছিল সুতপা। ঢাকা পড়েছিল অন্য এক কারণে। যে বিশ্রী পরিস্থিতিতে ওদের পরিচয় হয় তাতে অন্তরঙ্গ ভাব আপনিই চাপা পড়ে। তার জন্যে বিশেষ কোন চেষ্টাই কাউকে করতে হয় না।

একে খা-খা করা দুপুর ছিল সেটা। দিল্লীর পথের পিচ গলে কালো মোমের মত হয়ে গেছে। রাস্তা-ঘাটে লোক চলাচলও প্রায় বন্ধ। গরম হাওয়া বইছে। চোখ জ্বালা করছিল ওদের।

ওদের মানে, সুতপা আর রীণার।

পথে বেরিয়েই ওরা বুঝতে পেরেছিল আর কিছুটা পরেই ওদের বেরোন উচিত ছিল। অসময়ে বেরিয়ে পড়েছে ওরা! কিন্তু তাই বলে একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজ শেষ না করে বাড়ি ফেরাটাও পছন্দ হল না ওদের। তাই শেষ পর্যন্ত কনট-প্লেসে এসে ঠিক করল, এই রোদ্দুরে ঘুরে বেড়ালে নির্ঘাৎ অসুখে পড়বে ওরা। কাজেই এখন আর ঘোরাঘুরি না করে আগে দুটো টিকিট কেটে নিতে হবে সিনেমার। তারপর সন্ধ্যা নাগাদ প্রেজেন্টেশনের বই এবং আরও কিছু ফুল নিয়ে বাড়ি ফিরবে। ভিড় বেশি ছিল না হলে। সহজেই টিকিট পেল ওরা। তখনও শো শুরু হতে আধঘণ্টা বাকি। ভাবছিল, এ সময়টা কি করে কাটাবে!

হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রীণার নজরে পড়ল হলের উল্টো দিকেই একটা বুকস্টল।

রীণা সুতপাকে বলল, চল না দেখে আসি ও দোকানটাতে কিছু পাওয়া যায় কিনা? কাছেই তো আছে।

সুতপাও ভেবে দেখল মন্দ নয় কথাটা। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেও ভাল লাগছে না। তার চেয়ে দেখাই যাক না। যদি কাজটা মিটেই যায়!

দোকানের সামনে একটা পর্দা ঝোলান ছিল। বোধ করি রোদ্দুরের আঁচ থেকে রেহাই পাবার জন্য। পর্দাটাতে অবশ্য অনেক কিছু লেখাও ছিল।

দুজনে পর্দা ঠেলে ঢুকল দোকানের ভেতর। একজন লোক কাউণ্টারে কনুইয়ের ভর দিয়ে ঝিমোচ্ছিল।

রীণা জিজ্ঞেস করল, এই যে, শুনছেন? আপনার এখানে প্রেজেণ্টেশনের বই আছে?

লোকটির কানে আওয়াজ যেতেই চিবুকের নীচে থেকে হাতদুটো খসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল মুখটা। কোনরকমে নিজেকে সামলে সে বলল, এ্যাঁ? কি বলছেন?

রীণা আবার বলল, প্রেজেণ্ট করার মত বই আছে? নতুন বই?

লোকটি তখন পুরো সচেতন।

বলল নিশ্চয়, নিশ্চয়! একেবারে হালের সব বই।

বলেই লোকটি বই বের করে দিল ওদের সামনে। ওরা দুজনে একটু-আধটু উল্টে দেখল সেগুলো। কিন্তু কোনটাই তেমন পছন্দ হল না।

তখন সুতপাই অপছন্দ সুরে বলল, আর কিছু নেই? এগুলি তেমন সুবিধা লাগল না।

লোকটি তৎক্ষণাৎ বলল, নিশ্চয়ই আছে।

বলে আবার কতকগুলি বই এনে দেখাল। কিন্তু সেগুলিও ওদের তেমন পছন্দ হল না। এমনি করে একে একে অনেক বই-ই দেখান হল। কিন্তু ওদের পছন্দসই কিছু আর হয়ে উঠল না।

তখন একটু বিরক্ত হয়েই লোকটি বলল, আপনারাই পছন্দমত বইয়ের নাম বলুন না, তা হলেই তো মিটে যায় ঝামেলা।

রীণা বলল, বই নিয়ে আপনার কারবার, আপনিই তো ওর নাম জানবেন। আমরা কি করে জানব বলুন?

লোকটি তেমনিভাবেই বলল, আমার যা জানা ছিল, সে তো সবই প্রায় আপনাদের দেখালাম। কিন্তু কোনটাই তো আপনাদের পছন্দ হচ্ছে না।

বিরক্তিতে কানের পাশে চুলকাতে চুলকাতে লোকটি আবার বলল, তুইও তো একটা কিছু বলতে পারিস। দেখছিস সেই থেকে ঝক্কি পোয়াচ্ছি, তবু সেই থেকে নাকে বই গুঁজে বসে আছে!

লোকটি এ কথাটা যে কাকে বলল, ওরা, প্রথমটা তা বুঝতে পারেনি। অবাক হয়ে এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল।

পরে লোকটি যখন আবার বলল, কিরে, বল না এক-আধটা ভাল বইয়ের নাম!

তখন ওরা দুজনেই দেখল দুটি আলমারীর ফাঁকে একটি চেয়ারে বসে আছে আর একটি লোক। একটু একপাশে বসেছে লোকটা। তাই প্রথমটায় তাকে দেখাই যায় না।

প্রথম লোকটির ভর্ৎসনায় দ্বিতীয় লোকটি তখন বলল, ও বলে কিছু লাভ নেই। যে কোন একটা বই নিয়ে যাওয়াই ওঁদের পক্ষে ভাল!

লোকটার কথায় যেন বেশ একটু বিদ্রূপের সুর শোনা গেল। মনে মনে ক্ষেপে উঠল সুতপা।

বলল, একথার মানে?

— খুব সোজা। প্রথমত প্রেজেন্টেশনের বই সাধারণভাবে কেউ পড়ে না। যে দেয়, সেও না। যে নেয়, সেও না। দ্বিতীয়ত···বলে কথাটাকে টানতে লাগল লোকটা।

সুতপা কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল, কি?

—যদি অভয় দেন তো বলি। মিছেই আপনারা বই বাছাই করছেন। বই বাছাই করতে হলে বই পড়ার দরকার। সেটা সম্ভব নেই বলেই বাছাই করতে আপনাদের এত অসুবিধা হচ্ছে। কিছু মনে করবেন না, হয়ত ইদানীংকার বই আপনাদের তেমন পড়া নেই, তাই…

যত মিষ্টি করেই বলুক, আসলে লোকটা ওদের অপমানই করেছে, এটা বুঝল সুতপা। মুহূর্তে কান দুটো ওর ঝা-ঝা করে উঠল। চোখ দুটোও যেন আবার জ্বালা করতে সুরু করল।

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে বলল, আপনি যে বই পড়ে পড়ে খুব সমঝদার ভাবছেন নিজেকে, তা বুঝলাম। কিন্তু ভুলে যাবেন না, বই পড়তে পারলেই সমঝদার হওয়া যায় না। তাহলে সিনেমা অপারেটররাই সিনেমা ক্রিটিক হত। কিন্তু তা হয় না।

কথাগুলো বলতে পেরে খুশি হল সুতপা। বেশ উচিত শিক্ষা দেওয়া গেল লোকটাকে। ভবিষ্যতে আর কাউকে এমনভাবে অপমান করতে সাহস করবে না লোকটা।

এই কথা বলে রীণাকে নিয়ে ফিরে আসছিল সুতপা।

এরই মধ্যে লোকটা আবার বলে বসল, তা যা বলেছেন। এতকাল বোধ হয় ভুল করেই জানতাম যে, কিছু জানতে হলে পড়তে হয়। আজ বুঝলাম, জানবার জন্য পড়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। বই ভাল কি মন্দ, মলাট দেখেই এবার থেকে তা বলব, কি বলেন?

লোকটা জিতে গেল। তাই মুখে সরু এক টুকরো হাসি দেখা গেল যেন।

জ্বলে উঠল সুতপা।

বলল, আপনার মত লোকের সঙ্গে কথা না বলাটাই সবচেয়ে ভাল হবে। কেননা যাবন্ন ভাষ্যতে ··কি একটা কথা আছে না? সেটা মেনে চলাই ভাল।

—ওহ্, আপনি আবার সংস্কৃতও জানেন! তাই বোধ হয় এত সংস্কৃত-মন।

শানানো ছুরির মত পাতলা একটি হাসির রেখা। হয়ত আরও কিছু বাদ-প্রতিবাদই হত। শেষ পর্যন্ত কি বিশ্রী কাণ্ডই যে হত তার কিছুই ঠিক ছিল না। তবে প্রথম লোকটি আর রীণার জন্যই ওদের বচসা আর এগোল না।

রীণা বলল, চুপ কর সুতপা। মিছিমিছি ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে কি লাভ?

প্রথম লোকটিও বলল, ছিঃ রজত, ওঁরা খদ্দের। যা খুশি তাই ওঁরা বলতে পারেন। তাই বলে আমাদের কি কিছু বলা সাজে? জানিস তো খদ্দের মানেই—লক্ষ্মী।

রজত শুধু বাঁকা একটু হেসে বলল, আগে জানতুম না। আজ জানলাম, লক্ষ্মী কাকে বলে!

সুতপাও সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা বলার জন্য রুখে উঠেছিল। কিন্তু রীণা বাধা দিল।

বলল, চলে আয় সুতপা। আর কোন কথা বলিস না।

বলে সুতপাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হাত ধরে এক-রকম টানতে টানতেই বাইরে নিয়ে গেল।

বাইরে গিয়েও সুতপা গজগজ করতে করতে বলল, একটা অসভ্য ইতর লোক। এরকম অভদ্র আমি আর কখনও দেখিনি।

কিন্তু ঐ অভদ্র লোকটির কথা তৎক্ষণাৎ ভুলে যেতে পারেনি সুতপা। যদিও কিছুই হয়নি, এমনি একটা ভাব করে অতি উৎসাহে ওরা দুই বন্ধু সেদিন সিনেমা দেখেছিল এবং আর-এক বন্ধুর বিয়েতে গিয়ে যথেষ্ট হৈ-হুল্লোড় করেছিল। তবুও দুপুরের সেই অপ্রীতিকর ঘটনা এবং সেই ঘটনার নায়ককে একেবারে ভুল যেতে পারেনি সুতপা। ফাঁকে ফাঁকেই লোকটির বিদ্রূপশাণিত কথাগুলো মনে পড়ছিল ওর। আর তাই একটা অপমানের জ্বালা অনুভব করছিল মনে মনে।

তবুও দু'চারদিন পর আস্তে আস্তে সেকথা ভুলে গেল সুতপা। যে কটা দিন সে দিল্লীতে ছিল সে কটা দিন ঘুরে-ফিরে দিল্লীর দ্রষ্টব্য

দেখতেই ব্যস্ত রইল সে। আজ কুতুবমিনার, কাল বিড়লা মন্দির আর একদিন লালকেল্লা দেখে দেখে বেড়াতে লাগল। এরই মধ্যে একদিন রাষ্ট্রপতি-ভবনের সামনে গেটওয়ে অফ্ ইণ্ডিয়ার দিকে ধীরপায়ে যখন ওরা এগোচ্ছিল তখন রীণাই একদিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

বলল, ওই ছাখ সুতপা। সেদিনের সেই লোকটা ওখানে বসে-আছে। বলে আঙুল দিয়ে দেখাল সেদিকে।

সুতপা দেখল লোকটা গভীর মনযোগ দিয়ে কি যেন পড়ছে। রাস্তার পাশে খানিকটা ভেতর দিকে। সেদিকে আরও অনেকেই বসে হাওয়া খাচ্ছে।

একবার সেদিকে দেখেই সুতপা বলল, বসে আছে তো কি হয়েছে? চল, আমরা এগিয়ে যাই।

—তা তো যাবই। চল না, আগে ভদ্রলোককে একবার দেখা দিয়ে আসি।

কেন? তোর ওর সঙ্গে কি দরকার? সুতপা বিরক্ত ভঙ্গীতে বলল।

—ওমা, আমার আবার দরকার থাকবে কিসের? অবাক চোখে বলল রীণা।

—তবে?

—তবে আবার কি? এমনি একটু জানিয়ে যাই আর কি। দেখি না কি বলে লোকটা।

—নে, ন্যাকামি রাখ। যাবি তো চল, নইলে আমি একাই যাচ্ছি। বলে গট গট করে এগুতে লাগল সুতপা। আর বাধ্য হয়েই রীণা ওর পেছনে পেছনে চলল।

কিন্তু সুতপার ওই বাড়াবাড়িটা ভাল লাগেনি রীণার। কেমন যেন সব তাতেই একটু বেশি বেশি ভাব মনে হয়েছিল ওর। না-হয় একটু কথা কাটাকাটিই হয়েছিল সেদিন। লোকটি হয়ত একটু বেশি চড়া কথাই না-হয় বলেছিল। তাই বলে সুতপার এই জের টানাটা মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না রীণার। বড় বেশি আত্মসম্মানী সুতপা।

তাছাড়া, সে নিজেও তো কম বলেনি লোকটাকে! তবে? তবে আর অযথা এ রাগ পুষে রাখা কেন বাপু?

কোথায় সে-সব কথা ভুলে গিয়ে বিদেশে দেশের লোকের সঙ্গে ভাব-সাব রেখে চলবে, তা নয়!

মনে মনে গজগজ করছিল রীণা। আর সুতপাকে অবস্থাটা বোঝানর জন্য চেষ্টা করছিল।

একসময় রীণা বলল, লোকটাকে ওরকম এড়িয়ে চলে আসার মধ্যে তোর মনের দুটি জিনিসের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাথা নীচু করে চলতে চলতে সুতপা বলল, কি রকম?

—প্রথম কথা, তুই লোকটার কাছে সেদিন হেরে গেছিস। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা সাধারণ পাশ-করা ছেলে-মেয়েরা একবার পাশ করে গেলে আর বইয়ের কাছেও ঘেঁষি না। কিন্তু ওই কথাটাই লোকটি মুখের ওপর অমন করে বলে ফেলল বলে আমাদের এত রাগ। আমরা পাশ-করা মেয়েরা নিজেদের মাননীয়া ভাবতেই অভ্যস্ত। সেখানে কেউ আঘাত করলে আমরা সইতে পারি না। কেননা, তখন আর কোনরকমেই প্রমাণ করতে পারি না যে, আমাদেরও পড়াশুনা আছে।

—আর দুই? কৌতুকী প্রশ্ন করল সুতপা।

—না ভাই, এখন আর দুইয়ের কথা বলব না।

—কেন? রীণার দিকে মুখ তুলে চাইল সুতপা।

—তাহলে আবার আমার ওপরেই রেগে টং হয়ে যাবি। শেষে হয়ত বলেই বসবি, কালই আমি কলকাতায় ফিরে যাব, রীণা। আর আমার ওপর রাগ করে চলে গেলে বাড়িসুদ্ধু সবাই আমাকে বকবে।

—না, কিছু হবে না, তুই বল। বেশ একটু কৌতূহল নিয়েই বলল সুতপা।

—দেখিস, শেষে কিন্তু আমার ওপর রেগে যাসনে!

যথেষ্ট সাবধান হয়ে নিল রীণা।

—না, না, না। বলছি তো রাগ করব না, তুই বল।

—তুই লোকটাকে ভয় পাস।

—কেন? অবাক হয়ে যায় সুতপা।

—কারণ লোকটার মধ্যে এমন দৃঢ়তা আর বিশ্বাস আছে যা তুই সইতে পারিস না।

—বাঃ। তুই তো আজকাল লোকের মনের কথা খুব চটপট বুঝে ফেলিস। অনেক উন্নতি হয়েছে, দেখছি।

যদিও বন্ধুকে তখন ঠাট্টা করল সুতপা, তবুও বন্ধুর ভুলের জন্য কোন তর্ক করল না সে। কেননা, মুখে ঠাট্টা করলেও আসলে নিজের তরফের কোন যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য সে তখন খুঁজে পায়নি। কাজেই সেদিন একরকম বাধ্য হয়েই এর পর চুপ করে রইল।

এর কিছুদিন পর রীণাদের পাড়ায় অর্থাৎ দিল্লীর বিজয়নগর কলোনীতে প্রবাসী বাঙালীরা মিলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করেছিল। মোটামুটি বড় রকমের ব্যবস্থাই হয়েছিল সেখানে। নাচ, গান, আবৃত্তি আর বক্তৃতা সবই হয়েছিল। আর সে অনুষ্ঠানেই রীণা অংশ নিয়েছিল গানে। সুতপাও তাই আগ্রহ নিয়ে যোগ দিয়েছিল উৎসব-প্রাঙ্গণে। আর রীণা এবং উদ্যোক্তাদের কয়েকজনের বিশেষ অনুরোধে সুতপা একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিল।

নিজের নিজের অনুষ্ঠান শেষে দুই বন্ধু বেশ উৎফুল্লচিত্তে এসে বসে বসে পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখছিল। ঠিক এমনি সময় মাইকে কে এক রজত সেনের নামের ঘোষণা হল। রজত সেনকে দেখেই চমকে উঠল ওরা। এ যে সেই লোকটা। যাকে ওরা এড়িয়েই চলতে চায়। ওরা উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কি বলে লোকটা শোনা যাক।

আর রজত সেন ডায়াসে উঠে স্পষ্ট উচ্চারণে যত কথা বলল তাতে আর আর শ্রোতার মনের ভাব কি হয়েছিল বলা যায় না, তবে রীণা

গভীর আগ্রহেই ওঁর সম্পূর্ণ বক্তব্য শুনেছিল এবং সুতপা মনে মনে ফোঁস ফোঁস করছিল লোকটির বক্তব্যের মূল বিষয় শুনে।

সুতপার মনে হল, লোকটা যেন সুযোগ পেয়ে উপস্থিত সমস্ত শ্রোতা এবং উদ্যোক্তাদের প্রাণভরে ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ করে গেল। যেন এমন একটা উৎসবের আয়োজন করাটাই ঠিক হয়নি ওদের। যেন কি এক গর্হিত কাজ করে ফেলেছে ওরা। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পালন করার কোন দায় বা দায়িত্ব যেন ওদের ছিল না। অনর্থক পণ্ডশ্রম করেছে লোকগুলি। এরা পরিশ্রমী এবং কিছুটা ধনীও বটে। তাই রবীন্দ্র-জয়ন্তী না করে অন্য কোন কিছু একটা উপলক্ষ করেই এ উৎসব ওরা করতে পারত এবং তাই করা উচিত ছিল ওদের।

মানুষ যে কত দুর্বিনীত এবং আত্মম্ভরী হতে পারে, তা যেন এই প্রথম দেখল সুতপা। দেখে গা জ্বলে গেল ওর। এতগুলি লোককে এমন করে অপমান করতে একটু বাধল না লোকটার। নির্বিকার কণ্ঠে সমগ্র শ্রোতাকে উপহাস করল লোকটা।

সুতপা অবশ্য মনে মনে আশা করেছিল, এর পরের কোন বক্তা লোকটির উদ্ধত আচরণের সমুচিত জবাব দেবে। বুঝিয়ে দেবে রজত সেনকে, ব্যক্তি-বিশেষকে অপমান করা সহজ হলেও ক্ষেত্রে নির্বিশেষে তার কঠিন প্রত্যুত্তর অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু সুতপা সত্যি সত্যি বড় হতাশ এবং ব্যথিত হল এই দেখে যে, পরবর্তী বক্তারা কেউ রজত সেনের উদ্ধত আচরণের কোন জবাবই দিল না।

সমস্ত অনুষ্ঠানের আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল সুতপার কাছে। মনে মনে বিরক্ত হল সে। কিন্তু করার তার কিছুই ছিল না বলেই এক সময় রীণাকে জোর করে টেনে নিয়ে চলে গেল সে। জায়গাটা ছাড়তে পারলেই যেন সে বাঁচে।

আশ্চর্য! লোকটার সঙ্গে যতবারই দেখা হল সুতপার ততবারই সে শুধু বিরক্ত হল। আর অপমানিত মনে করল নিজেকে।

কখনো কাছে এসে কখনো বা দূরে থেকেই লোকটা অপমান করেছে ওকে।

শুধু একবার, তার কিছুদিন পরেই একবার লোকটির আর একটি চেহারা দেখতে পেয়েছিল সুতপা। দেখে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল সে। প্রথমে কিছুই বলতে পারেনি। শুধু অবাক চোখে রজতের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। মনে মনে যেন প্রতীক্ষা করছিল; কখন আবার নিজের আসল চেহারা প্রকাশ পায় রজতের!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু আর হল না দেখে ভয়ে ভয়ে সুতপা বলল, ধন্যবাদ।

রীণা আর ওর দাদা অবশ্য এসেছিল সুতপাকে ট্রেনে তুলে দিতে।

কাল্‌কা মেল-এ ভিড় লেগেই আছে। তা সত্ত্বেও দু'জনে কোনরকমে একটা কামরায় তুলে দিতে পেরেছিল ওকে এবং সুতপার কপাল ভাল যে, একটি সিংগল সিটই সে পেয়েছিল। এদিকে জোয়ারের জলের মত ভিড় কেবল বাড়ছিল, আর বাড়ছিল। ইতিমধ্যে এক হিন্দুস্থানী যাত্রী গাড়ির দরজা দিয়ে ওঠার সুবিধা না পেয়ে জানালা দিয়ে নিজের পৌটলা-পুঁটলি ঠেলে দিল। আর সেগুলি এসে পড়ল সুতপার গায়ে।

আচমকা ব্যথায় ভয়ে আঁতকে উঠল সুতপা। নিজের অজান্তেই আর্তনাদ করে উঠল, উঃ মাগো!

নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত সুতপা, প্রথমে লক্ষ্যই করেনি, পরে দেখল কে এক ভদ্রলোক অন্ধকারেব মধ্যেই হাত বাড়িয়ে সে পোটলা-পুঁটলি জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল, এদিকে বাইরে থেকে হিন্দুস্থানীটা চেঁচাচ্ছে, হামনিকে মোটরি কোন্ ফেকতা হো? হারামী কা বাচ্চা, আভি মজা দেখা দেব।

লোকটার আর একটি পুঁটলি বাইরে ফেলে দিল ভদ্রলোক।

গম্ভীর সুরে বলল, দরওয়াজাসে উঠ।

—উঁহা কাঁহা জায়গাবা? খেঁকিয়ে উঠল হিন্দুস্থানীটা।

—তব্ মত উঠো, ইধর জানানা বৈঠা হ্যায়।

সে এক বিশ্রী কাণ্ড। হাঁকাহাঁকি চেঁচামেচি। কিন্তু ভদ্রলোক কাঠ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। হিন্দুস্থানীটার সব লাফালাফিই ব্যর্থ হল সেখানে। অগত্যা অন্য চেষ্টা দেখল সে।

আর ওরই মধ্যে একসময়ে সুতপার নজরে পড়ল ভদ্রলোকটি আর কেউ নয়, রজত সেন।

একটু আগেই এই ভদ্রলোকটির সহানুভূতি এবং সহযোগিতায় খুশি হলেও লোকটিকে চেনার পর কেমন একটা অস্বস্তিবোধ করতে লাগল সুতপা।

ওদিকে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে হিন্দুস্থানীটাকে বাধা দিতে চেষ্টা করেও রীণার দাদা মহীতোষ খুব সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত যাত্রী কয়েকজনের সাহায্যে সে ঝামেলা কোনরকম মিটল বলে খুশি হল ওরা।

মহীতোষ বলল, ধন্যবাদ দাদা। কতদূর যাবেন?

রজত বলল, কলকাতা।

—বাঃ তাহলে তো ভালই হল। দেখবেন একটু।

বলেই যা ইঙ্গিত করল তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল, কাকে দেখতে বলছে।

রজত সংযত জবাব দিল, প্রয়োজন হলে দেখব।

রজতের কথায় আশ্বস্ত হল মহীতোষ। আর রীণা সুতপার কানে ফিসফিস করে বলেছিল, জানিস সুতপা, আমার কেবলই একটা কবিতার লাইন মনে পড়ছে।

—এখানে? এই দারুণ ভীড়ের মধ্যে?

—হ্যাঁ ভাই, এখানে, এই দারুণ ভীড়ে।

—কী?

—বলব? শেষে যদি তোর আবার ভাল না লাগে?

—আহ্, বল না, মুখপুড়ী। এক্ষুনি তো গাড়ি ছেড়ে দেবে।

—তাহলে বলেই ফেলি? কি বল?

—ধুত্তোরে ছাই! বলবি তো বল না?

—বলছিলাম কি—

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি—
আমরা দুজনা চলতি হাওয়ার পন্থী… ..

সুতপা বুঝেছিল ওর ইঙ্গিতটা। বুঝে লজ্জা পেয়েছিল। কিন্তু রীণার কাছে প্রকাশ করেছিল - রাগ।

বলেছিল, মাথার চুলগুলি পটপট করে টেনে ছিঁড়ে ফেলব তোর!

রীণা কপট ভয়ে বলেছিল, থাক বাবা। আমার মাথায় হাত দিয়ে কাজ নেই। নিজের মাথাটাই সামলাও।

একটু পরেই গাড়ি ছাড়ল। দ্রুত থেকে দ্রুততর হল গাড়ির গতিবেগ।

সুতপা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে লাগল। কিন্তু বাইরে তখন অন্ধকার। কাজেই সেখানে স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পৃথিবীটা কেমন যেন অন্ধকারে চাপা পড়ে গেছে বলে মনে হল ওর। আর সেই রাত্রির অন্ধকার এবং অন্ধকারে ডুবে যাওয়া পৃথিবীকে নিয়ে আকাশ-পাতাল অনেক কথাই ভাবছিল সে। ভাবতে ভাবতে কখন একসময় বিরক্ত হয়ে উঠল সুতপা। মনে মনে বলল, কোন মানে হয় এসব আবোল-তাবোল ভাবার? যতসব বাজে চিন্তা আর কি! কিন্তু কাজের চিন্তাও যে কি হতে পারে তাও কিছু ভেবে ঠিক করতে পারল না সে।

তাই বাধ্য হয়েই তখন গাড়ির ভেতর দিকটায় নজর ফেরাল সে। দেখল, নানা ধরনের সব টুকরো টুকরো ছবি। নানা রকমের যাত্রী নানা ভঙ্গীতে বসে আছে।

ঘুরতে ঘুরতে একসময় দৃষ্টিটা এসে পড়ল রজতের ওপর। সে

তখন মাথাটা পেছনে হেলিয়ে উদাস চোখে কি যেন দেখছে। কিংবা হয়ত কিছু ভাবছিল সে।

একবার সুতপা ভাবল, কোন দুর্বিপাকে একই সঙ্গে একই কামরায় যদিও যেতে হচ্ছে, তাই বলে লোকটার সঙ্গে কোন কথাবার্তা নয়। তাহলেই সুযোগ পেয়ে যাবে লোকটা। বিশেষ এই পরিস্থিতিতে লোকটা হয়ত একেবারেই পেয়ে বসবে ওকে। নানা উপকার করার অছিলায় হয়ত বিরক্তই করবে আরও।

তাছাড়া এখন যদি সে রজতের সঙ্গে আলাপ করতে চায় তো সে নিশ্চয়ই নিজেকে খুব অসহায় বোধ করছে বলে মনে করবে লোকটা। আর শিক্ষিত মেয়ের এ-জাতীয় মানসিকতায় নিশ্চয়ই মনে মনে হাসবে রজত। তার চেয়ে এই ভাল। চুপচাপ পথটুকু পার করে দেওয়াই ভাল। কেউ কারও তোয়াক্কা না রেখে পথ চলাই সবচেয়ে ভাল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সুতপার মনে হল, নাঃ এরকমভাবে জিনিসটা দেখার কোন মানে হয় না। গাড়িতে চলতে চলতে কত অচেনা লোকের সঙ্গেই তো মানুষের আলাপ হয়। তাতে তো কারও কোন মান-সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং পরিচিত জগৎটা আরও বিস্তারিত হয়। নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশলে, কথা বললে বরঞ্চ আরও অভিজ্ঞতা বাড়ে লোকের। দেশভ্রমণের সার্থকতাই তো এখানে। নইলে শুধু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথটুকু পাড়ি দিলে আর মুখ বুজে পদচারণা করলে কেবলমাত্র এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ানই হয়, আর কোন লাভই হয় না।

এমনি সাত-পাঁচ ভেবে একসময় সুতপা রজতকে বলল, কি ব্যাপার, চিনতে পারছেন না?

নিজের চিন্তার ঘোরে থাকায় রজত হয়ত ওর কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারেনি। তবে সে যে কিছু বলছিল, তা বুঝতে পেরেছিল। তাই একটু সোজা হয়ে বসে বলল, আমায় কিছু বলছেন?

— হ্যাঁ, কি ভাবছিলেন?

—না, তেমন কিছু নয়। এমনি চুপ করে বসেছিলাম।

—আপনি বুঝি আমায় চিনতে পারেননি?

—পেরেছি।

—তবে কথা বলছিলেন না যে?

—আপনিও তো বলছিলেন না।

এরপরই যেন কথা ওদের শেষ হয়ে গেল। এরপরে আর যে কি বলা যেতে পারে, তা যেন ভেবে পেল না ওরা।

শো-শো করে গাড়ি চলছে। একটা ব্রীজের ওপর দিয়ে গাড়িটা যখন যাচ্ছিল তখন গম্ গম্ করে শব্দ হচ্ছিল। কান পেতে সে আওয়াজ শুনছিল সুতপা।

একটু পরে আবার সে বলল, দিল্লীতে কি আপনি বেড়াতে এসেছিলেন?

—হুম্! আমার এক বন্ধু থাকে এখানে, স্কুলের বন্ধু। অনেকদিন থেকেই বলছিল একবার আসতে। এবারে একটু সুযোগ পেলাম, তাই। আপনি?

—আমিও বন্ধুর বাড়িতেই এসেছিলাম। অনেক দিনের বন্ধু··· সেই ছেলেবেলাকার। তাছাড়া, ছুটিতে বাড়ি বসে থাকতে ভাল লাগে না একটুও, তাই।

—সে তো বটেই। সুতপার মতকে সমর্থন করল রজত।

—বাবুসাব, ম্যাচিস্ হ্যায়? পাশের পাঞ্জাবী যাত্রীটি রজতকে জিজ্ঞেস করল।

রজত ম্যাচটা দিল ওকে। বিড়ি জ্বালিয়ে লোকটি ফেরত দিল সেটা।

—আপনাকে চুপ করে থাকতে দেখে কি ভাবছিলাম জানেন? সুতপাই আবার বলল।

—কি? কৌতূহলী প্রশ্ন করল রজত।

—হয় আপনি আমাকে চিনতে পারেননি, নয় চিনতে চাইছেন না।

—কেন ? সুতপার কথাটুকুই জেনে নিতে চাইল রজত।

—কারণ, পূর্ব পরিচয়ের তিক্ততা। অনেক ভেবে বলেই ফেলল সুতপা।

—না, না, আপনি ভুল বুঝেছেন। তবে একথা ঠিক যে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে যাওয়াটা উচিত হবে কিনা ভাবছিলাম।

—কেন ? এবারে সুতপার জানার পালা।

—কারণ, আপনি হয়ত অন্যরকম কিছু ভাবতেও পারেন। একটু সহজ হয়ে এল রজত।

—কি ভাবব ?

—এই, লোকটা গায়ে পড়ে আলাপ করতে চাইছে।

—আমি তো করলাম।

—তা করলেন। তবে আমার করাটা হয়ত উচিত হত না।

—কেন ?

—কারণ, ছেলেরা এগিয়ে কিছু বলতে গেলেই মেয়েরা তার একটা বিশ্রী মানে করে।

—তাই নাকি ! আর মেয়েরা কিছু বললে, ছেলেরা তার কি রকম মানে করে ? পাল্টা-প্রশ্নে একটু কোণঠাসা করে ফেলল সুতপা।

—কিছুই মনে করে না। কারণ, স্বভাবতই ছেলেদের নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। তাই, কে কি বলল আর কেন বলল, ও নিয়ে ওদের কোন মাথা ঘামাতে হয় না। প্রয়োজনে সব রকম অবস্থাকেই ফেস করতে হয় ওদের।

—আর মেয়েদের হয় না ?

—হয়ত হয়। কিন্তু তবু মনে হয়, সব অবস্থাতেই তারা একটা সংস্কারের খুঁটি শক্ত করেই ধরে রাখে। তাই চিন্তাটা তাদের অন্য খাতে বইতে পারে না। বারে বারেই এক জায়গায় এসে ধাক্কা খায়।

—বাঃ, মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার চমৎকার ধারণা তো ?

—ধারণা নয়, বিশ্বাস।

ওদের কথা মাঝপথেই বন্ধ হল। কেননা, গাড়িটা তখন দ্রুতবেগে একটি স্টেশনকে ডিঙিয়ে চলেছে। ছোট্ট স্টেশনের প্ল্যাটফরমটাকে একেবারে কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। যেন এত ছোট কোন জিনিসে ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। আপন বিক্রমে তখন সে উন্মত্ত। মেল ট্রেনের মর্যাদা রাখার জন্য গোটা প্ল্যাটফরমটাতে মুঠো মুঠো ধুলা ছড়িয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

স্ুতপা ব্যগ্রভাবে মুখ বাড়িয়ে দেখল সে দৃশ্য। আর রজতও বাইরে তাকিয়ে কি যেন দেখছিল।

খানিকদূর যেতে সুতপা আবার আলতো করে বলল, বেশ লাগে দেখতে!

—কি? ছোট্ট প্রশ্ন করল রজত।

—এই যে, হু হু করে ট্রেনটা চলছে। কোন কিছুই যেন মানবে না সে। আর আমি এই গাড়িরই এক কোটরে বসে দেখছি ঐ পেরিয়ে আসা স্টেশনটাকে আর ঐ মানুষগুলোকে, যারা বোকার মত এ গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। নিজেকে ওদের চাইতে কেমন যেন একটু স্বতন্ত্র, একটু পদস্থ বলে মনে হয়। নিজের ভাবনাটাকে কথায় ধরতে চাইল সুতপা।

কিন্তু কথাটা বলেই ওর মনে হল, বড় বেশি বলা হয়ে গেল। বড় বেশি মনের কথা। এতটা বলা উচিত হয়নি প্রায় অপরিচিত একটি লোকের কাছে। কিছু ভাবতে পারে লোকটা। কিছু মনে করতে পারে।

আর কিছু না হোক, ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেতে পারে লোকটা।

তাই, কথার দমক হঠাৎ আটকে দিল সুতপা। অত্যন্ত সচেতন-ভাবেই ব্যবধান বজায় রাখল সে।

রজতও অবশ্য কি ভেবে ওর কথাগুলো শুধু শুনল। কিন্তু সে কথার কোন জবাব দিল না। চুপ করে বসে রইল সে। কিছু ভাবল মনে মনে। তারপর একসময় এ্যাটাচি-কেস খুলে একটা বই বের করে পড়তে লাগল।

সুতপা অনেকক্ষণ মনে মনে ভাবল, এখন কি করতে পারে সে। আর বেশি কথা যে রজতের সঙ্গে বলা উচিত নয়, এটা সে একটা স্থির সিদ্ধান্তই করল। পথের আলাপ বিচ্ছিন্ন আর টুকরো টুকরো হওয়াই ভাল। কোনরকমেই সে আলাপ যাতে ঘনিষ্ঠ না হয়, যাতে সে ছুঁতো হাতে করে আবার বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে উঠতে না পারে।

অথচ এমন চুপচাপ বসে বসেও কেউ এতটা পথ পাড়ি দিতে পারে না। কাজেই কি করা যায় ভাবল সে।

ভেবে ঠিক করল, ব্যস, আর কিছু নয়। ওর নিজের কাছে যখন পড়া-টড়ার মত কোন বই নেই তখন ইচ্ছে করলে ঐ লোকটার কাছ থেকে একটি বই চেয়ে নিতে পারে। এই ট্রেনে বসে পড়বে শুধু। নামবার আগেই ফেরত দেবে বই, শেষ হোক আর না-ই হোক। এতে তেমন কিছু দোষ আছে বলে মনে হল না সুতপার। তাই, খানিকক্ষণ ইতস্তত: করে সে বলল, কি পড়ছেন?

বই থেকে মুখ তুলে রজত বলল, এই একটা জীবনী।

—কার? সুতপার পরবর্তী প্রশ্ন।

—একজন বিদেশী চিত্রশিল্পীর। রজত জানাল।

—নাম?

—তুলুস্ লোত্রেক।

—আর কোন বই নেই? এই গল্প টল্প আর কি। একটু ফ্যাকাশে হাসি হাসল সুতপা।

একথার জবাবে রজত আর কোন কথা বলল না। সেও একটু হেসে একটা বই বের করে দিয়ে দিল সুতপার হাতে।

বইটা হাতে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভাবল, যাক, আর কোন সুযোগ পাবে না লোকটা।

গুছিয়ে বসে বই পড়তে শুরু করল সে এবং চেষ্টা করেই বেশ একটু মন-সংযোগ করল সুতপা বইয়ের পাতায়।

কিন্তু এত যত্ন আর চেষ্টা সত্ত্বেও সে যাত্রায় সুতপার এই সচেতন

ব্যবধানের দূরত্বটুকু কিছুতেই শেষ পর্যন্ত বজায় রইল না। নেহাতই দৈবদুর্ঘটনায় ওদের গাড়ি মাঝপথে বিকল হয়ে পড়ল। যান্ত্রিক গোলযোগ। স্টীম পাইপটা ফেটে গিয়েছিল। অতএব অনির্দিষ্টকালের জন্য ওদের অপেক্ষা করতে হল। প্রথমটায় অন্যান্য লোকেরা হৈ-চৈ করে কিছু একটা করতে চেয়েছিল। পরে যখন সবাই বুঝল যে, এ অবস্থায় কারোরই করার কিছু নেই তখন উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমে এল।

কিন্তু তবুও নানা দুশ্চিন্তা আছে যাত্রীদের। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে গাড়ি, তার কিছুই ঠিক নেই। পরবর্তী জংশন থেকে নতুন ইঞ্জিন এলে তবেই গাড়ি চলবে। তার আগে নয়।

ততক্ষণ তারা খাবে কি? কাছে-পিঠে কোন দোকান-পসারও নেই যে, কিছু আনিয়ে নেবে। ঐ ট্রেনে যে কটি হকার জিনিস বিক্রী করছিল অবস্থা বুঝে তারাও জিনিসের চারগুণ দাম হাঁকল। আর নিয়মের কিছু ব্যাঘাত ঘটেছে জেনে সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল প্রয়োজনীয় সকল বস্তু সংগ্রহ করতে। এমনিতে যা ঠিক এখনই না হলেও চলত, এবারে যেন তা না হলে আর কিছুতেই চলে না।

সে এক বিশ্রী কাণ্ড। হৈ-চৈ কান্নাকাটির ধুম পড়ে গেল। সুতপা অন্তত এরকম অবস্থায় কখনও পড়েনি।

তাই, প্রথমটায় ব্যাপারটাতে বেশ একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। পরে সে অবস্থাটা কেটে গেলে লোকদের অহেতুক ব্যস্ততায় মুখ টিপে হাসতে লাগল। ভারি মজার কাণ্ডই সব ঘটতে লাগল ওর চোখের সামনে।

প্রথম ভ্যাবাচাকার মুহূর্তে সে একটু আতঙ্কিত সুরেই রজতকে বলেছিল, যাঃ, এখন কি হবে।

রজত বলেছিল, কপাল খারাপ, খানিকটা দুর্ভোগ হবেই দেখছি।

—শেষ পর্যন্ত যাবে তো গাড়িটা? ভয়ার্ত প্রশ্ন সুতপার।

—আপনার হিতার্থে না হলেও রেল কোম্পানীর নিজের গরজেই এটা যাবে একসময়।

কারও ভয়ে ঠিক সহানুভূতি জানান নয়, একটু যেন মজাই পেল রজত সুতপার ভয়ার্ত প্রশ্নে।

—কিন্তু কখন ?

—তা কি করে বলব ?

হয়ত সুতপা বুঝেছিল, সত্যি গাড়ি ছাড়ার সময়টা এ লোকটার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তাই এবারে চুপ করল।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, দেখছেন লোকগুলোর কাণ্ড! একেবারে যেন ক্ষেপে উঠেছে সব।

কথার শেষে হাসি চাপতে পারল না সুতপা।

এবারে গম্ভীরভাবেই রজত বলল, ওটাই স্বাভাবিক। যদিও ওরকমটা দেখলে আমাদের হাসি পায়, তবুও।

— কি রকম ? উল্টো কথা শুনে সুতপা কৌতূহলী হল।

— খুবই সহজ। জিনিসটা নাও পেতে পারি, এরকম একটা সম্ভাবনা থেকেই আমাদের পাবার আগ্রহটা যায় বেড়ে। বুঝলেন ?

— আর একটু পরিষ্কার করে বলুন না ?

—সাধারণভাবে আমরা কেউ দুপুরের খাবার খেয়েই রাতের খাবারের কথা ভাবি না। কেননা, ওটা একটা নিশ্চিত নিয়মের মধ্যে পড়ে। কিন্তু যে ভিখিরী রাস্তার ধারে বসে ভিক্ষে করছে, সে দুপুরের খাবার খেয়েই রাতের খাবারের জন্য হাত বাড়াচ্ছে। এর মানে কি ? না, ওর কাছে ওটা অনিশ্চিত।

— কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন, এরা কেউই ভিখিরী নয়।

—কিন্তু যেহেতু অনিশ্চিত অবস্থায় পড়েছে, সেহেতু মানসিক দৈন্য দেখা দিয়েছে। মানুষে মানুষে তো খুব মৌলিক তফাৎ কিছু থাকে না।

রজতের একথার পরই সুতপা হঠাৎ বলে বসল, আপনি কি কমিউনিস্ট করেন ? তারপরেই আবার আমতা আমতা করে বলল, কিছু মনে করবেন না ··আমি এমনি জানতে চাইলাম আর কি।

—কি করে বুঝলেন? ওর কথার জবাব না দিয়ে রজত উল্টে প্রশ্ন করল।

—না - তেমন কিছু নয়। এই···আপনার কথা শুনে মনে হল—এই আর কি।

—কেন? মানুষে মানুষে মৌলিক কোন তফাৎ নেই বলেছি বলে?

— যদি বলি, হ্যাঁ? সুতপা নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিতে চাইল।

—তাহলে বলব, আপনি ভুল বুঝেছেন। কারণ, মানুষে মানুষে সম্পর্কটা কি তা রাজনীতির বিধান অনুযায়ী হয়নি। ওটা আসলে বায়লজি আর ফিজিওলজির বিধানভুক্ত।

—কিন্তু ও দুটো শাস্ত্রই মরা মানুষের হিসেব রাখে। জ্যান্ত মানুষের হিসেব আলাদা। বুদ্ধির আরও একটি প্যাঁচ দেখাল সুতপা।

—তা বটে। তবে ও দুটো শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করেই আর একটি শাস্ত্র তৈরী হয়েছে। তার নাম, সাইকোলজি। সে জ্যান্ত মানুষের হিসেব রাখতে চায়। কিন্তু পারে না। কারণ, মানুষের কোন শাস্ত্রেরই শেষ পাতা আজও লেখা হয়নি। তবু বলি প্রথম দুটো শাস্ত্রকে বাদ দিয়ে যারা তৃতীয় শাস্ত্রকে জোর করে আঁকড়ে ধরবে, তারা ভুল করবে।

—কারণ?

—এক আর দুই বাদ দিলে তিনের অস্তিত্ব প্রমাণ পাওয়া যায় না।

—বটে। শেষ পর্যন্ত যুক্তিটাকে ঠিক ঠেকাতে পারল না সুতপা। চুপ করে গেল।

গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। লোকজন সব দুপাশে নেমে ছুটোছুটি করছে। বেশির ভাগই খাদ্য আর জলের খোঁজে। চোখ মেলে সে দৃশ্য দেখল সুতপা। দেখতে দেখতে কত কি ভাবছিল।

বেশ খানিক্ষণ পর রজত বলল, না:, আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। খিদেটা সত্যি খুব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে দেখছি। কথাগুলো সে অনেকটা স্বগতোক্তির মত করেই বলল।

তারপর একসময় জায়গা ছেড়ে দাঁড়িয়ে সুতপাকে লক্ষ্য করে স্পষ্টই বলল, লজ্জা করে লাভ নেই। এতক্ষণে আপনারও নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। দেখি চেষ্টা করে কি পাওয়া যায়? আপনার জন্য কি আনব, মুড়ি-মুড়কি, না চাপাটি?

চাপাটির নাম শুনেই শিউরে উঠল সুতপা।

বলল, উঃ মাগো? ও জিনিস আমি দাঁতে কাটতে পারব না।

—তবে?

—কি জানি। হতাশ হয়ে পড়ল সুতপা।

—আচ্ছা, দেখি কি পাই!

বলেই গাড়ি থেকে নামছিল রজত।

সুতপা হঠাৎ পূর্ব সতর্কতা ভুলে বলে ফেলল, ওকি! আপনি চললেন নাকি?

—হ্যাঁ।

—সেকি? আমি একা গাড়িতে বসে থাকব?

—ভয় কি? এত লোক রয়েছে। রজত অভয় দিল।

—না, কখনও আমি একা একা থাকতে পারব না। নিজের অবস্থার কথা যেন ভুলেই গেল সুতপা একা থাকার ভয়ে।

আজও ভাবতে লজ্জা পায় সুতপা সেদিনের ওর কাণ্ড-কারখানার কথা মনে করে। কি বিশ্রী নিলর্জ্জের মতই সে ঐ লোকটির পেছন পেছন গিয়েছিল। যেন ও লোকটির পেছনে পেছনে ওকে যেতেই হবে। সুতপার মত একটি অসহায় যাত্রীর যত দায়-দায়িত্ব সবই যেন ওই লোকটির। ওর ভয় পেলে লোকটি তাকে ভরসা দেবে। খিদে পেলে খাবার যোগাড় করে আনবে।

অথচ লোকটার সঙ্গে ওর সেদিন কতটুকু সম্পর্ক?

কিছুই না কোন সম্পর্কই না। ওরা দুজনেই একই গাড়ির আর একই কামরার যাত্রী। এইমাত্র। এর বেশি কিছু নয়। তবুও, শেষ

পর্যন্ত ওরা একই সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বিহারের রেল লাইনের কাছাকাছি কোন গ্রামে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে যা হোক কিছু ওরা খেয়েছিল। তবে সেদিন প্রায় না খাওয়া অবস্থায় থাকলেও ওর কষ্ট হয়নি এক-বিন্দুও। বরং নতুন এক উত্তেজনায় ওর সেদিনটা বড় চমৎকার কেটেছিল।

তেমন দিন কি আর আসবে? বিছানায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ সেদিনের কথা ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সুতপা।

সারা বাড়িটা এখন প্রায় চুপ। বেশির ভাগই যে যার স্কুলে চলে গেছে। আর যারা অফিসে যাবে তাদেরই দু'চারজন আছে। কিন্তু তাদেরও তেমন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কখনো কখনো। রান্নাঘরে নানারকম আওয়াজ। এরই মধ্যে একবার বোর্ডিংয়ের ঝি নির্মলা ঝাঁট দিতে ঢুকেছে। এদিককার জিনিস ওদিকে সরিয়ে সে যখন ঘর পরিষ্কার করছিল তখন সেই জিনিস সরানোর আওয়াজে চমক ভাঙল সুতপার।

—তাই তো, অনেক্ষণ থেকেই তো জেগে শুয়ে আছি। ঠিক যেন জেগেও ছিলাম না। অতীত জীবনটা স্বপ্নের মত আমার চোখের ওপর খেলা করে গেল। আর আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখলাম। আমাকে যেন সব সময় আমি চিনে উঠতে পারছিলাম না।

মনের চিন্তাটা কথায় স্ফুট হয়ে উঠল সুতপার।

—আশ্চর্য! এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। অতীত-আমি আর বর্তমান-আমি যেন স্পষ্টই দুটো ভাগ হয়ে যায় কখন কখন। অথচ, ও দুটো আমির মাঝখানে খানিকটা সময়ের প্রলেপ ছাড়া আর কোন ব্যবধান তো নেই। সময় কি তবে একেকে দুই করতে পারে নাকি? দুইকে বহু? মনে মনেই প্রশ্ন করে বসল সুতপা। কিন্তু তার কোন সঠিক জবাব না পেয়ে চিন্তাটাকেই মাথা থেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল সে।

এ পাশ ফিরে বলল, নির্মলাদি, এখন উনুনে কি হচ্ছে?

বয়স্ক ঝি নির্মলা বাইরে কাজগুলোই করে। হেঁসেলের ভার সুখদার

উপর। আর সে কারণেই সুখদা নিজেকে নির্মলার চাইতে পদস্থ মনে করে। সে অত যা তা কাজ করার মত মেয়েছেলে নয়। উঠোন ঝাঁট দেওয়া, লোকের এঁটো বাসন মাজা, জল তোলা আর মসলা পেষা, ওর মতে কোন ভদ্রলোকেরই কর্ম নয়। ওগুলো ছোট জাতের কাজ।

নির্মলাও তাই সুখদার ওপর হাড়ে হাড়ে চটা। একেবারেই সইতে পারে না। সে সুখদার হাবভাব চলা-বলা কথায় কথায় ওদের বচসা লেগেই আছে। এখন, সুতপা রান্নাঘরের কথা জানতে চাওয়াতে সে অমনি ঝাল খানিকটা মিটিয়ে নেবার একটা সুযোগ পেল।

বলল, সে খপর কি আর আমি রাখি দিদিমণি? ও বড়লোকের বেটী কখন কি করে, সে খপরে আমার দরকার কি?

—যাও না নির্মলাদি। একবার দেখে এস না, কি করছে! নির্মলা ঝাঁটা রেখে বলল, শুধু শুধু দেখতে যেতে পারবোনি বাপু, হ্যাঁ। তাহলেই সে মুখপুড়ি ভাববে আমি বুঝি ওকে নজর করে বেড়াচ্ছি। তার চেয়ে ওকে কি বলতে হবে বলে দাও। আমি ধা করে ওর মুখের ওপর বলে আসছি। ব্যাস, চুকে গেল ল্যাঠা।

বলেই প্রায় রণং দেহি ভঙ্গীতে সে দাঁড়াল।

ওর কাণ্ড দেখে সুতপা মুচকে একটু হাসল।

তারপর বলল, অত কিছু করতে হবে না শুধু বলবে, উনুনটা খালি হলে আমায় যেন একটু চা করে দেয়।

ওর কথার পিঠে ঝাঁ করে নির্মলা বলল, তবেই হয়েছে আর কি? অসময়ে চায়ের ফরমাস করলে ও আবার আমার ওপরেই মারমুখী হয়ে উঠুক।

—কিচ্ছুই হবে না। তুমি বলোগে না।

—বেশ, যাচ্ছি।

বলে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নির্মলা বেরিয়ে গেল।

সুতপা সেদিকেই চেয়ে রইল খানিকটা। ভাবল, আশ্চর্য!

মানুষ তার নিজের অবস্থাটা কিছুতেই বুঝতে চায় না। কিংবা পারে না বুঝতে। তাই নিজের এবং অপরের সম্বন্ধে যুগপৎ ভুল ধারণা পোষণ করে। ওতে নিজেও শান্তি পায় না, অপরকেও শান্তি দিতে পারে না। নইলে এই নির্মলা আর সুখদার মধ্যে এমন একটা কামড়াকামড়ি সম্পর্ক থাকত না। যদি ওরা বুঝত, একই জায়গায় পেটের দায়েই কাজ করতে এসেছে ওরা দুজনেই। কাজেই, ওদের দুজনেরই চাহিদা এবং চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা সমান। তাহলে, আর ওরা নিজেদের মধ্যে এমম একটা অর্থহীন ব্যবধান গড়ে তুলত না। আর তাতে ওরা আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হতে পারত।

কিন্তু তা ওদের হল না। দুঃখের জ্বালা তো আছেই। তারও ওপরে সামান্য ছোট-বড়র প্রশ্ন তুলে অহেতুক রাত-দিন ঝগড়া করে মরছে।

মানুষের ভাগ্যটাই এরকম। নিজেই নিজের অশান্তির কারণগুলো বয়ে বেড়ায়। অথচ সে এই অশান্তির জন্য অপরকে দোষারোপ করতে ভালবাসে। আশ্চর্য মানুষের মনের গড়ন।

এরই মধ্যে নির্মলা কখন ফিরে এসে নিজের ফেলে-যাওয়া কাজে হাত দিয়েছে। ওর ফিরে আসা এবং কাজে হাত দেওয়া সবই সুতপা দেখল। কিন্তু কেমন যেন অস্পষ্ট মনে হল সব।

এখন হঠাৎ খেয়াল হতেই জিজ্ঞেস করল, কি হল, কি বলল সুখদা?

—বলবে আবার কি? হচ্ছে। নিজের মনে কাজ করতে করতেই জবাব দিল নির্মলা।

যেন বিনা প্রতিবাদে সুতপার এ হুকুমটা মেনে নেওয়াতে খুশি হয়নি নির্মলা। সুখদা প্রতিবাদ করলেই সে তাকে দুটো কথা শোনাবার সুযোগ পেত। কিন্তু তা হল না বলেই যেন আক্ষেপ নির্মলার। তাই গোঁজ হয়ে নিজের কাজ করতে লাগল।

—তবে তো তুমি বলেছিলে, হুকুম শুনলেই সুখদা তোমার ওপর খাপ্পা হয়ে উঠবে? সুতপাই বলল আবার।

—সে কি আর মিছিমিছি বলেছি? চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলাই তো ও মাগীর স্বভাব। নইলে আমার কি দায় পড়েছে ওর সঙ্গে ঝগড়া করার! এখন হঠাৎ কি খেয়াল হল তাই কিছু বললে না।

—সুখদাটা খুব ঝগড়া করে বুঝি?

—ওমা, তা আর করে না! তবে আর কি বলছি দিদিমণি, ও মাগী তো ঐ করেই সব খোয়াল। নইলে দিব্বি তো ছিল সোয়ামী সংসার নিয়ে। ও মাগীর মুখের জন্যেই তো সব গেল। কে বাপু অত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনতে যাবে রাতদিন! পুরুষমানুষ, সারাদিন খেটেখুটে এলে কোথায় তাকে এট্টু সোহাগ করবি, যত্ন-আত্যি করবি, তা নয়। উল্টে শুধু কট্‌কট্‌ করা। এবার বোঝ ঠ্যালা। লাথি মেরে তো সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল। এখন কেমন হল? এখন খুব ভাল লাগছে। পরের বাড়ির হেঁসেল ঠেলতে? মেয়েমানুষের কি অত রাগ ভাল, দিদিমণি?

—না, তা ভাল নয়।

নির্মলাকে আর চটাতে চাইল না সুতপা। তাই সংক্ষেপে ওর কথার সমর্থনই করল সে।

তবে এটাও সুতপার মনে হল, সুখদাকে গালাগাল কবতে গিয়েও কোথায় যেন একটু সহানুভূতিও সে প্রকাশ করে ফেলেছে। আর তাই এই মুহূর্তে নির্মলাকে ওর ততটা খারাপ লাগল না। ব্যবহারটা একটু রুক্ষ হলেও মনটা ওর কুৎসিত নয়।

এরই নাম মানুষ। যার অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও গুণও থাকে কিছু। দোষগুলোকে ক্ষমা করবার মত গুণ।

নির্মলার ঘর পরিষ্কার করা হয়ে গেল। সুতপাকে নীরব আর চিন্তিত দেখে সেও আর কোন কথা না বলে চলে গেল। ওর এখন অনেক কাজ। একটু পরে চা নিয়ে এল সুখদা। চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর রেখে একবার দেখল সুতপার দিকে। ওর মনে হল, দিদিমণির নজরে যেন সেটা পড়ল না। তাই ওকে একটু সজাগ করে

দেবার জন্যই বলল, আজ আবার এমন সময় চা কেন দিদিমণি ? শরীল-টরীল খারাপ নাকি ? ছুকুরে ভাত খাবেন তো ?

সুতপা ফ্যাকাশে একটু হেসে বলল, কেন রে, সুখো ? একদিন এককাপ চা বেশি খেলেই কি শরীর খারাপ হতে হয় ?

—ওমা ষাট্‌, তা কেন হবে ? এমনি জিজ্ঞেস করলুম আর কি ! যা দিনকাল পড়েচে, বলা তো যায় না কিছুই।

সুখদা নির্মলার চাইতে বয়সে ছোট। তাই সকলে ওকে তুই করেই ডাকে। আর নামটাকেও আরও ছোট করে সুখো বলে।

সুতপা ওর কথার জবাবে বলল, তা ঠিক। ভারি বিশ্রী দিনকাল হয়েছে। একটা না একটা অসুখ লোকের লেগেই আছে।

নিজের কথার সমর্থন পেয়ে সুখদা একটু উল্লসিত হয়েই বলল, সে কথাই তো বলছি, দিদিমণি। ঘরে ঘরে সব অসুখের বান ডেকেছে যেন।

একটু থেমে আবার বলল, আচ্ছা, আমি যাই দিদিমণি, উনুনে আবার তরকারী চাপিয়ে দিয়ে এয়েচি, দেখি কি হল।

দ্রুত চলে গেল সুখদা।

আর সুতপা চায়ের কাপটি টেনে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগল। চা খেতে খেতে সে ভাবল, মানুষের ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে নেশারও একটা অংশ আছে নাকি ? নেশা কি মানুষকে চিন্তা করতে সাহায্য করে ?

তারপরই ভাবল, না. নেশা চিন্তায় কোন সাহায্য করে না। তবে যে মানুষ একটু চিন্তিত হলেই নেশার আশ্রয় খোঁজে তার কারণ, চিন্তার নেশার সঙ্গে বস্তুর নেশা মিশিয়ে মানুষ সেটাকে একটু নতুন স্বাদে গ্রহণ করতে চায়। তাতে চিন্তার নেশাটা একটু হাল্‌কা হয়। নইলে, সুতপা নিজে অন্তত এ সময়ে চা খেতে অভ্যস্ত নয়। সকাল বিকেল দুবার চা-ই ওর পক্ষে যথেষ্ট। এর বেশি খেলে ওর খিদে মরে

যায়। রাত্তিরে ঘুম হতে চায় না। পেটটা গরম হয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও।

আজ সে খেল নিয়মের বাইরে। মনটা যেন ওর আজ আর নিয়মকে মানতে চাইছে না। একটু অনিয়ম করতে পারলেই ও আজ খুশি। আজ নিয়মের বাইরে গিয়ে সে ওর ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা ভাবছে। ভাবতে ভাল লাগছে ওর।

এই এক মজা মানুষের।

অতীতের চিন্তায় সে বেশ একটা আনন্দ পায়। সে চিন্তা দুঃখের বা সুখের যাই হোক না কেন!

বরঞ্চ, সুতপার মনে হয়, মানুষ তার অতীতের দুঃখটা চিন্তা করতেই বেশি আনন্দ পায়। সেদিনের দুঃখটা আজ আর সে পরিমাণ আঘাত তাকে করতে পারে না। হাল্‌কা একটা রেখার মত সেটা মনের কোথাও আঁকা থাকে। আর বর্তমানের সহানুভূতির ছোঁয়া তাতে লাগলে কেমন একটা মধুর আবেশ সৃষ্টি করে মনে।

নইলে, সুতপার অন্তত অতীতের কথা ভাবতে গিয়ে এতক্ষণে কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে ফেলার কথা। কিন্তু তা সে করেনি। যদিও ওর অতীতে বেশির ভাগটাই ব্যথার আর বিরক্তির জীবন।

কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তো প্রথমটায় আশা আর আনন্দের ইশারা দেখতে পেয়েছিল সুতপা। সে-সবই কেমন করে একটু একটু করে বদলে শেষ কালটায় কি বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সব যেন সেই রূপকথার ডাইনী। বাইরে থেকে দেখতে অপূর্ব সুন্দরী ওরা। কিন্তু সময় আর সুযোগ বুঝে নিজেদের বীভৎস চেহারা প্রকাশ করত ওরা। তাদের সেই কুৎসিত আর কদাকার চেহারা দেখে শিউরে উঠত যত রাজকুমার আর রাজকুমারীর মন।

সুতপাও কি কম ভয় পেয়েছিল কল্যাণশঙ্করের দ্বিতীয় চেহারা দেখে। বিশ্বাসই করতে পারেনি সে প্রথমটাতে। প্রথমে ওর মনে

হয়েছিল, চোখে ভুল দেখছে সে। আবছা অন্ধকারে ঠিক দেখতে পাচ্ছে না।

গাড়িটা চলছিল হু-হু করে ডায়মণ্ডহারবারের পথে। বেবি ট্যাক্সি। ফাঁকা পথ। মাত্র কিছুক্ষণ আগে বিকেলের আলো ফুরিয়ে অন্ধকার হয়ে এসেছিল। ফেরার পথে কিছুটা ক্লান্ত ছিল সুতপা। মাথাটা পেছনে হেলিয়ে চোখ বুজে ছিল সে অলস ভঙ্গীতে। একটা হাত ওর কল্যাণশঙ্করের হাতেই ছিল। নিশ্চিন্ত ছিল সুতপা।

হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টানে সে শঙ্করের কোলের ওপর শুয়ে পড়ল। অমণি শক্ত হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল সে। নীচু হয়ে এসেছিল শঙ্করের মাথাটা। গরম ওর নিঃশ্বাস আর ঠোঁট।

সামান্য একটু সময় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল সুতপা। তারপরেই শক্ত হয়ে উঠল ওর মাংস পেশী। হাতের এক ঝটকায় শঙ্করের মুখটা সরিয়ে সোজা হয়ে বসল সে। জামা-কাপড় গুছিয়ে নিল ভাল করে।

চিৎকার করতে পারত সুতপা। গাড়ি থামিয়ে পুলিশও ডাকতে পারত। কিন্তু কেন যে তা করেনি, আজও তা ভেবে পায় না।

শঙ্করের একটা খিদে যে খুবই মারাত্মক, জানত সুতপা। সেটাকে মাঝে মাঝে উস্কানিও দিত সে। দিতে ভাল লাগত। হয়তো ছেলেটাকে চিরদিনের মত হাতের মুঠোয় রাখার জন্যই ওর লোভটাকে একটু উগ্র করে তুলত। আর ওর সামান্য একটু প্রশ্রয়েই শঙ্কর ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে যেত।

নইলে, সে দুপুরে শঙ্করের বাড়িতে গিয়ে যখন জানতে পারল শঙ্করের পিসিমা বাড়ি নেই তখনই ওর চলে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তা সে করেনি।

বরং সে আরও অলস ভঙ্গীতে শঙ্করেরই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলেছে, উফ্। কি বিচ্ছিরি গরম রে, বাবা! মাথাটা যেন ঝা ঝা করছে।

একটু থেমে আবার বলেছে, কি, অতিথিকে সামনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকবে, না কি কিছু খাতির-যত্ন করবে ?

শঙ্করও বিজ্ঞের মত বলেছে, দাঁড়াও, আগে ভেবে দেখি, অতিথি কি দরের ?

—বেশ, ছ্যাখো। তারপর ঝট্‌পট্‌ একটা ব্যবস্থা কর।

—সে ব্যবস্থা তো হয়েই আছে, ভয় কি!

ব্যবস্থা যা হয়েছিল তাতে ওর শরীরটা ভেঙে চুরে একেবারে খসে যেতে চেয়েছিল। অসহ্য এক ব্যথা আর আনন্দ ওকে কেমন অবশ করে ফেলেছিল।

সেদিনের ও ঘটনার পর থেকেই শঙ্করের যে খিদেটা কমে যাওয়ার কথা ছিল, উল্টে সেটা আরও বেড়ে গেল।

এখন শঙ্কর সামান্য একটু সুযোগ পেলেই সেই অসহ্য খিদেটাকে মিটিয়ে নিতে চায়। আর তাই ডায়মণ্ডহারবার রোডের সামান্য নির্জনতা ফুরিয়ে-আসা দিনের আলো, হু-হু হাওয়ায় বেসামাল শাড়ির ফাঁকে ফাঁকে অফুরন্ত লোভের ইশারা ওকে একেবারে পাগল করে দিল।

কিন্তু সেদিন সে মুহূর্তে কল্যাণশঙ্করকে কিছুতেই তখন সহ্য করতে পারল না। ওকে কেমন একটা ভয় হল সুতপার। ঘৃণা হল তখনকার আচরণে।

তাই, দ্বিতীয় কোন কথা না বলে কাঠ হয়ে গাড়ির এক কোণে বসে রইল সে।

এতটুকু হাওয়াও তখন আর ওর গায়ে লাগছিল না। কাণ ছুটো জ্বালা করছিল। কেমন একটা কান্না পাচ্ছিল। আবার একটা ঘৃণার ভাবও দানা বাঁধছিল।

শেষ পর্যন্ত কল্যাণশঙ্করের চিন্তাটাই ওর দারুণ এক ভয় আর বিরক্তিকর চিন্তা হয়ে দাঁড়াল। ওর কাছ থেকে দূরে যেতে পারলেই যেন সে বাঁচে।

কিংবা শুধু কল্যাণশঙ্কর নয়, সমস্ত পুরুষ জাতটা থেকেই দূরে থাকতে চাইত সুতপা। পুরুষ জাতটার প্রতি ঘৃণায় বিরক্তিতে ভরে গিয়েছিল ওর মন।

তাই রজত সম্বন্ধে প্রথম থেকেই খুব সতর্ক ছিল সুতপা। কোন-রকমেই ওকে প্রশ্রয় দিতে রাজী ছিল না সে। বরং অতিমাত্রায় সতর্ক-তার দরুন কখনো কখনো অতিরিক্ত রূঢ় ব্যবহার করেছে সে। করে আনন্দ পেয়েছে।

যে আঘাত সে পুরুষের অর্থাৎ শঙ্করের কাছ থেকে পেয়েছে তার খানিকটা প্রতিশোধ অন্তত রজতের ওপর নিয়েছে।

নইলে, দিল্লী থেকে ফিরে আসার পর প্রথম যেবার দেখা হয় সুতপার রজতের সঙ্গে কোন একটা আর্ট একজিবিশনে সেবারেই অত বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে কথা বলত না সুতপা।

ফেরার পথে ট্রেনে যেটুকু কৃতজ্ঞতা নিয়ে সে ফিরেছিল তাও যেন এতটুকু মনে ছিল না ওর।

দেখা হওয়া মাত্রই রজত বিস্মিতকণ্ঠে বলেছিল, একি, আপনি এখানে?

কিন্তু সুতপার হঠাৎ মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই ট্রেনের উপকারের কথা স্মরণ করে ওর ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করবে।

তাই রজতের কথার সোজা জবাব না দিয়ে উল্টে নিস্পৃহ প্রশ্ন করল, কেন, আসতে নেই নাকি?

—না, তা বলছি না। তবে হঠাৎ যে এমন করে দেখা হবে, তা আশা করিনি।

—ও! খুবই নির্বিকার কণ্ঠে বলল সুতপা।

বলেই দু'পা এগুলো সে। রজতও।

একটু পরে রজত আবার বলল, কিন্তু আপনি একা?

হয়ত রজত ওর ওই একাকীত্বের সুযোগটা নিতে পারে। সে সম্ভাবনাতেই হঠাৎ বেঁকে গেল সুতপার কথা।

বলল, দিল্লীর ট্রেনে আমাকে একা দেখে তো অবাক হননি? এখন হঠাৎ অবাক হলেন যে? এটাই তো আপনার সুযোগ।

কথাটা প্যাঁচাতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেল রজতের কাছে। সেও তাই ব্যঙ্গভরেই বলল, ঠিক তা নয়, এটা দুর্যোগও হতে পারে।

—কি রকম? বাঁকা প্রশ্ন সুতপার।

—যারা মনে করে, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলেই ছেলেরা বর্তে যায়, সে-সব মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার মত দুর্ভোগ আর কি আছে বলুন?

—তাই নাকি? ঠাট্টার হাসি সুতপার ঠোঁটে।

— ঠিক তাই। অত্যন্ত দৃঢ় জবাব রজতের।

এত বিরক্ত হয়েছিল রজত ওর কথায় যে, আর বিন্দুমাত্র দেরী না করে চলে গিয়েছিল সে।

আর তারপরেই সুতপা ভেবে দেখেছিল নিজের মনে যে, রজতের প্রতি ওর ব্যবহারটা মোটেই ভদ্র এবং মার্জিত হয়নি। বরং যথেষ্ট পরিমাণে অপমানকরই হয়েছিল।

এতদিন পর লোকটার সঙ্গে দেখা। সাধারণ সৌজন্যের বশেই সে প্রশ্ন করেছিল।

নইলে, সত্যি যদি সে সুযোগ নিতে চাইত তো এতদিনের মধ্যে ওর বাড়িতেই যেতে পারত সে। অধিকার তার একেবারেই যে ছিল না, তাও নয়।

তাছাড়া, কৃতজ্ঞতাবোধ বলেও একটা কথা আছে। তার খাতিরেও অন্তত আর একটু ভদ্র ও বিনীত ব্যবহার করা উচিত ছিল সুতপার। কিন্তু অহেতুক এক আশঙ্কায় তা করেনি সে। যে সত্যি ওর উপকার করেছে তাকেই আপমান করল ও।

এটা ওর নিজেরই নীচ মানসিকতার প্রমাণ।

কিন্তু তখন আর ওর করার কিছুই ছিল না। লোকটা চলে গিয়েছিল অনেক দূরে।

তবুও এত সতর্কতা এত সাবধানতা সত্ত্বেও লোকটার সঙ্গেই জড়িয়ে পড়ল। ভাগ্যের পরিহাস বোধহয় একেই বলে। যাকে এড়াতে চাও বারে বারে তারই সাথে তুমি জড়িয়ে পড়বে। হাজির হবে তারই সামনে।

এরপর যেবার ওর সঙ্গে রজতের দেখা হল সেবার প্রথমেই সে তার পূর্ব-আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিল।

রজত অবাক। ভাবল, এ আবার কি!

মিষ্টি একটু হেসে সুতপা বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আমার অপমান করাটাকে বিশ্বাস করতে পারেন, আর সম্মান করাটাকে পারেন না?

রজত ধীরভাবে কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ কণ্ঠেই বলেছিল, সত্যি বলতে গেলে আপনার কথায় বিশ্বাস করাটা একটু কঠিন বৈকি। কারণ, আমি জানি অহেতুক সম্মান তারাই করতে পারে—অযথা অপমান করতে যাদের বাধে না।

—ও বাবা, আপনকে সম্মান করতে যাওয়াও তো বিপদ। যেন কতই আশঙ্কিত হয়েছে এমনি ভঙ্গীতে সুতপা বলল।

—তা ঠিক। না জানলে, ওতেও বিপদ আছে। লঘু ভঙ্গীতে বললেও তেমন লঘু শোনাল না রজতের কথাটা।

তবুও সুতপা শান্তকণ্ঠেই বলল, থাক বাবা, কাজ নেই আর সম্মান জানিয়ে। তার চাইতে চলুন একটু চা খাওয়া যাক। ওতে নিশ্চয়ই আপনার মান খোয়া যাবে না।

সুতপার মুখ থেকে স্পষ্ট আপোষের কথা শুনে রজত বলল, বলছেন যখন তখন চলুন না হয় যাওয়া যাক।

যেতে যেতে মিন মিন করে সুতপা বলল, বলছি তো অনেক কথাই। কিন্তু মানীর মনে যে আর ধরে না কিছুই।

তবে সুতপার ওকথা রজত ঠিক শুনতে পেল না। কারণ ঠিক তখনই একটা ট্রাম ঘটাং ঘটাং করে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। তবুও

ওর ক্ষীণ আওয়াজটা রজতের কানে হয়ত একটু এসেছিল। কিংবা হয়ত সুতপা কিছু একটা বলছে এটা অনুমান করতে পেরেছিল রজত। তাই বলল সে, কি বলছেন?

ওর প্রশ্নের ধরনেই সুতপা বুঝেছিল, এর আগের কথাটা ওর কানে যায়নি। মনে মনে তাই সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

এবারে তাই সেটুকু একেবারে চেপে গিয়ে বলল, কই, বলিনি তো কিছু?

—ও! বলে চুপ করে গেল রজত।

সুতপাও পথে আর কোন কথাই বলল না। কিসে থেকে কি হয়, কে জানে! আজ যখন সে এই লোকটার কাছে পূর্ব আচরণের জন্য ক্ষমা চাইতেই এসেছে তখন নির্বিঘ্নে সেটুকু করে যেতে পারলেই সে খুশি হবে। কাজ কি বেশি কথা বাড়িয়ে! তারপর হয়ত কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা এসে যাবে তখন তার টাল সামলানই দায়।

লোকটার কথা যে বেশ একটু কাটা-কাটা তা সে ইতিমধ্যেই বেশ টের পেয়েছে। আর ওর নিজের কথাতেও যে পুরুষদের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় মাঝে মাঝে, সে সন্দেহও ওর মনে যথেষ্টই আছে।

অর্থাৎ, ওরা দুজনেই যখন সমান মানী লোক তখন বেশী কথা না বলে মানে মানে চা-টুকু খেয়ে বাড়ি ফিরতে পারলেই যথেষ্ট মনে করল সুতপা।

কিন্তু তবু চা খেতে খেতে অন্য এক পরিবেশ সৃষ্টি হল। একটু ভাললাগা পরিবেশ। আর সে পরিবেশ তৈরী করল রজতই।

তখনও ওদের চা খাবার কিছুই দেওয়া হয়নি। তাই রজত একটা সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে টানছিল।

কিছুক্ষণ পর খুবই আলতো করে সে বলল, শহুরে জীবনের অনেক অভিশাপের মধ্যে একটি আশীর্বাদ—এই রেস্টুরেন্টগুলো।

—কি রকম? কৌতূহলী প্রশ্ন করেছিল সুতপা।

—এখানে খেলে পেট খারাপ হয়। কিন্তু এখানে এলে মন ভাল হয়। চিন্তার ঘোরে থেকেই যেন জবাব দিল রজত।

—সে আবার কি? অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল সুতপা।

—দেখছেন না, এখানে সবাই কেমন খুশি খুশি হয়ে আসে আর যায়। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব সবাই এখানে আসে একটি মাত্র সুযোগের জন্য। সে আর কিছুই নয় একটু নিরিবিলিতে মন খুলে কথা বলার সুযোগ।

—কেন? বাড়িতে কি তা যায় না?

—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই না। একই ঘরে হয়ত স্বামী-স্ত্রী শ্বশুর ননদ থাকে। মাঝখানে প্লাইউডের পার্টিশন। সে ঘরে কি কেউ মন খুলে কথা বলতে পারে? সারা কলকাতাতে একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজে পাবেন না আপনি। এমন কি গড়েরমাঠেও নয়। কোথায় যাবে তারা একটু অন্তরঙ্গ কথা বলতে? পথে পথেও বলা সম্ভব নয়। কেননা, এখানে পথে পথে মেলার ভিড় লেগে আছে। তবে? তবে কি মানুষ কথা চেপে চেপে দম বন্ধ হয়ে মরবে? অগত্যা মধুসূদন, এই রেস্টুরেন্টের কেবিন। খুব বেশি নির্ভরযোগ্য আড়াল না থাকলেও এখানে মস্ত একটা সুবিধা এই যে, কেউ এখানে কারও কথায় বিশেষ কান দেয় না। কারণ এরা যে সবাই একই ব্যথার ব্যথী। একই পথের পথিক।

গড়গড় করে একটা যেন বক্তৃতাই দিয়ে ফেলল রজত। আর সুতপা ভাবল, লোকটার হল কি? এ যে সহানুভূতির কথা বলে লোকটা? কামড়ানো আর ছোবল মারাই যার স্বভাব, সে হঠাৎ মানুষের দুঃখ নিয়ে অত আক্ষেপ করছে কেন?

তবুও যেহেতু রজতের কথায় যথার্থই আন্তরিকতা ছিল সেহেতু তাকে আর তার স্বভাবের কথা মনে করিয়ে দিল না সুতপা। সে শুধু বলল, বাব্বা! আপনি যে রীতিমত রেস্টুরেন্টের পাবলিসিটি দিতে সুরু করলেন!

—না, ঠিক তা নয়। কারণ এটা আজ শহুরে মানুষের এত বেশি প্রয়োজন যে পাবলিসিটির কোন দরকার পড়ে না। অতি প্রয়োজনীয় পঞ্জিকারও পাবলিসিটি দরকার, কিন্তু এর তা প্রয়োজন নেই। এরপর চা আর খাবার এল। নিঃশব্দে সেগুলো খেল ওরা। খাবার শেষে চায়ের কাপ কাছে টেনে রজত বলল, তাছাড়া এই যে খাবার, এর একটা গুণ আছে না?

—তা একটু একটু আছে দেখছি। ছোট করে বলল সুতপা।

—কি গুণ?

—চড়া কথাও একটু নরম হয়।

এমন নির্বিকার কণ্ঠে বলল সুতপা যে, ওরা দুজনেই হেসে ফেলল। কিন্তু একটু পরেই রজত বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—কি? একটু যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল সুতপা ওর প্রশ্নের ধরনে।

—সত্যি বলবেন তো?

—সম্ভব হলে বলব। ভয়ে ভয়েই আশ্বাস দিল সুতপা।

—আচ্ছা আমার কথাগুলো কি বড় বেশি চড়া আর কড়া বলে মনে হয় আপনার?

যাক, সুতপা যা আশঙ্কা করছিল তেমন কোন কথা নয়। মনে মনে আশ্বস্ত হল সে।

আর তাই ফস্ করে বলে ফেলল, ও কি আর মনে হওয়ার অপেক্ষা রাখে? ও যে একেবারে সরাসরি কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।

মাঝপথে থেমে গেল সুতপা। নিজের উক্তির জন্য নিজেই লজ্জা পেল সে। কান দু'টো হয়ত একটু লাল হয়ে উঠল ওর। একটু গরম গরম।

মুখ ফস্কে কি কথাই বলে ফেলেছে সে! তারপর কেবল মনে মনে জিভ কামড়াতে লাগল।

আর কোন কথাই বলতে পারল না সে। কি ভাবছে লোকটা কে জানে!

ভাগ্যিস একটু বাদেই বেয়ারা বিল নিয়ে এল। তাই বেঁচে গেল সুতপা। মনে মনে ধন্যবাদ দিল সে ঈশ্বরকে এ যাত্রা তাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। ভুল করে কোন্ পথেই না সে পা বাড়িয়েছিল। আর একটু হলেই লোকটা একটা চরম সুযোগ হাতে পেত এবং সে সুযোগের সুতো হাতে পেলে লোকটা যে কি করত তা তখন ভেবে পায়নি সুতপা। সে শুধু তখন ঐ মুখ ফস্কে যাওয়া ভুলের কথা ছাড়া কিছুই ভাবতে পারেনি।

কিন্তু তবুও সে যাত্রা ভুলটাকে কোনরকমে এড়িয়ে গেলেও আবার নতুন নতুন ভুল করেছে সে। ভুল করেই ও লোকটাকে একবার ওদের বাড়ি যাবার জন্য অনুরোধ করেছে সুতপা। আবার নিজেও এসেছে কয়েকবার রজতের খোঁজে।

প্রথমটাতে হয়ত বাহ্যিক ভদ্রতা বজায় রাখার জন্যই এসব ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু পরে, একটু একটু করে কখন যেন ভদ্রতাবোধকে ছাড়িয়েও অন্য এক টান অনুভব করেছে সে।

ভাল লেগেছে গোপনে রজতের সঙ্গে দেখা করতে। আজ এখানে, কাল সেখানে। এটা সেটা অছিলা করে।

রজত যে বুঝত না ব্যাপারটা তা নয়। তবু সে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখায়নি এতে। যেন কোন একটি মহিলা দেখা করতে চাইছে বলেই দেখা করছে সে। কথা বলছে, কথার জবাবে। যেদিন প্রথম রজতের ধারণায় ব্যাপারটা স্পষ্ট হল সেদিনই সে যেন একটু গম্ভীর হল।

একটা গুমোট গরম ছিল সেদিন বিকেলে। থেকে থেকেই মুখ ঘাড় ঘেমে উঠছিল সুতপার। সেদিন আর রেস্টুরেন্টের কেবিনে বসে স্বস্তি পাচ্ছিল না সে।

তাই চা-টা খেয়েই রজতকে বলল, উফ্, অসহ্য গরম! চলুন একটু খোলা মাঠে বেড়াই।

রজত সেদিন বার বারই সুতপার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। কি

দেখছিল, তা কে জানে! সেজন্যও সুতপা আর একটু বেশি অস্বস্তি বোধ করছিল।

রজত বুঝল সেটা। তাই বলল, চলুন।

মাঠ বলতে কলকাতায় গড়ের মাঠ। তারই একপাশ ধরে ওরা হাঁটছিল।

এক সময় সুতপা একটু হাল্‌কা সুরেই বলল, খোলা জায়গায় এলে মনটাও একটু খোলা-মেলা হয়, তাই না?

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রজত বলল, সেটা কি খুব ভাল?

—নয় কেন?

—ওতে মনটা হারিয়েও যেতে পারে। মনটার দোষই ঐ। একবার দরজা খোলা পেলে সে আর ভেতর-মুখো হতে চায় না।

—তাতেই বা ক্ষতি কি?

—যথেষ্ট। কেননা, মন তখন আর মানুষটাকেও মানতে চায় না, কাজেই মানুষের কোন নিয়মকেও না আর তখনই হুলুস্থুলু বেধে যায় মানুষের সমাজে। বলে, এ কি পাপাচার সুরু হল? মন বলে, তুমি আচারের বিচার কর, আমি একটু ঘুরে বেড়াই। তোমার ঐ আচারের কৌটোয় আমার যে দম বন্ধ হয়ে আসে।

—আর মানুষ তখন কি বলে? আলতো করে প্রশ্ন করল সুতপা।

রজত তার কথার রেশ টেনে বলতে লাগল, বলে, তোমার ইচ্ছাটা বড় বেয়াড়া রকমের ছুটোছুটি করে। আমরা ওর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারিনে। ওতে আমাদের শরীর খারাপ হয়। দুর্ভোগের আর সীমা থাকে না। তাই আমরা নিয়ম করে ওটাকে বাঁচাই।

— তারপর?

— মন তখন রুষে ফুঁসে বলে, তবে ওটাকেই বাঁচাও, আমি চললাম। আমি কি শরীরটার কেনা-গোলাম যে, জীবনভর তার খিদমৎ করে

চলব? আমার কোন সাধ-আহ্লাদ নেই? মানুষ তখন রেগে তেড়িয়া হয়ে বলে, চুলোয় যাক তোর সাধ-আহ্লাদ। তোর জন্য কি গোটা বিশ্বসংসারটা ডুববে? একটাকে একটু ঢিলে দিলেই তো সংসারটা তার পেছনে ধেই ধেই করে ছুটবে। সে পরিণতিটার কথা কখনও ভেবেছ? আর ওখানে এসেই মন একটু থতমত খেয়ে যায়।

—কেন? অত্যন্ত উৎকণ্ঠ প্রশ্ন করল সুতপা।

—কারণ, বহুদিনের অভ্যাসের ফলে মনটাও কেমন একটু নিয়মতান্ত্রিক হয়ে পড়ে। তাই একেবারে সৃষ্টিছাড়া কিছু হতে পারে, এ আশঙ্কায় চুপ করে থাকে মন। সেও তখন সাহস হারিয়ে ফেলে। অবশ্য কথাটাকে সাধারণভাবে ধরতে হবে। কেননা, সাধারণ মানুষ দুর্বল, তাই তার মনও দুর্বল।

—ব্বাঃ। কথায় কথায় দিব্যি এক কথিকা তৈরী করে ফেললেন দেখছি! খুশিয়ালি সুরে বলল সুতপা।

—এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? কথার পর কথা দিয়েই তো কথিকা হয়। রজতও বলল খুশির সুরে।

—হলেও, সবাই পারে না।

— তাই তো সবাই বলেও না।

—উফ্, আপনার সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই। কপট আফশোসের সুরে বলল সুতপা।

—এতবড় কথিকাটা শোনার পরও বুঝলেন না? মনে মনে বেশ মজা পাচ্ছিল রজত।

—বুঝেছি, বুঝেছি, খুব বুঝেছি। যেন কতই বিরক্ত সুতপা।

—বেশ, বুঝলেই ভাল।

এরপর কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটল ওরা। আশপাশের লোকেরা ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল ওদের দিকে। কেউবা নিজের চিন্তায় মশগুল হয়ে পথ চলছিল। রাস্তায় যানবাহন চলাচলের একটা মসৃণ আওয়াজ হচ্ছিল।

একটু পরে সামনে তিনটে রাস্তা দেখে থমকে দাঁড়াল সুতপা। জিজ্ঞেস করল রজতকে, এবারে কোনদিকে যাব?

রজত যেন ওর প্রশ্ন শুনে বড়ই ব্যথিত হল এমনি ভঙ্গীতে বলল, আহা-হা, ওরকম করে জিজ্ঞেস করবেন না। মনে বড় লাগে যে!

—কেন, কি হল? আশ্চর্য সুতপা।

—তাই যদি বুঝতেন, সখেদে বলল রজত, তাহলে তো সব ল্যাঠাই চুকে যেত।

বলতে বলতে এগিয়ে চলল রজত। অতএব সুতপাও।

একটু পরে আবার বলল রজত, ঐ করেই তো আপনারা যত গণ্ডগোল বাধান।

—কি করে?

—ঐ সব দার্শনিক প্রশ্ন করে। কোন্ পথে যাব, এ কি সোজা প্রশ্ন! একেবারে আদি ও অনন্ত জিজ্ঞাসা। তা ও আবার যাকে তাকে প্রশ্ন নয়। একেবারে খাঁটি একটি যুবককে।

—উফ্, আপনি লোককে ঘাবড়ে দিতে ও পারেন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সুতপা।

—ঘাবড়াবারই তো কথা। তাছাড়া ঐ দর্শনের কথা বাদ দিলেও ও প্রশ্নের বিপদ অনেক।

নতুন করে রহস্যের ফাঁস পরাল রজত।

—যথা? এবারে আর ভীতি নেই সুতপার।

—যথা, ওরকম প্রশ্ন আপনাদের মত কেউ যদি করে তো আমরা ছেলেরা সব কাব্যিক তাড়পায় টগবগ করতে থাকি। কেউ বলি, চলুন না, যেদিকে দু'চোখ যায়। কেউ বা বলি, সব পথই যে একই মন্দিরে গিয়ে উঠেছে, কাজেই ওর আর এটা সেটা কি? কেউ হয়ত আরও একটু মাত্রা চড়িয়ে বলি, এ পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হত, তুমি…।

—বলুন না। মাঝপথে আচমকা প্রশ্ন করল সুতপা। কৌতুকে

ওর ভুরুটা বেঁকে উঠেছিল। একবার কটাক্ষে রজতের দিকে তাকিয়েই নামিয়ে নিল চোখ।

—অত্যন্ত বিশ্রী হয়। নির্লিপ্ত এবং দ্রুত জবাব দেয় রজত, মানুষ যত পদস্থই হোক ঐ পদযুগলের ওপর ভর করে সারা জীবন কিংবা একটা গোটা দিনও সে হেঁটে হেঁটে বেড়াতে পারে না। খানিক পরেই পা ব্যথা হয়। তখন বসার জায়গা চাই। চড়া রোদে কিংবা বৃষ্টিতেও সে পথ চলতে পারে না, এমন কি পথে দাঁড়িয়েও থাকতে পারে না। কাজেই, অশেষ পথে পা চালাতে মানুষ রাজি নয়।

— আপনি নেহাতই গদ্যময়।

— অর্থাৎ আপনি বলছেন, আমি-ই যথার্থই রসিক? আমার এ গুণটাকে আজ পর্যন্ত কেউ আমল দিতে চায়নি। আপনিই প্রথম স্বীকৃতি দিলেন, অতএব ধন্যবাদ। রজত যেন বড় খুশি হয়ে উঠল।

—তার মানে আপনার গুণটাই যে দোষ, এটুকুও আপনি বুঝতে পারেন না। যেন রজতকে দমিয়ে দেবার জন্যই সুতপা বলল।

—ঠিক তার উল্টো। আমার দোষটাই যে গুণ একথা লোকেরা স্বীকার করতে চায় না। অথচ তারা বোঝে, আমার মতটাই সত্য।

—কেন?

– কারণ, গদ্য হচ্ছে খাঁটি সোনা। আর কাব্য মাত্রই খাদ মেশান।

— খাঁটি সোনার তাল কেউ গলায় ঝোলায় না।

—তাতে সোনার দাম একটুও কমে না।

—বেশ, আপনি আপনার দাম নিয়েই থাকুন।

প্রসঙ্গটা চাপা দিল সুতপা। মনে মনে ভাবছিল সে, লোকটা এত সুন্দর কথা বলতে পারে। এত শিষ্ট আচরণ। সবার ওপরে নিজের ধ্যান-ধারণার প্রতি গভীর আস্থা ওর। তবু কেন সে প্রথম দিন এত গভীরভাবে আঘাত করেছিল? কেন এত রূঢ় আচরণ করেছিল? না কি প্রথম ওরকম কথা শুনেছিল বলেই আঘাত পেয়েছিল সে।

রজতের কথাটাকে বুঝতে না চেয়েই তার বিরোধিতা করেছিল সে। আর রজতও তাই পাল্টা আঘাত করেছিল।

আসলে রজত হয়ত কোন অবস্থাতেই গোঁজামিল দিয়ে নিজেকে প্রিয় করতে চায় না। তাই মাঝে মাঝেই ওর কথাগুলো কানে এসে লাগে। তিক্ত বিরক্ত হয় মনটা।

কিন্তু তাতে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন এ জগতের বাঞ্ছিত বস্তুগুলো ওর না পেলেও চলবে যদি সেগুলো পেতে ওর ধ্যান-ধারণাগুলো খর্ব করতে হয়। স্বর্গ সে চায় না, যদি স্বর্গে যেতে হলে জাল পাসপোর্ট দরকার হয়।

ভারি একগুয়ে লোকটা, সুতপা ভাবছিল মনে মনে।

হঠাৎ রজত বলে উঠল, একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না!

যেহেতু সুতপা একটা কিছু চিন্তা করছিল সেহেতু প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল রজতের কথায়।

পরে বলল, বলুন!

এবারে একটা সিগারেট ধরিয়ে রজত আস্তে আস্তে বলল, আপনি জানেন, আমি লোকটা গদ্যময়। আমিও তা অস্বীকার করি না। কাজেই, যা ভাবি স্পষ্টই বলি।

—বলছেন আর কই? শুধু তো ভূমিকাই করছেন।

—বলছি। কিন্তু তার আগে আপনি বলুন, আমার কথায় আপনার যদি রাগ হয় তো সেটা সোজাসুজি জানাবেন।

—বাঃ, কথাটা একটু বেশি আব্দারের মত শোনাচ্ছে না? আমার কি বলতে হবে, কি করতে হবে, সে-ও কি আপনি বলে দেবেন নাকি?

একটু থতমত খেয়ে গেল রজত সুতপার কথায়।

ঢোক গিলে বলল, না, তা নয়। বলছিলাম কি···আমার কথার স্পষ্ট জবাবই আপনি দেবেন।

—সেটা আমি ভেবে দেখব। তবে এটুকু আপনাকে জানিয়ে

রাখি স্পষ্ট কথা শুধু আপনি একাই বলতে পারেন তা নয়। সুতপার কথার বেশ একটু ঝাঁঝাল সুর প্রকাশ পেল।

সঙ্গে সঙ্গে রজতও হাল্‌কা সুর ভুলে গেল। বলল, তা হয়তো নয়, তবে আপনারা প্রিয় হবার লোভ প্রায়ই সামলাতে পারেন না।

—ভয় নেই, আপনার কাছে প্রিয় হতে চাইনে।

—ধন্যবাদ, আমার কথার জবাব পেয়ে গেছি।

সুতপা অবাক।

বিস্মিত চোখে বলল, আমি আবার কি জবাব দিলাম? আর আপনি প্রশ্নটাই বা কখন করলেন?

—খুব বেশি চটে না গেলে বুঝতে পারতেন।

—ঠিক আছে। এবার তাহলে বাড়ি ফেরা যাক।

—নিশ্চয়।

বাড়ির পথ ধরল ওরা।

অবশ্য দু'জনের পথ আলাদা। তবু সুতপাকে ওর বাসে তুলে দিয়ে তারপর নিজের পথে গেল রজত। আবার হয়ত দেখা হত কয়েকদিন পর। রজত অবশ্যই ওদের বাড়িতে আসত না। দেখা করার ব্যবস্থাটা সুতপাকেই করতে হত। কিন্তু তার আগেই আর একটা ঘটনা ঘটল।

এতদিনের মধ্যে যা হয়নি, সেদিন তাই হল।

নিজের কি একটা কাজে বাইরে বেরিয়েছিল সুতপা। ফিরতে ফিরতে বেলা প্রায় বারোটা বাজল। রোদ্দুরের তাপে রাঙা টুকটুকে হয়ে উঠেছিল ওর মুখ। ঘরে ঢুকেই কি করে একটু ঠাণ্ডা হবে ভাবছিল।

এমন সময় ওর বোন নমিতা এসে বলল, কোথায় গিয়েছিলি রে দিদি?

সুতপা তখন নিজেকে নিয়েই অস্থির। ওর কথার জবাব দেবার মত আগ্রহ কিংবা অবস্থা তার ছিল না।

কথার জবাব না পেয়ে নমিতা আবার বলল, ভবানীপুরে ?

সুতপা বিরক্তির সঙ্গে বলল, তা যেখানেই যাই না কেন, তোর তাতে কি ? মেলা বকবক করিসনে নমি, ভাল লাগে না ছাই।

—ও বাবা, মেজাজ ভাখ! নমিতাও এবারে ক্ষুব্ধ স্বরে বলল। বেশ, বুঝবে'খুনি একটু পরে। আমার কি ? আমি না হয় যাচ্ছি। বলেই অন্যত্র চলে যাচ্ছিল নমিতা।

সুতপার তখন হঠাৎই মনে হল, নমিতা হয়তো অন্য কিছু বলতে এসেছিল। হয়তো মা ওর খোঁজ করেছিল, কিংবা বাবা। কারণ যাবার সময় সে কাউকেই কিছু বলে যায়নি।

তাই একটু ঠাণ্ডা গলাতেই এবারে বলল সুতপা, কেন রে নমি, মা কিছু জিজ্ঞেস করেছিল আমার কথা ?

তখন নমিতার মেজাজ নেবার পালা।

সে তাই একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, সে তুই মাকেই জিজ্ঞেস করিস।

—আহা, বল না! কি জিজ্ঞেস করেছিল ? আর তুই কি বললি ?

কিন্তু নমিতা তখন একেবারেই বেঁকে বসেছে।

তাই গম্ভীরভাবে বলল, সে আমি জানি না।

—বেশ, বলবি না তো বলবি না। যা, ভাগ এখান থেকে। রেগেই বলল সুতপা। আর নমিতাও কিছু না বলে চলেই গেল। একটু পরেই এল সবার ছোট সুমিতা। হাতে তার একটি চিঠি। সে এসেই বলল, এই নে দিদি, তোর চিঠি।

এতক্ষণে বুঝল সুতপা, নমিতা এই চিঠি প্রসঙ্গেই কিছু বলতে এসেছিল। হয়তো এ নিয়ে কোন কথা উঠেছে বাড়িতে। কোন সন্দেহের ছায়া পড়েছে কারও মনে।

কেননা এর আগে ওর নামে আর কখনও কোন চিঠি আসেনি। বিশেষ এই খামের চিঠিও।

শঙ্কর কখনও চিঠি লেখেনি ওকে। ওদের যা কথা সব মুখোমুখিই হত। সুবিধা ছিল, কলেজে তো রোজই দেখা হত ওদের। কাজেই চিঠি লেখার কোন প্রয়োজনই হয়নি তখন।

একমাত্র নরেন একটি চিঠি লিখেছিল। সেক্ষেত্রেও সুতপা ছিল উপলক্ষ্য মাত্র। মায়ের নামেই এসেছিল চিঠিটা। মা-ই জবাব দিয়েছিল তার।

এই প্রথম সুতপার নিজের নামে চিঠি এল বাড়িতে। সেও আবার খামের চিঠি! সন্দেহের যথেষ্ট কারণ। চব্বিশ বছরের কুমারী মেয়ের নামে চিঠি মানেই নানা সন্দেহের জটলা।

কি ভেবেছে মা চিঠি দেখে, কি বলেছে, অত কথা ভাবার চাইতেও চিঠিটাই আগে দেখল সুতপা। বেশ যত্ন করে খামটি খুলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে পড়ল। কি জানি কেন, চিঠি খুলতে খুলতে বার বার কেন বুকটা দুর্ দুর্ করছিল। কানের পাশে একটু জ্বালা।

কিন্তু মাত্র দুটি ছত্র লেখা ছিল চিঠিতে।

অত্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে লিখেছিল রজত, আমি ভীরু নই, তা সত্বেও সেদিন বলতে আটকাল, সব ভাল-লাগাকেই প্রশ্রয় দিতে নেই। কিছু মনে করবেন না।

আশ্চর্য এক চিঠি! পড়ে মানে করাই দায়। কি যে বলল লোকটা তা কিছুই বুঝতে পারল না সুতপা।

এ আবার কি ধরনের চিঠি? কোন্ ভাষাতেই বা লেখা, কিছুই যেন মগজে ঢুকল না সুতপার।

কিন্তু এর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হল বিস্তর। ঠিক তখন নয়। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর।

সুধাদেবী পান চিবোতে চিবোতে এসে বসলেন সুতপার ঘরে। সঙ্গে খবরের কাগজটিও ছিল।

সুতপার খাটের একপাশে বসেই কিছুক্ষণ চোখ বোলালেন কাগজে। এপাতা-সেপাতা করলেন কিছুটা।

সুতপা একটা বই নিয়ে শুয়ে ছিল। সেদিকে ফিরেও তাকালেন না তিনি। যেন ওদিকে কোন দৃষ্টিই নেই তাঁর।

কিছুক্ষণ পর কাগজটাকে ঠেলে ফেললেন দূরে।

· ধুর ছাই, কোন খবরই থাকে না আজকাল কাগজে। সব এক-ঘেয়ে কথা। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললেন তিনি।

সুতপা বুঝল, মা তৈরি হলেন! এখনই ওকে কিছু বলবেন, সে-ও প্রস্তুত রইল মনে মনে।

ঠিক তাই। একটু পরেই জিজ্ঞেস করলেন, তোর কোন বন্ধু-টন্ধু লিখেছে বুঝি চিঠি? অত্যন্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠ তাঁর।

—না, বন্ধু নয়। যেন ভাববার মত কিছু নয় এমনি করেই জবাব দিল সুতপা।

তারপরেই অন্যকথা।

—তোরা সব কোত্থেকে বই-টই এনে পড়িস, আমি খুঁজে আর একটাকেও পাই না। আজকাল আর দুপুরে ঘুমও আসে না চুপ করে শুয়ে থাকতেও ভাল লাগে না ছাই।

তিনি নিজের একটা দুঃখের কথা বললেন।

—নেবে নাকি এটা? মেয়ে মায়ের দুঃখে সাহায্য করতে চাইল।

—কি বই এটা?

— মঞ্চকন্যা।

—নাঃ, থাক। মঞ্চকন্যার কথা জেনে কি হবে? নিজের কন্যাদের কথাই জানতে পারি না। তার আবার····হুঃ!

মাঝে ফাঁক রাখলেন কথার। খেদও প্রকাশ পেল।

— সে যদি তুমি না রাখতে চাও তো কে কি করবে?

মেয়ে বুঝেছিল মা কোন্ পথে হাঁটছে, তাই নিজেই একটু সুযোগ করে দিল। দেখা যাক কি বলে, এই ভাব।

—চাইতেই কি পারা যায়? এখন তোরা বড় হয়ে গেছিস। তোদের সব ব্যাপারে কি আমার নাক গলান চলে?

উদার মাতৃত্বের পরিচয় দিলেন সুধাদেবী।

তবে আর কি ? চুপ করে বসে থাক।

—চুপ করেই তো আছি। এখন যদি তোরা নিজে থেকে বলিস…

এবারেও ইচ্ছা করেই কথাটাকে ছেড়ে দিলেন শেষের দিকে।

—কি আবার বলব ? আর একপাশ ফিরে শুলো সুতপা। যেন বলার কথা ওর শেষ হয়ে গেছে। আর বিরক্ত না করলেই খুশি হবে সে।

তবুও তারপর বলল, ইচ্ছা করলে দেখতে পার চিঠিটা, টেবিলের ওপরেই আছে।

—সে কি কথা ? মেয়ের চিঠি কেন মা দেখতে যাবে ?.. বলছিলাম কি, কি করে ছেলেটা ? কোথায় থাকে, এই আর কি। সুযোগ বুঝে প্রশ্নটা করেই ফেললেন সুধাদেবী।

সরকারী লাইব্রেরীর এ্যাসিসটেণ্ট লাইব্রেরিয়ান।

—বাঃ! তবে তো বেশ ভাল চাকরি। নিজের খুশিটুকু জানালেন মেয়েকে।

—তাতে তোমার কি ? পাল্টা-প্রশ্ন করে মেয়ে।

— ওমা, আমার আবার কি হবে ? ভাল, তাই বললুম।

—বেশ। প্রসঙ্গটা শেষ করতে চাইল সুতপা।

কিন্তু মা তবুও এটা-সেটা করে আরও অনেক কথাই জানতে চেয়েছিল সেদিন। আর সুতপাও স্পষ্ট তাঁকে জানিয়ে দিল, তিনি যা ভাবছেন তেমন কিছুই নয় ব্যাপারটা। কোথায় পরিচয় হয়েছিল না জানালেও এটুকু জানিয়েছিল যে, ওর দিল্লী থেকে ফেরার পথেই গাড়িতে আলাপ হয় লোকটির সাথে ব্যস, আর বেশি কিছু নয়।

কেননা, সে তখন মনে মনে রজতের এই আকস্মিক পত্রাঘাতের কথাই ভাবছিল। আর সুধাদেবীও হয়তো ভেবে দেখলেন, একই সঙ্গে নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে লাভ নেই কিছু। তাতে মেয়ে যাও বা বলত রাগে তাও হয়ত বলবে না।

তাই একটু পরেই মাঝারি রকমের একটি হাই তুলে বললেন, যাই, পিঠটা একটু টান করে নিইগে। শরীরটা যেন ভেঙে-চুরে যাচ্ছে।

বলে গাটাকে যেন কোনরকমে টেনে নিয়ে গেলেন তিনি।

সুতপাও পাশ ফিরে শুয়ে একবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম এল না। কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে চারটে বাজতেই উঠে পড়ল। রজতের সঙ্গে একবার দেখা করার প্রয়োজন বোধ করছিল সে। তার চিঠিটার অর্থ বুঝে নেওয়া দরকার।

দেখা হল রজতের সঙ্গে। রজত ওকে হয়ত সেদিনই আশা করেনি। তাই একটু অবাক হয়েই বলল, আপনি?

সুতপাও কিছুমাত্র ভূমিকা না করেই বলল, হ্যাঁ, এলাম একটা কথার মানে জানতে।

—কি?

নিজের ব্যাগ খুলে চিঠিটা বের করে রজতের সামনে ধরে বলল, এটার মানে কি?

সুতপা কি জানতে চায় বুঝতে রজতের এক মিনিটও লাগল না, তবু নিজেই সেটাকে নিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইল না।

গম্ভীরভাবে শুধু বলল, ওটুকু বোঝবার ক্ষমতা আপনার নিশ্চয় আছে।

—না। তাহলে আর অনর্থক এতটা পথ আসতাম না। যা লিখেছেন, তা বুঝিয়ে বলতে আপনার আপত্তি কি?

সুতপার কথায় বিন্দুমাত্র দুর্বলতা নেই। এ সেই মেয়ে, যে দিল্লীতে রজতের মুখোমুখি সমানে তীক্ষ্ণ বাক্য-বিনিময় করেছিল আত্ম-সম্মানে ঘা লাগাতে। সেখানে সে ক্ষমাহীন।

—আমার বিশ্বাস, দুর্বোধ্য কিছু বলিনি।

রজতও মনে মনে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হচ্ছিল।

—দেখুন রজতবাবু, কতকগুলো কথার আড়ালে নিজেকে লুকানোর চেষ্টাটাকে আর যাই বলুন, সাহসিকতা বলে না। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, একজন শিক্ষিত মানুষ কি করে ভাবতে পারে যে, একটি মেয়ে তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বললে কিংবা দু'দিন বেড়ালেই সে অমনি ছেলেটিকে ভালবাসতে শুরু করে? যার জন্য বলিষ্ঠ পুরুষের মত আচরণ করার লোভ সে আর সামলাতে পারে না? তাই ছোট্ট একটি পত্রের তবু দুটি ছত্রে সে মোহ-মুদ্গরের ব্যবস্থা করে? এটা কি খুব শিক্ষিত আচরণ?

যথাসাধ্য সংযতভাবে বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সুতপার চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে চাপা উত্তেজনায়।

রজত তবুও শান্তকণ্ঠেই বলল, আপনি একটু ভুল বুঝেছেন, তাই অতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। দেখুন, কি করে একটি মেয়ে একটি ছেলেকে কিংবা একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসতে শুরু করে, সে তত্ত্ব আমার ঠিক জানা নেই। ও নিয়ে আমি কোন কথাও বলতে চাই না। তবে এটা ঠিক, কোন পক্ষ যদি নিজেকে বুঝতে পারে, তবে তার অনুরূপ ব্যবস্থাই তার করা উচিত তাতে তার লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন।

—তাতে অন্যপক্ষের মতের কোন প্রয়োজনই থাকে না বুঝি?

—থাকে। ছোট্ট জবাব রজতের।

—তবে?

— কিছুই নয়। এক পক্ষের মতটা স্পষ্টত জানলে অন্য পক্ষের সিদ্ধান্ত নেবার কোন অসুবিধাই থাকতে পারে না। যদি তাকে ভালবেসে থাকে তাহলেও নয়, ভাল না বাসলেও নয়।

—তবে তার এই অহেতুক আচরণের উদ্দেশ্য?

— সেকথা ব্যাখ্যা করে কাউকে বোঝান যায় না। শুধু একটা কথা আপনাকে বলি, মিস সেন। আত্মসম্মানবোধ থাকাটা ভাল। কিন্তু কারো সম্মানকে আঘাত করে তা পাওয়া যায় না।

এমনি কথা-কাটাকাটি হল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় হয়তো কথা ফুরিয়ে যাওয়াতেই হোক কিংবা নিজের আচরণের জন্যই হোক চুপ করে গেল সুতপা।

কিন্তু ওখানেই যদি সবকিছু ফুরিয়ে যেত, আজ সুতপা সেন তার এই বোর্ডিং হাউসের বিছানায় শুয়ে ভাবছে, তাহলে পরবর্তীকালে ওর জীবনে এত বড় একটা কলঙ্কময় অধ্যায় অলিখিতই থেকে যেত। সে কলঙ্ক এত বিশ্রী করে ছড়িয়ে পড়ত না ওর চোখে-মুখে-দেহে। এমন কুৎসিতভাবে ওদের গোটা পরিবারটাকেও কালিমালিপ্ত করতে পারত না।

যদিও ও ব্যাপারের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্বটাই ওর ছিল না বলেই সুতপার আজও ধারণা। শেষ মুহূর্তে সে তো সরে যেতেই চেয়েছিল। সমাজ আর সংসারের বিধি-নিষেধের কথা ভেবে নিজের সুখটুকু তো সে ছেড়েই দিতে চেয়েছিল। একটা মানুষের সুখের জন্য গোটা পরিবারকে দুঃখে ফেলতে সে চায়নি। নমিতা সুমিতা বাবা আর মা, সবার কথাই তো সে ভেবেছিল। ভেবে দেখেছিল সুতপা, ও যদি শেষ পর্যন্ত ওর সুখের পথটাকেই বেছে নেয় তো অতগুলো মানুষ চিরকালের জন্য লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকবে। সারা জীবন তারা অভিশাপ দেবে ওকে। ওদের সেই দীর্ঘশ্বাস সুতপার বাকি জীবনটাকেই পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। তাই সরেই যেতে চেয়েছিল সে রজতের কাছ থেকে।

কিন্তু রজত তা দিল না।

বলল, আজ আমাদের সরে যাওয়াটাও সমাজের কাছে ততটাই অপরাধ, যতটা অপরাধ সরে না যাওয়াতে। সমাজ তোমার কাছে তার বিধি-ব্যবস্থাকে মেনে চলার দাবীই করে। কিন্তু তা সততার সঙ্গেই মানা চাই। নইলে, সমাজকেও মানা হয় না, নিজেকেও অপমান করা হয়।

সুতপা মাথা নীচু করে শুনছিল ওর কথা।

রজত বলতে থাকে, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের পরিচয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরেও আমরা জানতাম না আমাদের পারিবারিক সম্পর্কের কথা। আজ যখন তা জানলাম, তখন আমাদের কাছে এটা একটা মস্ত সমস্যা। এতদিনের মেলামেশাকে অস্বীকার করে আজ যদি আমরা নিজের নিজের পথে সরে যাই, তাহলে সমাজের অগোচরে আমরা বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারি! কিন্তু তাতে কি আমরা আরও ডজনখানেক লোককে ঠকাব না? অথচ, কেন? তারা তো আমাদের কোন ক্ষতি করেনি। সরল বিশ্বাসেই আর একটি মেয়ে আমার স্বামিত্বকে এবং একটি পুরুষ তোমার পত্নীত্বকে মেনে নেবে। অথচ তারা ঘুণাক্ষরেও জানবে না, কি চরম বিশ্বাস-ঘাতকতাই না আমরা করছি? এটা পাপ নয়? এও যদি পাপ না হয় সুতপা, তো আমাদের মিলিত জীবন অনেক বেশি পুণ্যের হবে। কেননা, আমাদের মিলন শুধু এ সমাজেই বাধা। অন্যান্য অনেক সমাজেই এটা কোন বাধা নয়, সমস্যা নয়। তাই বলছি, একটা সামাজিক সংস্কারকে মানার চাইতে মানসিক সততার দাম অনেক বেশি।

যেহেতু ওদের সমস্যাটা ছিল খুবই গভীর এবং জটিল, তাই তার ধাক্কায় সুতপার চিন্তাশক্তিও হয়ে গিয়েছিল এলোমেলো। সেহেতু সে তখন রজতের বক্তব্যকে খুব ভালভাবে ছিন্ন করতে পারছিল না।

তবু সে এবারে বলল, কিন্তু যে সমাজে আমরা থাকি তার কথাই আমরা ভাবব। অন্য সমাজ কি করছে না করছে, তা দেখে আমাদের লাভ?

রজত শান্তভাবেই বলল, আছে বৈকি! অন্য সমাজটাও তো মানুষেরই সমাজ! তারাও তো মানুষের ভাল-মন্দের ভাবনাই ভাবে! নইলে তো ওটাও মিথ্যা হয়ে যায়। আর কোন একটা সমাজের ভাল আর একটা সমাজে অচল হয়ে থাকে না। তাই এক সমাজের ভাল আর এক সমাজে চলে আসে। এমনি করে অন্য সমাজের অনেক

বিধানই আমাদের সমাজেও চলে এসেছে। যে সমাজ একে বাধা দিয়েছে, সেই মরে পাথর হয়ে আছে। নয়তো প্রস্তরযুগেই আছে।

সেদিন আলোচনা ওই পর্যন্তই রইল। এরপরে যে আর কি বলা যায়, তা তখনই ভেবে পেল না সুতপা। তাই চুপ করেই রইল।

কিন্তু একটু পরেই আবার একটি প্রশ্ন মনে এল ওর। পথ চলতে চলতে তাই বলল, কিন্তু রজত, সমাজের এতসব সংস্কারের কথা যে আজ আমরা ভাবছি, এর পেছনে কি আমাদের কোন স্বার্থ বা লোভ কাজ করছে না? এটা কি তোমার একবারও মনে হচ্ছে না, নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগছে বলেই আজ আমরা একে একটা অর্থহীন সংস্কার বলে ভাবছি?

রজত তখন সিগারেটের প্যাকেটের জন্য পকেট হাতড়াচ্ছিল। সেটা পেয়েই বলল, স্বার্থ আর লোভ এক নয়, সুতপা। এখানে আমাদের স্বার্থ আছে, লোভ নেই।

– সেই স্বার্থ-চিন্তাই কি মানুষের ন্যায়-নীতিবোধকে ভেঙে দেয় না? ন্যায়ের চাইতে স্বার্থটাই কি বড় হয়ে ওঠে না?

—না, তা করে না বলেই আমার বিশ্বাস, সুতপা। লোভ মানুষের বিচারশক্তিকে ঢেকে দেয়। কিন্তু স্বার্থ তো লোভ নয়।

—তবে আর মানুষ স্বার্থত্যাগ করতে বলে কেন?

ততক্ষণে রজত একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। সেটাতে দু'একটা টান দিয়ে বলল, বলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঠকানোর জন্য। আর যাঁরা সে উদ্দেশ্যে বলেন না, তাঁদের কথাটার অর্থও অন্য রকম। তাঁরা বলেন, তুমি এমন কিছু করো না যাতে আর দশজনের স্বার্থে অন্যায়ভাবে আঘাত করে। অর্থাৎ তোমার বাড়ির নোংরা সরানর জন্য তুমি পাশের বাড়ির দেওয়াল ভেঙে নর্দমা করো না। কিন্তু তোমার বাড়ির নোংরা বাইরে ফেলতে তাঁরা নিষেধ করেননি।

শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতই রইল সেদিন ওদের আলোচনা। কেননা যুক্তিতে না টিকলেও মনে মনে যেন রজতের কথাগুলি

মেনে নিতে পারল না সুতপা। তাই মনে মনে নানা কথাই ভাবতে লাগল সে।

এবং পরে একদিন রজতকে সে লিখে জানাল, তোমার কথা যুক্তি দিয়ে কাটাতে না পারলেও তাতে আমার মন মানছে না, রজত। আমি ভাবতেই পারি না, আমরা কিছু একটা করে ফেললে বাড়ির অবস্থাটা কি হবে। মা যে আমার লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে বুক ফেটে মরে যাবে। আর বাবা? তিনিই কি কম দুঃখ, কম অপমানিত বোধ করবেন? এমনিতে গম্ভীর মানুষ তিনি। সুখ-দুঃখের কোন বাহ্যিক প্রকাশ তাঁর হয়তো নেই। তাই মুখে হয়তো তিনি কিছুই বলবেন না। কিন্তু মনে মনে কি তিনিও কম ব্যথা পাবেন? আর আমার ছোট বোনেরা? ওরা কি ভাববে বল তো? হয়ত মুখ ফুটে কিছু বলবে না। কিন্তু মনে মনে ওদের কি কম অভিযোগ থাকবে? মনে মনে ওরাও কি বলবে না, দিদি, শুধু নিজের কথাটাই ভাবলি? আমাদের কথা একবারও তোর মনে পড়ল না? আমরা তোর ছোট বোন, এমনিতে কত আদর করিস, সে সবই কি মিথ্যা? বলতো রজত, এতগুলো মানুষের কথা আমি ভুলি কি করে? তাই নিজের সুখকেই জলাঞ্জলি দিলাম। ইতি—তোমার চিরকালের জ্বালা।

রজতও সেকথার জবাবে লিখল, তোমার সিদ্ধান্তের দায়িত্ব তোমার। আবেগ-কম্পিত অনেক উদারতাই তুমি তোমার সংসারে দেখাতে পার। তাতে কারও কিছুই বলার নেই। কিন্তু যেহেতু তোমাদের ন্যায়-নীতি প্রীতিটা একটু বেশি এবং সে কারণেই অত্যন্ত নির্বোধ প্রীতি, সেহেতু তোমাদের সত্যিকারের নীতিবোধটা কত প্রখর তা একবার দেখতে চাই। এরপর যদি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা হয় এবং তা হবেই আশা করি, তখন তোমার এই অভূতপূর্ব নীতি-বোধটা ওদের সঙ্গে যাচাই করে নেবে তো? নইলে আমাকেই সেই কাজটি করতে হবে। কারণ, তোমাদের নীতি-বোধটা যে দ্বিতীয় লোভের বাসাকে ঢেকে রাখার কৌশল মাত্র সেটা আমি একবার পরখ করে দেখবো। ইতি – রজত।

ঐ পর্যন্তই ওদের সম্বন্ধ শেষ। আর দেখা করেনি সুতপা রজতের সঙ্গে। রজতও আসেনি কখনো। দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলে গেল ওরকমভাবেই।

ধীরে ধীরে সুতপা ভাবল, রজত এতদিনে বুঝেছে ওর কথার যৌক্তিকতা। এও বুঝেছে, অনেক দুঃখেই নিজের সুখটুকু বিসর্জন দিয়েছে সে। রজতকে ফাঁকি দেওয়া ওর উদ্দেশ্য ছিল না, নিজেও সে মস্ত ফাঁকেই পড়েছে।

এর মধ্যে দু'একটা সম্বন্ধ এসেছিল সুতপার। কিন্তু সে নিজেই সেগুলোকে ভেঙে দিয়েছে। নানা অজুহাত দেখিয়েছে সে। মা প্রথম প্রথম বোঝাতেন। পরে বকাবকি সুরু করল। তাতেও ফল হল না দেখে পরে কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

প্রায় সময়েই সুতপাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, তোদের স্বাধীনতা দিয়েছি বলে তোরা আমায় অপমান করবি? তোদের জন্য ওঁর কাছে উঠতে-বসতে কথা শুনতে হয় আমাকে। তাছাড়া আর দশ-জনেই বা কি বলে! বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে, ঘরে তিন-তিনটে ধিঙ্গি মেয়ে, কোন ব্যবস্থাই করছি না আমরা। বেশ নিশ্চিন্তে খাচ্ছি আর ঘুমুচ্ছি। আর ওদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। নিজেদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে। মেয়ে বড় হলে যে মায়ের গলার কাঁটা হয়, সেটাও কি বুঝিস না?

এমনি নানা মন্তব্য লেগেই থাকত।

মাঝে মাঝে বলতেন, সত্যি সত্যি আমায় গলায় দড়িই দিতে হবে দেখছি। মরি আমি, তারপর বুঝবি ধিঙ্-ধিঙ্ করে ঘুরে বেড়ানোর কি মজা!

তাতেও কোন কাজ হচ্ছিল না। কিন্তু একদিন সুতপার মনে মায়ের দুঃখটা গভীরভাবে রেখাপাত করল। ওর মনটাও যন্ত্রণায় ছট-ফট করতে লাগল।

সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ কোথা থেকে যেন ফিরছিল সে। নিঃশব্দেই

ঘরে ঢুকেছিল। নমিতা আর সুমিতা কোণের ঘরে বসে কি যেন করছিল। বাড়িটা নিস্তব্ধ ছিল একেবারে। হঠাৎ একটা ফোঁস ফোঁস আওয়াজ কানে এল ওর। ঘরের চারদিকে কিছু নজরে না পড়াতে পাশের ঘরে উঁকি মারল সে।

আর তাতেই অবাক।

দেখল, মা বসে বসে আহ্নিক করছেন। চোখ বুজে আছেন তিনি। তবুও তাঁর দু'চোখের কোল বেয়ে টস্‌টস্‌ করে জল পড়ছে। ধীর পায়ে একটু কাছে এগিয়ে গেল সুতপা।

শুনতে পেল, মা অস্ফুট স্বরে বলছে, আমায় তুমি নাও ঠাকুর। আমি আর পারি না। কাউকেই বোঝাতে পারি না আমার দুঃখ। তুমি তো সব বোঝ। তবে কেন আমায় নাও না? কেন, কেন, কেন?

কি যে হল সুতপার। কোন কথাই ওর বলার ছিল না। তবুও মার পাশে গিয়ে আস্তে করে বসল। তারপর খুবই আস্তে আস্তে ডাকল, মা, মা।

আহ্নিকের আসনে তখনও বসে সুধাদেবী। হঠাৎ ঘুরে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। মা ও মেয়ে দু'জনেই নীরব। দু'জনেরই চোখে জল।

কোন কথাই ওরা বলেনি। তবু যেন অনেক কথাই বলা হয়ে গেল।

আর তার কয়েক মাস পরেই সুতপার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। সবই ঠিক হয়ে যাচ্ছিল। সবই স্বাভাবিক।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে রজত তার কথার দাম রাখল। সমস্ত বিয়ে-বাড়িটাকে বিরাট এক ঝাঁকুনি দিয়ে তছনছ করে দিল সে। সব একেবারে লণ্ড-ভণ্ড।

মানুষের জীবনে কত অঘটনই না ঘটে।

সুতপা আজ যেন নতুন করে কথাটার অর্থ বুঝতে পারল।

যে-আকাশটা এতক্ষণ মেঘে মেঘে ছেয়ে ছিল এখন তা থেকে জল পড়তে সুরু হল। ঝপ্ ঝপ্ করে জল পড়তে লাগল।

চিন্তার ঘোরটা কেটে গেল সুতপার। জানলা দিয়ে জলের ছাঁট আসছিল। তাই ধড়ফড় করে উঠে জানলা বন্ধ করতে গেল। আর তখনই সে দেখল, ইভা আর সীমা একই ছাতা মাথায় দিয়ে জড়াজড়ি করে আসছে।

ঘাড় ফিরিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে সে অবাক! এ কি, দশটা বাজে? মনে মনে ভাবল, ওরা যদি স্কুল থেকে এসেও ওকে শুয়ে থাকতে দেখে তো ভারি বিশ্রী হবে।

তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় গুছিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুতপা সেন।

বিয়ের ব্যাপারে অমন বিশ্রী একটা কাণ্ড হয়ে গেল বলেই হয়তো সুতপার জীবনের সহজ ধারাটা একেবারে ওলট-পালট হয়ে গেল। আর দশটা মেয়ের মত স্বাভাবিকভাবে জীবনের পথ পরিক্রমা আর সম্ভব হল না ওর পক্ষে। ওর এতদিনের বন্ধু বেলা, রেবা আর বিভার মত কোন নিশ্চিত ভবিষ্যৎ যে ওর আর নেই, খুব বেশি চিন্তাশীল না হলেও কেমন করে যেন সুতপা তা বুঝে ফেলেছিল।

কিছুদিন পর্যন্ত ঐ চিন্তাটা ওকে বড়ই বিমর্ষ আর বিষণ্ণ করে ফেলেছিল। নিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতিই মেয়েদের গভীর আকর্ষণ। ওতেই ওরা আনন্দ পায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

জীবনের আদর্শ, শিক্ষা আর অভিলাষ ওসবের কোন মূল্য নেই ওদের কাছে। বরং স্নো-পাউডার শাড়ি আর গয়নার অভাববোধ ওদের জীবনকে কখনও কখনও বিক্ষুব্ধ করে তোলে, কিন্তু আদর্শ-টাদর্শর মত সামান্য জিনিসের জন্য ওদের বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। এবং যদিও সুতপা বেশ উচ্চ-শিক্ষিতাই বটে, তবুও মূলতঃ আর দশটা সামান্য মেয়ের সঙ্গে ওর তফাৎ সামান্য।

সেজন্যই জীবনের সহজ পথ থেকে হঠাৎ আকস্মিকভাবে সরে যেতে বাধ্য হওয়াতে প্রথমটায় সুতপা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। লজ্জা পেয়েছিল—লজ্জার কারণে অসহ্য এক যন্ত্রণায় ছটফট করেছিল সে।

কিন্তু কালের প্রভাবে গভীর লজ্জাও ফিকে হয়ে যায়, যন্ত্রণার তীব্রতাও হাল্কা হয়ে আসে। সুতপার জীবনেও তার ব্যতিক্রম হল না।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল সে। একটা সহজ সিদ্ধান্তও করে নিল। যা হবার তা হয়েছে, ওনিয়ে ভেবে আর কোন লাভ নেই।

ভবিষ্যতে যা হবে এখন থেকেই সে অঙ্ক কষে কোন লাভ নেই। অনেক পরিশ্রমের পর হয়তো দেখা যাবে, সে অঙ্কও কষা হয়েছে ভুল।

কাজেই, অনেক ভেবে-চিন্তে সে এই স্কুল-মাস্টারীটা নিল। যাদব-পুরের মেয়ে শ্যামবাজারে কাজ বেছে নিল। এবং যদিও যাতায়াত করেই চাকরিটা চলত তবুও বোর্ডিংএ সীট নিল সে। ইচ্ছা, বাড়িটাকে একটু দূরে সরিয়ে রাখা। যে বাড়ি ওকে নিশ্চিত নিবিড় কোন আশ্রয় দিল না, বা দিতে পারল না, সেটাস্তে অত্ত জড়িয়ে থেকে কি লাভ!

বরং ও-বাড়িটার বাইরে থাকলেই হয়তো অনেক দোষ সত্ত্বেও একটা ভালবাসার টান থাকতেও পারে। ব্যবধানের আকর্ষণ।

এখানে এসে প্রথমটায় খুব স্বস্তি বোধ করেনি সে। কেমন একটা খাপছাড়া-খাপছাড়া ভাব। কি একটা যেন নেই। কি একটা যেন হারিয়ে গেছে। অথচ সেটা ঠিক কি জিনিস, তাও স্পষ্ট ধরতে পারল না সে।

খাওয়া-পরা-থাকা সবকিছুই নির্ধারিত এবং নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও পরিচিত আত্মীয়তার অভাবেই যে সবকিছু এমন বেখাপ্পা ঠেকছিল কিছুদিন পরেই সেটা বুঝেছিল সুতপা। কিন্তু বুঝেও তার করবার কিছুই ছিল না।

তাই নীরবে সে ব্যথা সহ্য করছিল সে।

যন্ত্রণাটাকে ভোলবার জন্যই অবসর সময়ে সে বইয়ে মনযোগ দিতে চেষ্টা করত। কিন্তু মন ঠিক বসত না। চোখ বইয়ের পাতায় থাকলেও মন ছুটে বেড়াত অন্যত্র। সে বল্গা হীন মনকে আয়ত্বে আনবার আপ্রাণ প্রয়াসে তখন ক্লান্ত সুতপা।

অবশ্য এ বোর্ডিংএ ওর বয়সী আরও ক'টি মেয়ে আছে এবং ওরা বেশ সহজ স্ফূর্তিতেই দিন কাটায়। ওদের কথা ভেবে সুতপার বুক থেকে শুধু ঠাণ্ডা আর ভারী দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। নিজেকে ওর আরও বেশি অসহায় বোধ হয়। কেন যেন কান্না আসে।

ওরা অবশ্য প্রথম দিনেই ওর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল।

আন্তরিকতার সঙ্গেই ভাব করতে এসেছিল। চেয়েছিল ভাবের আদান-প্রদান।

সেদিনই সন্ধ্যায়ই ওরা চারজন, ইভা, অঞ্জলি, সীমা আর নন্দিতা ওর সীটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল পরিচয় করার জন্য।

ইভাই প্রথম কথা বলছিল, আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে এলাম।

সুতপা সীটের একপাশে পা গুটিয়ে বসে বলেছিল, বেশ তো, বসুন।

কেউ ওর সীটেরই একপাশে কেউবা এদিক-সেদিক থেকে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ভব্য-সভ্যভাবে।

আবার ইভাই বলল, এই প্রথম নাকি ?

ওর প্রশ্নটা বহু অর্থবহ। সুতপা ঠিক বুঝতে পারল না, কি বলতে চাইছে ইভা।

তাই জিজ্ঞেস করল, কী ?

—এই, চাকরির কথা বলছি। এর আগে কোথাও করতেন নাকি ?

—নাঃ, এই প্রথম।

পরিমিত জবাব দিল সুতপা।

—ওঃ, তাহলে তো আমরা সবাই আপনার সিনিয়র। তবে আর কি, এবার থেকে আমরা যা বলব তাই মেনে চলবেন, নইলেই বিপদ।

—কী ?

—সে কি একরকম যে, আগে থেকেই আপনাকে বলে যাব ? অবস্থা বুঝে তো ব্যবস্থা, কি বলিস ?

বলে চোখ ঘোরাল বান্ধবীদের দিকে। ওরা কোন কথা বলল না। কিন্তু চোখে চোখে ইভাকে নীরব সমর্থন জানাল।

একটু যেন ভয়ই পেয়ে গেল সুতপা ইভার কথায়। কী ব্যাপার ওদের, কে জানে !

নতুন জায়গা, নতুন মানুষ। কে জানে কিসে থেকে কি হয় !

একটু ভীত গলাতেই বলল সুতপা, কেন, আমি কি কোন অন্যায় করেছি ?

—না, করেননি। কিন্তু করতেও তো পারেন?

অভিভাবিকা সুলভ ভঙ্গীতে বলল ইভা।

এবারে বেশ একটু দৃঢ়তার সঙ্গেই সুতপা বলল, নিশ্চিন্তে থাকুন আপনারা। অন্যায় কিছু হয়তো আমি করব না।

কথাটা বলেই একটু আনন্দ পেল সুতপা। বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ জবাবই সে দিয়েছে। ওদের অন্যায় অভিভাবকত্বে বেশ কিছুটা আঘাত করতে পেরেছে সে।

কিন্তু এতে ফল হল উল্টো।

ইভা বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বান্ধবীদের বলল, ওরে শুনেছিস কি বলল? আরে এ যে এখনই আমাদের সাজেস্ট করে! কি কাণ্ড বাবা! আমাদের বলে কিনা নিশ্চিন্ত থাকুন? আমরা, চার-চারটে ডাকসেঁটে মাষ্টার নিশ্চিন্তে থাকি আর ও নতুন এসে আমাদের ওপর খবরদারী করুক, এটাই ওর মতলব। ও বাব্বা, এত সোজা পাত্রী নয়! এবারে সুতপার চোখে চোখ রেখে বেশ একটু চোখ পাকিয়েই ইভা বলল, দাঁড়াও, টের পাওয়াচ্ছি মজা। অঞ্জু, তুই যা তো, এর ঘরের লাইনটা কেটে দিয়ে আয় তো। থাকুক বাছাধন অন্ধকার ঘরে।

তবু একবার শেষ চেষ্টা করল সুতপা।

বলল, আপনারা তা করতে পারেন না!

—পারি কিনা এক্ষুণি দেখাচ্ছি। যা তো অঞ্জু। বড্ড বাড় বেড়েছে।

সমস্ত ব্যাপারটাই নাটুকে। অভাবনীয়। এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। প্রথম পরিচয়ে কেউ এমন অসভ্য ব্যবহার করেনা, কিন্তু ওরা করছে।

ইভার কথায় অঞ্জলি নামের মেয়েটি সত্যি সত্যি বাইরের দিকে চলল দেখে সুতপা সত্যি ঘাবড়ে গেল।

একটু ঢোক গিলে সে বলল, দেখুন, আপনাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই এরকম বিশ্রী ব্যাপার হবে আশা করিনি। তবু যখন হল, তখন বাধ্য হয়েই বলছি, আমার কোন ত্রুটি হলে মাফ করবেন।

এবারে ওর কাণ্ড দেখে ওরা সবাই একসঙ্গে হো, হো করে হেসে উঠল।

সুতপা অবাক। এ আবার কি।

ইভা হঠাৎ ওর দুই কাঁধে হাত রেখে বলল, তাহলে তুমি সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে বলো? আরে বাবা, মাথায় মুগুর দিয়ে মারলেও তো অঞ্জু ইলেকট্রিকের তার হাত দিয়ে ছোঁবে না। ওর কাছে তারে হাত দেওয়া আর সাপের গায়ে হাত দেওয়া একই ব্যাপার। শুধু তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যই ওযাবার পোজ্ করেছিল। তাহলে স্বীকার করছ, আমরা সাক্‌সেসফুল অভিনয় করেছি?

সুতপাও তখন মুচকি হেসে বলল, তা করেছেন। আমি সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

—তা আর পাবে না? চার চারটে সিনিয়র মাষ্টার, তুমি একা পেরে উঠবে কেন?

কথায় কথায় ইতিমধ্যে ইভা সুতপাকে তুমি বলে ফেলেছে। এবারে সে তাই বলল, কিছু মনে কর না ভাই। খুব বেশিক্ষণ আপনি-আজ্ঞে করতে পারিনে। তাছাড়া, আমরা সবাই তুই-তোকারি করে কথা বলে থাকি। তুমি যদি কিছু মনে না কর তো আমাকেও তুমি বলেই বলবে। কি বল ভাই?

—বেশ তো, তাই বলবেন। আন্তরিকতার টান না থাকলেও ওদের কথা মেনে নিল সুতপা।

—বলবেন না নয়, বল, বলবে। ইভা সুতপাকে শুধরে দিল।

—আচ্ছা বলবো।

ব্যাপারটা তেমন কিছু নয় তবু সকলেই একটু হাসি হাসি ভাব ফুটিয়ে তুলল তাদের মুখে। নতুনের বন্ধুত্বকে স্বাগত জানাল।

এরপর ইভাই ওদের সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিল। একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠল ওদের মধ্যে।

মোটামুটি মন্দ লাগল না সুতপার। প্রায়-সমবয়সী কয়েকটি

মেয়ে। প্রায় সম-অবস্থার। কাজেই, মোটামুটি একটা মানসিক মিল খুঁজে পেল সুতপা।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সুতপা নিজেকে একটু দূরে দূরেই রাখতে চেয়েছিল। ভয় ছিল, অতি-ঘনিষ্ঠতায় অনেক কথাই প্রকাশ হয়ে যেতে পারে যা ওর লজ্জাকেই বাড়াবে। অতীতের লজ্জা বর্তমানের মুখে কালি মেখে দেবে। বন্ধুত্বের মাধুর্য এক নিমেষে বিষ হয়ে উঠবে। কালো তেতো বিষ।

তার চাইতে এই ভাল। গাম্ভীর্যের ব্যবধান দিয়ে মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব হত না। যাদের সঙ্গে দিনের পর দিন একসঙ্গে খাওয়া-শোওয়া-থাকা সব সময় তাদের আব্দার-অনুরোধ এড়ান সম্ভব নয়। তাতে ওদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। অপমান করা হয় ওদের।

প্রথম প্রথম এরকম বিরোধ মাঝে মাঝে দেখা দিত। তখন সুতপা চেষ্টা করত ওদের এড়িয়ে চলতে। কিন্তু ওরা নাছোড়।

একদিন সিনেমা যাওয়া নিয়েই এরকম একটা অপ্রীতিকর অবস্থা ঘনিয়ে উঠেছিল। শেষ মুহূর্তে কোন রকমে সামাল দিতে হয়েছিল সুতপাকে।

বোধ হয় সেটা কোন এক শনিবারের কথা। আগের দিন মাইনে পেয়েছে ওরা। সুতপার ওই প্রথম মাসের মাইনে।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই ওকে ধরে বসল, আজ আমাদের সব্বাইকে সিনেমা দেখাতে হবে তোমার। কাল প্রথম মাইনে পেয়েছ। কালই আবার "অয়নান্ত" রিলিজ করেছে। বাব্বা, কতদিন যাবৎ হা-পিত্যেশ করে বসে আছি। বইটার জন্য!

প্রস্তাবটা করল অঞ্জলি। সিনেমার ব্যাপারে ওর আগ্রহটা একটু বেশি।

অন্তত ইভা, নন্দিতা আর সীমার মতে। সিনেমার নামেই নাকি ওর চোখে-মুখে একটা উত্তেজনার ভাব ফুটে ওঠে।

প্রস্তাব করার সময় অঞ্জলির মুখের ভাব দেখে সুতপারও তাই মনে হয়েছিল। তবে সে বিষয়ে কোন মন্তব্য না করে সে চুপ করেই রইল। অপেক্ষা করল, আর কে কি বলতে চায়।

অঞ্জলির কথার শেষেই ইভা বলল, তোর আহ্ আর উহ্ রাখ তো, অঞ্জু। তুই শুধু আমাদের বোর্ডিংয়ের সংবিধানটা ওকে জানিয়ে দে, ব্যস।

—বোর্ডিংয়ের আবার সংবিধান কি?

সুতপা বিস্মিত হল!

—এক্ষুণি জানিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সংবিধান মতে—কোন নতুন সদস্যা এখানকার বোর্ডিংয়ত্ব অর্থাৎ নাগরিক অধিকার অর্থাৎ বোর্ডিংয়ত্ব অধিকার অর্থাৎ……।

—অর্থাৎ তোর মাথা। কেবল অর্থাৎ অর্থাৎ করেই মরছে।

অঞ্জলিকে বাধা দিল সীমা।

—মানে, ব্যাপারটাকে বেশ প্রাঞ্জল করে দিতে চাই কিনা? নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে কৈফিয়ৎ দিল অঞ্জলি।

এক্ষেত্রে সুতপা নীরব দর্শক আর শ্রোতা।

নন্দিতা মিষ্টি করে বলল, প্রাঞ্জল করতে গিয়ে সবাইকে আবার গভীর জলে ফেলে দিস না, তাহলেই হবে।

যেন বেশ একটু রাগ করেছে এমনিভাবে অঞ্জলি বলল, বেশ, তাহলে তোরাই বল।

ইভা ওর মান ভাঙানোর জন্য বলল, আহা, রাগ করছিস কেন? তোর মত সহজ করে কি আর ওরা বলতে পারবে? না ভাই, তুই-ই বল।

বোধ করি, সিনেমা দেখার মত একটা মহৎ ব্যাপার বলেই অঞ্জলি তখন আর রাগ করল না।

বলল, ছাখ ভাই, সোজা কথা হচ্ছে, আমাদের বোর্ডিং-এ কোন নতুন বোর্ডার এলেই নিয়ম-মাফিক প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে তাকে অন্যান্যদের সিনেমা এবং খাওয়া খরচ দিতে হবে, বুঝলে ?

ঠিক না দেবার জন্য নয়, তবু একটু জল ঘোলা করার জন্যেই সুতপা বলল, আর যদি কেউ তা না দেয় ?

—তাহলে আমরাই কষ্ট করে তার বের্ডিং আর জামা-কাপড় গুছিয়ে খোলা গেটটা দেখিয়ে দেব।

বিচার পতির ভঙ্গীতে ইভা রায় শোনাল।

সুতপাও তৎক্ষণাৎ প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্যে বলল, তাহলে তাই কর। আমি দেব না কোন খরচ। এত কষ্ট করে ট্যাং ট্যাং করে তিরিশ তিরিশটা দিন ইস্কুল আর বাড়ি করলুম, ঝাড়া চার ঘণ্টা ধরে রোজ রোজ বক বক করে মুখে ফেনা তুললুম কি সুন্দরীদের মুখে সন্দেশ তুলে দেবার জন্য ?

— তবে কার লাগি,
কহো লো সুন্দরী,
সাজায়েছ জীবনের ধন ?
—তারে আমি দেখি নাই কভু।
জানি নাই, কোথা তার ঘর।
তবু, তারি লাগি
রহিয়াছি জাগি
রাত্রিদিন। ক্লান্তিহীন।
জানি একদিন
আসিবে সে নবীন
আমার দুয়ারে।
হাসিমুখে মাগি লবে
মোর গাঁথা মালাখানি।
শুধাবে মধুর হেসে,
এতদিন কোথা ছিলে রাণী ?

হাসি মুখে থামল সুতপা।

—আ মর, মুখপুড়ী, ছিল আবার কোথায়? ছিল অভয়া বোর্ডিং হাউসে। যেদিন আসবে সেদিন যাস তার সঙ্গে ধেই ধেই করে। আপাতত আমাদের সিনেমায় যাওয়ার কি হবে, বল?

ইভা কপট ক্রোধে বলল।

সুতপা যেন বড়ই বিষণ্ণ হয়েছে এমনি ভঙ্গীতে বলল, নাঃ। বড় সামান্যতে আগ্রহ তোদের। তোদের কিস্‌স্যু হবে না।

—শোন, সুন্দরী নাগরী
যেতে চাও যমুনার পারে—
যাও অনায়াসে।
রাধিকা যাবে না কভু
যমুনা পুলিনে
নীলমণি বিনে।

—তার মানে, তুই যাবি না? ইভা জিজ্ঞেস করল।

—না ভাই, আমার শরীরটা আজ ভাল লাগছে না। কিছু মনে করিস না, আজ তোরাই যা।

—থাক, যেতে হবে না। চল, আমরা ওঘরে যাই।

সবাই যাওয়ার জন্য ঘুরল।

সুতপা একটু মুস্কিলে পড়ে গেল।

সিনেমা এবং বন্ধুবান্ধবীদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করা যে ওর খুব অপছন্দ, তা নয়। তবে ইদানীং ব্যাপারটাতে সে আর তেমন আগ্রহ বোধ করে না। কেমন একটা হলে হোক, নাহলেও ক্ষতি নেই ভাব।

কিন্তু আর একটা কারণেই সে সিনেমা বা পথে বেড়ানকে এড়িয়ে চলতে চায়। কি জানি যদি কখনও পথে-ঘাটে-রেস্তোরাঁয় হঠাৎ দেখা হয়ে যায় রজতের সঙ্গে? যদি মুখোমুখি হয়ে যায় কখনও? কি বলবে সে রজতকে? বন্ধুদেরই বা কি বলবে?

জীবনের কলঙ্কময় পরিচ্ছেদটাকে আর খুলতে চায় না সুতপা। জীবনে আর সুখী হতে পারবে না সে এটা ওর নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। তা না পাক, কিন্তু তাই বলে সুখের দিকে হাত বাড়িয়ে নতুন কোন বিড়ম্বনায় জড়াতেও রাজি নয়। তাই, হৈ-হুল্লোড় সিনেমা রেস্তোরাঁকে বর্জন করতে চায় সুতপা।

কিন্তু সেজন্য যাদের সঙ্গে দিনের পর দিন একসঙ্গে কাটাতে হবে তাদের সঙ্গে কোনরকম বিরোধও ওর কাম্য নয়।

তাই বন্ধুরা ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে যাচ্ছে দেখে বেশ একটু মুস্কিলে পড়ল। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই তাই বলল, সত্যি তাহলে তোরা চলে যাচ্ছিস?

—যাব না তো কি তোকে খোসামদ করতে থাকব? অঞ্জলি পিছন ফিরে বলল।

—যাচ্ছিস যা। কিন্তু একটার ভেতর তৈরী হয়ে থাকা চাই। নইলে একেক জনকে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলব, বুঝলি? হাসি হাসি মুখে বলল সুতপা।

ওরা হুড়মুড় করে দৌড়ে এসে সুতপাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তাই বল। খুব বেঁচে গেলি যাহোক।

—বেঁচে গেলাম, আমি? সুতপা বিস্মিত।

—তবে না তো কি? তুই কি ভেবেছিলি আমরা তোর মতামতের অপেক্ষায় ছিলাম! ঠিক দেড়টার সময় এসে তোরই চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যেতাম।

—হ্যাঁ?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

কপাল ভাল সুতপার। সেদিন সিনেমায় বা রেস্তোরাঁয় কোথাও রজতের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর। কাজেই, বিপদও কিছু ঘটেনি। ওর কেবলই ভয়, রজতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই ওদের সব কাহিনী প্রকাশ হয়ে যাবে। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে ওদের কথা। আর

সে-সব কথাই বলবে রজত। সমাজের ভয়ে লোক-লজ্জার ভয়ে কোন কিছু গোপন রাখবে না সে।

সুতপার লজ্জায় আর কলঙ্কে যে ওরও লজ্জা আর কলঙ্ক সেকথা ভেবেও নিরস্ত হবে না সে। কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে সুতপার মত মেয়েদের লজ্জা আর ধিক্কার দিতে পারলেই আনন্দ পাবে রজত।

তাই, রজতকে ওর এত ভয়।

আর দশটা ছেলের মত রজতও যদি ভীত-ভদ্র হত তো কোন দুশ্চিন্তাই থাকত না সুতপার। যেমন ভয় পায় না সে নরেনকে। জানে, পথে মুখোমুখি হয়ে গেলেও তখনি মাথা নিচু করে চলে যাবে সে। এমনভাবে যাবে যেন আগে কখনও দেখেনি ওকে। চেনে না সুতপাকে। ওর স্বভাবটাই ওরকম। অতীতের জের টেনে বর্তমানকে বিপর্যস্ত করতে চায় না ও। ওতে ওর মর্যাদায় আঘাত করে। যে নীরবে ওকে আঘাত করেছে, ও আজ আর তাকে আঘাত করতে যাবে না। সম্ভ্রমে বাধবে ওর। বিবেকেও।

আর শঙ্কর? অর্থাৎ কল্যাণশঙ্কর? ওর সঙ্গে দেখা হলে সুতপাই ইচ্ছা করলে ওকে ধিক্কার দিতে পারে। অপমান করতে পারে অনায়াসে। কারণ, ওর চারিত্রিক দুর্বলতাই ওকে বিনীত করবে। ভীরু বিনীত ভঙ্গীতে চলে যেতে বাধ্য হবে শঙ্কর।

কিন্তু রজত ওদের কারও মতই নয়। সে ভীতও নয় বিনীতও নয়। ওর বিবেক বোধটাও যথেষ্ট তির্যক। আঘাত সহ্য করলেও প্রতারণা মেনে নিতে পারে না সে।

ওর সব চাইতে বড় কথা হল, আজকের লোকের গুণ্ডামি অসহ্য। একটা লোকও আজ আর সততার সঙ্গে চলে না। সৎ নাগরিকের অভিনয় করে সবাই। সৎ হবার মত সাহস নেই কারো। সতীও নেই কেউ।

তাই ভণ্ড সতীত্বকে ছিন্ন ভিন্ন করাতে ওর আনন্দ।

কেউ যদি ওকে বলে, নিজের দিকটা ভেবে তারপর অপরকে বলবেন। নইলে চোরের মুখে ধর্মকথার মত শোনায়।

রজত তৎক্ষণাৎ শানান ছুরির মত একফালি বিদ্রূপের হাসি হেসে সহজেই বলবে, নিজে যথেষ্ট ভাল না হলে বুঝি অপরকে নিন্দা করা যায় না? নাঃ, আজকালকার লোকেরা শুধু অসৎ নয় যথেষ্ট অশিক্ষিতও। আরে বাবা, আমি চোর প্রমাণ হলেই কি তুমি চোর নও, এটা প্রমাণ হয়ে গেল? যতোসব মূর্খের হাট দেখছি।

এহেন রজতকে ভয় পাবে না কেন? সুতপাও পায়।

কিন্তু কর্মের জগৎ ব্যক্তির সুবিধা-অসুবিধার হিসাব করতে পারে না। করলে চলে না।

সুতপারও চলে না। মাঝে মাঝে ওকে বেরোতেই হয়। কখন নিজের কাজে। কখনও বা অন্যের।

তবে আজ প্রায় ছয় মাসের মাধ্যও কোন বিপদের মুখে পড়তে হয়নি ওকে।

ধীরে ধীরে ভয়টাও কেটে এল ওর।

ধীরে ধীরে সবার সঙ্গে পরিচয়টাও আরো বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে এল সুতপার।

নিবিড় হল সম্পর্ক। মোটামুটি একটা সহজ আর স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি হল ওদের মধ্যে। কারণ, এখন ওরা প্রায় সবাই সবার কথা জানে। সবটা না হলেও অনেকটা।

মানুষের স্বভাবই এই।

যতক্ষণ সে অন্যের দোষ-ত্রুটির কথা জানে না ততক্ষণ নিজের দোষ-ত্রুটির কথাও সে বলতে পারে না। বলেও না কখনো।

বোধ করি ভাবটা এই, তুমি যদি নিজেকে নির্দোষ গুণী প্রতিপন্ন করতে চাও কর, তাহলে আমি-ই বা নিজের দোষের কথা তোমাকে বলতে যাব কেন? কি দায় পড়েছে আমার সত্য প্রকাশের? কোন ত্রুটি নেই তোমার? কোন দোষ? স্বীকার করিনে আমি।

ফলে, সবাই যে যার দোষ গোপন করে ভদ্র সেজে বেড়ায়।

কিন্তু পরিচয় যেখানে নিবিড় সেখানে একে অপরকে প্রায় সবই বলে। অন্তত যতটা বলা সম্ভব।

এক্ষেত্রেও তাই হল।

দিনের পর দিন একটু একটু করে অনেকের অনেক কথাই শুনল সুতপা। শুনল, বোর্ডিংয়ে থাকা সত্ত্বেও কেন সরলাদি সকলের কাছ থেকেই বেশ একটু দূরে দূরে থাকেন।

বয়সটা একটু বেশি সরলাদির। কিন্তু সেটা তেমন কিছু নয়।

আসলে, জীবনের প্রতি আগ্রহের অভাবই তাঁকে এরকম বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

অথচ, আগ্রহ তাঁর ছিল। জীবনের কাছে মার খেয়েই আজ সে জীবন-বিমুখ।

কি নির্দয় নিষ্ঠুর আঘাতই না করেছে তাঁকে।

ইভার কাছে ওঁর কথা শুনতে শুনতে ঠেলে ঠেলে কান্না পাচ্ছিল সুতপার।

জল গড়িয়ে এসেছিল গাল বেয়ে। গলার ওপরের দিকটাতে ব্যথা।

কেঁদেছিল ইভাও।

সেই থেকে সরলাদির সঙ্গে কি একটা আত্মীয়তা বোধ করে সুতপা। কোথায় যেন মিল খুঁজে পেয়েছিল নিজের সঙ্গে।

এমনি করে সীমার কথা শুনেছে নন্দিতার কাছে।

ভারী সুন্দর মেয়েটা। দেখতে কালো। একটা চোখও একটু ট্যারা। তেমন মারাত্মক কিছু নয়। বেশ একটু কাছে না এলে নজরে পড়ে না। স্বাস্থ্যটাও তেমন আকর্ষণীয় কিছু নয়। কিন্তু স্বভাবটাই মধুর।

কিন্তু শ্যামল তা দেখতে পেল না। কিংবা চাইল না দেখতে।

বরং উল্টে ওর রূপের অভাবকেই চরম ঠাট্টা করল নিষ্ঠুরভাবে। কি বিশ্রী করেই সে একদিন বলল, দ্যাখ সীমা, কাঁদলে সুন্দরী মেয়েদের একরকম মন্দ লাগে না। কিন্তু তাই বলে, ট্যারা চোখে কেউ যদি কাঁদতে থাকে তো সেটা একেবারেই অসহ্য। আমি তো ভেবেই পাইনে, ট্যারা চোখে জল আসে কি করে?

আঘাত করতে পারে না সীমা।

তাই তখনও অপরাধীর সুরে বলেছিল, কি করব বল? বুকটা যখন জ্বলে-পুড়ে যায় তখন এ চোখেও যে জল এসে যায়, শ্যামল। এ বুকটা তো পাথরের নয়?

শুধু নির্দয় নয় শ্যামল, যথেষ্ট অসভ্যও।

তাই, সীমার ওই ব্যথার মুহূর্তেও নির্মমভাবে বলতে পেরেছিল, তবু যদি তেমন লোভনীয় বুক হত। হুঁম, ওই শালিকের মত শুকনো বুকেও অত ব্যথা? অবাক করলে তুমি।

এ কথার পর আর কারও কিছু বলার থাকতে পারে না। বিশেষ করে সীমার মত নরম স্বভাবের মেয়ের।

ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিল মেয়েটা। কাকে বলবে, কেমন করে বলবে,

আর কী-ই বা বলবে, কিছুই ঠিক করতে পারেনি ও। মাসখানেক শুধু গোপনে গোপনে কাঁদল।

রাতে ঘুমুতে পারত না সীমা। দিনে ও কেমন আন্‌মনা হয়ে থাকত।

অথচ, এই শ্যামলের জন্যই নিজের পাশ-বইটাকে শূন্য অঙ্ক নামিয়ে এনেছিল সীমা।

তখনও চাকরি হয়নি শ্যামলের। দরখাস্তের পর দরখাস্ত করছে। ইণ্টারভিউ দিতে যাবার অবস্থাও ছিল না তখন।

বাড়ির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বাপ রিটায়ার্ড। দাদাই একমাত্র ভরসা। কিন্তু তাঁর ছিল প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি। হঠাৎ কোম্পানীর কিছু মোটা অঙ্কের লোকসান হয়ে যাওয়াতে ছাঁটাইয়ের লিস্টে পড়ল শ্যামলের দাদাও।

অতএব অবর্ণনীয় দুরবস্থা ওদের।

সেই দারুণ দুঃসময়ে সীমাই একমাত্র ভরসা ছিল শ্যামলের। ওর পক্ষে যতটুকু সাহায্য আর সহযোগিতা সম্ভব সবটুকুই করত সীমা, হাসিমুখে।

তখন শ্যামলই কুণ্ঠিতভাবে বলত, তোমার প্রতিদিনের দান আর নিতে পারি না সীমা। নিজেকে বড় ছোট মনে হয়। ভিখিরী ভিখিরী।

সান্ত্বনার সুরে সীমা বলত, ছিঃ শ্যামল। তুমি কেন ভিখারী হবে? নিজেকে অত ছোট করো না। তুমি তো আমার শিবঠাকুর। আজ না হয় আমি অন্নপূর্ণাই হলাম। তাতে অত দুঃখ কিসের? তোমায় যা দিচ্ছি সে-ও তো তোমারই। আমি-ই কি আর আলাদা কিছু নাকি? সবসুদ্ধুই তো তোমার।

—সত্যি তুমি অসাধারণ, সীমা।

এর বেশি আর কিছু সেদিন বলতে পারেনি শ্যামল। কৃতজ্ঞতায় ছলছল করে উঠেছিল ওর চোখ দু'টো।

অথচ, ওই কৃতজ্ঞ শ্যামলই অবস্থার তারতম্যে কি ভীষণ অকৃতজ্ঞই না হয়ে উঠেছিল।

ভাবতেও অবাক লাগে সুতপার। রক্ত-মাংসের শ্যামল কি করে অমন আঘাত করতে পারল সীমার মত একটি নরম মেয়েকে?

পৃথিবীটা কি বিচিত্র জায়গা! পদে পদে এখানে বিস্ময়। এখানে মধু-ভাণ্ডে বিষ আর বিষ-পাত্রে মধু। আগে থেকে চেনার উপায় নেই

জানবারও উপায় নেই।

তবুও মানুষ জানতে চায় মানুষকে। চিনতে চায়। সব চাইতে আশ্চর্য, শুধু চেনা জানা নয়, ভালও বাসতে চায়।

এমনিতেই কম কথা বলত সীমা। ইদানীং আরো কম বলে। বলতে লজ্জা পায়। কেন, তা কে জানে!

তবুও অনেক দুঃখ অনেক ঝড় এলেও শেষ পর্যন্ত মানুষ নতি স্বীকার করে না দুঃখের কাছে। তাই অনেক দুঃখের মার খেয়েও আবার সে মাথা তুলে দাঁড়ায়। দুঃখকে অগ্রাহ্য করেও জীবনের পথে এগিয়ে চলে সে।

সেখানেই মানুষ তার নিজের পরিচয় রাখে।

সীমাও তাই আঘাত পেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েনি। নতুন করে জীবনের পথে চলেছে সে। রঙ্গ-রস-হাসি-কান্না সব মিলিয়ে বিচিত্র সে পথ।

ওদের কথা ভেবে সুতপাও একটু হাল্‌কা বোধ করে নিজেকে। নিজেকে আর ততটা বোঝা বলে মনে হয় না ওর।

কিন্তু যে মেঘটা একেবারেই কেটে যেতে পারত—কালো মেঘ একেবারে সাদা হতে পারত, কিছুটা বর্ষণ করতে পারল না বলে তা প্রায় চাপ ধরেই থাকল।

ওদের এত কথা জানার পরও সুতপা যদি নিজের কথাটা কিছুটাও ওদের বলতে পারত তো বিষণ্ণতার ভারী মেঘটা ওর বুক থেকে সরে যেতে পারত। সরে গিয়ে হাল্‌কা হত।

কিন্তু তা হল না। কিছুতেই নিজের কোন কথা সে ওদের বলতে

পারল না। কেন যে সে তা পারল না, তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সে।

অথচ, কতবারই তো কত প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

ওরা জানতে চায়, হ্যারে, তুই তো কখনও মুখটা খুলিস না, সুতপা। একেবারে শক্ত খিল এঁটে বসে আছিস। এতদিন এসেছিস, কই, বললি না তো তোর কথা?

—আমার আবার কি কথা? সুতপা না বোঝার ভান করেছে। ওরাও পরিষ্কার বলেছে, ন্যাকা আর কি! জানে না যেন কিছু!

—সত্যি বলছি, বলার মত আমার কোন কথাই নেই। অসহায় দৃষ্টি মেলে ধরেছে দুই চোখে।

—আ-হা, এতগুলো বছর যেন উনি এমনি এমনি কাটিয়ে এলেন? আমরা আর বুঝিনে কিছু? বলি, এ পর্যন্ত ক'টা এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বল না। আমাদের কাছে লজ্জা কি? আমরা তো আর কেউ পীর পয়গম্বর নই?

তবুও না। তবুও পারল না সুতপা ওর কথা বলতে।

ওরা ক্ষুণ্ণ হল, কিছুটা বা রুষ্ট, তবুও সুতপা পারল না ওর ব্যথা আর আনন্দের কথা বলতে। ওর গোটা অতীতটাকে বুকে চেপে বসে রইল সে।

আর ওই চাপধরা ব্যথাটাকে ভোলবার জন্য ইদানীং মাঝে মাঝে গীটারটা নিয়ে বসে সুতপা।

যে যন্ত্রটার কথা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সেটাকেই আবার কাছে টেনে নিল।

যেদিন বাড়ি থেকে গীটার প্রথম নিয়ে এল, সেদিনই ওটা দেখে ইভা বলেছিল, অ, এবারে উনি আবার গীটার অজ্ঞা হবেন দেখছি!

ইভার গানের গলাটা মোটামুটি মন্দ নয়। ওর গানও শুনেছে সুতপা।

তাই সেও একটু মিষ্টি করে হেসে বলল, তুমি একাই সঙ্গীত অজ্ঞা হয়ে থাকবে! আর কারও কিছু হতে নেই?

—ওমা, হতে নেই কে বলল? আমি তো ভালই বললুম। এবার থেকে বেশ গুছিয়ে লেখা যাবে। পাত্রী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মে নিপুণা শিক্ষিকা এবং গীটারজ্ঞা—ব্যস, পিল পিল করে এসে জুটবে বাছাধনেরা।

—আর শ্রীমতী ইভা বোস?

—কিই বা লিখবে? শ্যামবর্ণা (ছেলেরা তক্ষুণি বলবে রক্ষেকালী) দোহারা (ছেলেরা বলবে, একহারাও হবে না) গড়ন, শিক্ষিকা (ছেলেরা তক্ষুণি ধরে নেবে, ও বাব্বা ঐ রক্ষেকালী যদি আবার চীৎকার সুরু করে তবেই গেছি)।

ব্বাঃ, ছেলেরা কি বলবে, সে সব কথা যে একেবারে অনর্গল বলে যাচ্ছিস। ওদের কথা অত জানলি কি করে?

—ও বাবা, তা আর জানব না? একবার একটা ছেলেকে ধরবার চেষ্টাও করেছি যে!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ রে।

—তারপর কি হল?

—হবে আবার কি? অনেক কষ্টে ভেবে-চিন্তে মুখখানা শুকনো শুকনো করে ট্রাম স্টপেজের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একটা ছেলে বারকয়েক তেরচা করে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। মনে মনে ভাবলাম আমাকে তাহলে ওর বেশ ভালই লাগছে।

—কি করে বুঝলি? প্রশ্ন করার সাথে সাথেই গীটারটি টেবিলের ওপর রেখে বেশ জুত্‌সই করে বসল সুতপা।

ইভাও ওর বিছানায় বসে বলল, ওই যে, তাকাচ্ছিল আমার দিকে?

—তারপর? সুতপা ওকে উস্‌কে দিল।

তারপর, এক সময় মুখখানা কাচুমাচু করে ওর খুব কাছে গিয়ে বললাম, দেখুন, মোহনলাল স্ট্রীটটা কোন্ দিকে দয়া করে বলবেন? ছেলেটা চমকে ওঠার ভান করে বলল, আজ্ঞে -আমাকে বলছেন? আমি ঘাড় নাড়লাম। হাত নেড়ে এদিক-ওদিক নির্দেশ করে সে কি একটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে তুলল।

—ওর তাহলে তখন হয়ে এসেছে বল?

—আগে শোনই না। আমি তো ওর আবোল-তাবোল বকুনি শুনেই বেশ বিনীত ভঙ্গীতে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে আসছিলাম। বুঝেছিলাম, ও সুযোগ চাইবে। ঠিক তাই হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে বলল, ঠিক বুঝতে পেরেছেন তো? আমি বললাম, না হয় আর কাউকে জিজ্ঞেস করে নেব।

—সে কি বলল?

—আর কি বলবে? যেন দারুণ অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, আচ্ছা দাঁড়ান, আমিই আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আসুন আমার সঙ্গে।

আমি এমন মাথা নীচু করে চলতে লাগলাম যাতে সে বুঝল, ওর বদান্যতায় আমি এতই মুগ্ধ যে, কথা পর্যন্ত কইতে পারছি না।

— বাব্বা, তোর পেটে পেটে এত?

—তবে না তো কি?

—তারপর কি হল?

—গেলাম ওর সাথে সাথে সন্ধ্যাদের বাড়িতে। ধন্যবাদ দিয়ে ওকে বিদায়ও দিলাম। সন্ধ্যার বাড়িতে না ঢুকে আমিও তক্ষুণি ওর পিছন পিছন চলে এলাম। জানতাম গলির মুখে গিয়ে একবার নিশ্চয়ই পিছন ফিরে আমাকে দেখবে।

—দেখেছিল?

—হ্যাঁ।

- তারপর?

—স্বভাবতই ওর চলার গতি মন্থর হল। মুখে বিষণ্ণতা ফুটিয়ে

বললাম, না, বান্ধবীটি বাড়ি নেই। যেন খুবই দুঃখিত হয়েছে এমনি-ভাবেই সে বলল, ভারি বিশ্রী ব্যাপার হল দেখছি। আমি বললাম, কেন? সে সহানুভূতির সঙ্গে বলল, এই এতটা পথ রোদ্দুরে এলেন···অথচ দেখা হল না ·· ···। আমিও মিনমিন করে বললাম, সে আর কি করা যাবে বলুন? সে তো ঠিকই ··সে তো ঠিকই···বলে দু'বার ঢোক গিলল সে।

—বাব্বা, তুই এতও পারিস?

—আগে শোন না, তারপর বলিস।

—হ্যাঁ তুই বল।

—তারপর! এ-পথ সে-পথ করে এ-কথা সে-কথা বলে ঠিক একটা রেস্টুরেণ্টে গিয়ে ঢুকলাম দু'জনে।

—ওমা, তুই কিরে? সুতপা বিস্ময়ে হাঁ করে রইল।

—ব্যস, এরপর সোজা অঙ্কের ব্যাপার। আজ এখানে কাল সেখানে দেখা করা বকবক করা যথারীতি সুরু হল। শেষে যেই বললাম, জানেন, আমার রোজগারেই আমার পরিবারটিকে নির্ভর করতে হয়। মা বাপ ভাই বোন, আমরা ছয়জন। সমস্ত ভার আমার ওপর। সে গম্ভীর সুরে বলল, তবে তো আপনার ওপর যথেষ্ট দায়িত্ব। আমি চুপ করে রইলুম।

—আর সে কি বলল?

—সেও চুপ করল। সে-ই যে চুপ করল আর মুখ খুললই না। ধীরে ধীরে ওর সময়ের এবং আগ্রহের অভাব হতে লাগল। দেখা হলেই, কেমন আছেন ভাল তো ইত্যাদি দু'একটা কথা বলেই জরুরী কাজে তক্ষুণি চলে যেত। আমি মনে মনে হাসতুম। বুঝতে তো কষ্ট হত না কিছুই। তবেই বল, আমি ছেলেদের কথা কেন জানব না।

হাল্‌কা সুরেই গল্পটি বলতে গিয়েও শেষের দিকে আর সে সুরটা বজায় রইল না বলে মনে হল সুতপার।

কোন কথা না বলে সে ইভার ব্যথার ব্যথী হল।

বিলম্বিত নিঃশ্বাস ছেড়ে সে-ই একটু পরে বলল, সত্যি পুরুষগুলো বড় বেশি স্বার্থপর। কেবল পেতেই জানে, দিতে নয়।

—ছোট করে দেখলে তাই মনে হয়, আসলে তা নয়। ওদের দোষ দিয়ে লাভ কি বল? ওরাই বা কি করবে? ইভাই বরং পুরুষ-পক্ষ সমর্থন করল।

—কেন, যাকে ভালবাসে তার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করতে পারে না? তা না হলে আবার ভালবাসা কি?

—ওটা রাগের কথা, ভাবের কথা। ওদেরও তো একটা পরিবার আছে? মা বাপ ভাই বোন আছে? তাদের সব দাবীই তো ওকে মেটাতে হয়। তারপরও যদি আর একজন আসে পেছনে আর একটা গোটা পরিবার নিয়ে তো ভয় পাবারই কথা! স্বার্থত্যাগেরও একটা সীমা আছে, সুতপা। দোষটা পুরুষদের নয় দোষটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার।

এবারে কথাটা অনেক দূর গড়িয়ে গেল। সুতপার রাজনীতি আর অর্থনীতি সম্বন্ধে প্রায় কোন ধারণাই না থাকায় ও ব্যাপারে আর এগোতে পারল না।

তবু নিজের মত বজায় রেখে বলল, হুঁ, আর ওরা যেন সব সাধু পুরুষ আর কি!

—সে কথা বলছি না। তবে সকল ক্ষেত্রে সবটা দোষই ওদের নয়। সে যাক, অনেক কথা হয়েছে, এবারে তোর গীটার শোনা।

অনিচ্ছা ছিল না সুতপার। তবু এই প্রথম বলে একটু লজ্জা লজ্জা বোধ করল সে।

তাই বলল, ধ্যেৎ, বাজাতে জানি নাকি? শিখব ভাবছি।

—নে, ন্যাকামি রাখ। সুরু কর তো।

এরপর এ-তারে সে-তারে এলোমেলো টোকা দিয়ে সুতপা ওর অমনযোগ ও অনিচ্ছা প্রকাশ করে এক সময় একটি অতি পরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর তুলল গীটারে। খুব পাকা হাত না হলেও চলনসই

হাত সুতপার। তার ওপর একটু আগের আক্ষেপের কাহিনীর যে ভার ভার মানসিকতা ওদের আচ্ছন্ন করেছিল সে পরিস্থিতি অনুযায়ী মন্দ হল না সুরটা। বাজনা শেষ করে আবার এলোমেলো দু'একটা টোকা দিল সুতপা। আসলে অপেক্ষা করল শ্রোতার মন্তব্যের।

ইভা বলল, বাঃ, বেশ মিষ্টি তো তোর হাত!

—মিষ্টি না হাতি। মুখের ওপর প্রশংসা করায় একটু লজ্জা পেল সুতপা।

ঘাড় নীচু করে সে তখনও টুং-টাং করছিল।

ইভা হঠাৎ এক খেয়ালী প্রস্তাব করল, আয় এক কাজ করি। এখন তো আর কেউ নেই। আমি গাই, তুই বাজা, কেমন?

সুতপা একটু অবাক চোখে চাইল ওর দিকে।

তারপর বলল, কোন্‌টা?

—সেই যে......"বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল, সে কি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না!"

—বেশ।

গুছিয়ে বসল দু'জনেই। সুরু হল দু'জনের সংগীত আসর। এখন আর লজ্জা নেই কারও। সংকোচ নেই কিছু।

ঘরটাতে একটা বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি হল। যন্ত্রে আর কণ্ঠে বেশ মধুর আবহাওয়া।

গানের শেষে যে যার ভাবনায় ডুবেছিল কিছুটা সময়। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ সেটা টিকল না।

ফটাস ফটাস চটির শব্দ তুলে ঘরে ঢুকল অঞ্জলি।

ঢুকেই অবাক সে।

--কি ব্যাপার রে, ইভা? দু'জনে যে দু'জনের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছিস চুপ করে? তোদের হল কি, এ্যা? একটু থেমে আবার বলল, ও বাব্বা, এ যে আবার সঙ্গীত সাধনা হচ্ছে দেখছি!

—তা না হয় দেখছিস। কিন্তু তুই কোথা থেকে জলাঞ্জলি দিয়ে এলি, তাই বল। স্কুলের ছুটি তো চারটেতে হয়েছে। এতক্ষণ কোথায় ছিলি ?

—গেছলাম একটু কাজে।

—সে তো বটেই। তবে সঙ্গে কে ছিল সেটা জানলেই খুশি হব।

—কে আবার থাকবে ? কেউ না। ঝাড়া-পোঁছা জবাব দিল অঞ্জলি।

—হ্যাঁ ? একা গিয়েছিল অঞ্জলি দে ? এ-ও কি বিশ্বাস করতে হবে ?

—সে তোদের ইচ্ছে। কেন ? আমি একা একা কখনও কোথাও যাই না নাকি ? বেশি বাজে বকিসনে।

—আ-হা, চটছিস কেন ? সবাই তোর নামটা পর্যন্ত ভেঙে-চুরে জলাঞ্জলি দে বলে কেন ?

—বলে হিংসায়। কিছু কি আর বুঝিনে! কেউ তো পথে বেরোনর সময় সাজগোজ কম করে না। পথ চলতে চলতে এদিক-ওদিক তাকাতেও কসুর করে না কেউ। নিজেকে লোভনীয় করে তোলার চেষ্টাও কম করেন না কেউ। তবুও নেহাত কোন বন্ধু জোটে না বলেই আমাকে গালাগাল দিয়ে একটু আনন্দ পায় সবাই। ভাবখানা এই, আমার মত বেহায়া নয় ওরা। হুঃ...... যত্তোসব, কে যে কত বড় সতী সে কি আর জানিনে আমি।

—আ-হা, অঞ্জু, তুই সত্যি রাগ করেছিস। আসলে ইভা তোকে সীরিয়াসলি কিছু বলেনি, নেহাতই ঠাট্টা করছিল।

সুতপা ঘনায়মান মেঘটা কাটানর জন্যই বলল।

—হয়তো তাই। কিন্তু এটা আমি স্পষ্টই লক্ষ্য করেছি, আড়ালে আবডালে অনেকেই অনেক কথা বলে আমার সম্বন্ধে। কখন কারও প্রতিবাদ করি না বলেই ধারণাটা ওদের ক্রমেই পাকা হয়ে যাচ্ছে। তাই আজ হঠাৎ বলে ফেললাম।

অঞ্জলি থামল। ওর যা বলার ছিল তা স্পষ্টই বলা হয়ে গেছে।

ঘরের আবহাওয়াটা কেমন একটু মেঘলা হয়েই রইল। সন্ধ্যেটা যে সুরে সুরু হয়েছিল সেটা এই বিতর্কে কেটে গেল।

মনে মনে সবাই একটু একটু অস্বস্তি বোধ করছিল।

এই অবাঞ্ছিত গুমোট ভাবটা কাটানর জন্যই সুতপা আবার বলল, তুই একটু ভুল করেছিস ভাই, অঞ্জু। এখানে কেউ আমরা কারও অভিভাবিকা নই, কাজেই কারও চরিত্র বিচার করা কারোরই উদ্দেশ্য নয়। কাজেই, ও প্রশ্নই আসে না।

অঞ্জলি তবু রাগতস্বরেই বলল, না এলেই ভাল হত। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে এসে যায় দেখি কিনা তাই।

এরপর কারও কিছু বলার থাকে না। যেখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, একজন আর একজনের ঠাট্টাটাকে ঠাট্টা হিসাবে নিচ্ছে না, সেখানে আর কারও কিছু বলার থাকতে পারে না। কারণ, বলেও তখন লাভ হয় না কিছুই। বরং কথায় কথায় তিক্ততা আরও বেড়ে যায়।

কাজেই, অবস্থা বুঝে ইভা আর সুতপা এবারে চুপ করল।

একটু পরে অঞ্জলিও স্বগতোক্তির মত বলল, যাই, সীমা ওরা কি করছে দেখি গে।

পাশের ঘরে চলে গেল অঞ্জলি। সে ঘরে সীমা আর সরলাদি থাকে।

অঞ্জলি চলে যেতেই সুতপা একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই বলল, কি ব্যাপার, কিছু তো বুঝলাম না? আজ হঠাৎ অঞ্জলি ঐ সামান্য ঠাট্টা করাতে অত চটে গেল কেন? এমন তো করে না ও।

ইভাও গম্ভীর সুরে বলল, কি জানি! আগে জানলে আমিই কি ওকথা বলতুম নাকি।

কথার সুরেই বোঝা গেল ইভা সত্যি খুব দুঃখিত হয়েছে ব্যাপারটাতে। কিন্তু করে ফেলেছে, অতএব এখন উপায় কিছু নেই।

পরে জানা গেল ব্যাপারটা। ইভার কথায় ঠিক নয়, অন্য এক কারণে অঞ্জলি ওরকম খাপ্পা হয়ে উঠেছিল। এক জায়গার ঝাল অন্য এক জায়গায় ঝেড়েছে সে।

ওরা জানত না, প্রস্তুত ছিল না ওরা, তাই অমন হতভম্ব হয়ে গেছে।

ওরা কি করে জানবে, সেদিন স্কুল ছুটির পর সে অশোকের সঙ্গে না বিজনের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল! আর কোন একজনের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে কি কি কথা হতে পারে, তাই বা জানবে কি করে ওরা?

জেনেছিল পরের দিন: সেদিন নাকি অঞ্জলির সিনেমাতে যাওয়ার কথা ছিল বিজনের সঙ্গে। গিয়েও ছিল। কিন্তু ছ'টার জায়গায় ছ'টা কুড়িতে গিয়ে পৌঁছেছিল। ট্রাম-বাসের অকথ্য ভীড়ে কিছুতেই সময়মত যেতে পারেনি সে।

আর বিরোধটা বাধলও ওদের ঐ দেরী করা নিয়ে।

হলের সামনে গিয়েই অঞ্জলি দেখল বিজন অস্থির ভাবে পায়চারী করছে। উত্তেজনায় আর বিরক্তিতে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছে সে।

অঞ্জলি নিজের অপরাধটা জানত, এখন আরো বেশি আতঙ্কিত হল।

কাজেই, ওর খুব কাছে গিয়ে নীচু সুরে বলল, সত্যি ভারি বিচ্ছিরি হয়ে গেল ব্যাপারটা। বাস্তবিকই হলের সামনে এরকম ভাবে অপেক্ষা করাটা খুবই বিরক্তিকর।

ওর কৈফিয়ৎ শুনে বিজন কোন কথাই বলল না।

অঞ্জলি ভাবল, বিজন বুঝেছে ওর অসুবিধেটা। বুঝেছে, ইচ্ছা করে দেরী করেনি সে।

আসলে কিন্তু দুরন্ত রাগের জন্যই কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বিজনের।

সেটা বুঝতে না পেরে অঞ্জলিই আবার বলল, বিচ্ছিরি লাগে এই

বাসগুলোতে চড়তে। প্রাণ বেরিয়ে যায় ঠেলাঠেলি করতে করতে। তার ওপর একেক সময় কি যে হয় বাসগুলোর। দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। কারও আর টিকিটিরও দেখা নেই। যত্তোসব···

কথাটা শেষ করেনি অঞ্জলি।

বিজন হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলে বসল, এখানে কেউ তোমার বাজে বকুনি শুনতে আসেনি। দয়া করে এখন ভেতরে বস গে।

অঞ্জলি সবেমাত্র শাড়ির আঁচল দিয়ে শ্রান্তির ঘামটুকু মুছতে যাচ্ছিল। বিজনের কথায় এবং স্বরে হাতটা গালে চেপেই রইল সে।

বিজন অধৈর্য স্বরে বলল, ঢং দেখিয়ে আর কি হবে? ভেতরে যাও।

গেটের মুখে দাঁড়িয়েছিল ওরা। গেটম্যান হাত বাড়িয়েছে টিকিটের জন্য। অঞ্জলি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, না, আমি যাব না। তুমিই যাও।

বলে আর কোন কথার সুযোগ না দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল সে।

বিজন অবাক।

তারপরই রাগটা ওর আরও চড়ে গেল। দ্রুতপায়ে সেও অঞ্জলির পিছু পিছু এল।

একেবারে ওর সামনাসামনি এসে আর একবার জিজ্ঞেস করল ওকে, এভাবে চলে যাবার মানে?

—মানে জানিনে, যেতে দাও।

—যাবে যাও। কিন্তু এর অর্থ কি, জানতে চাই।

—এটা রাস্তা, নাটক করো না।

—তাহলে তুমি যাবে না? বেশ, তবে বাড়িই যাও।

বলেই পকেট থেকে টিকিট দুটো বের করে খচ্ খচ্ করে ছিঁড়ে ফেলল বিজন। ছিঁড়ে টুকরোগুলো অঞ্জলির মুখের সামনে উড়িয়ে দিয়ে গট্ গট্ করে সে চলে গেল।

এবার অঞ্জলি অবাক হল। দুঃখিতও। বিজন ওকে এমন করে অপমান করতে পারল ?

হঠাৎ-ই কান্না পেল অঞ্জলির। কিন্তু কাঁদতে পারল না। কারণ, ওটা পথ।

তাই সে কোনমতে দাঁতে দাঁত চেপে বাড়ি ফিরে এল।

আর তারপরই অপ্রীতিকর কথা কাটাকাটি হল ওর ইভার সঙ্গে।

সব কথা শুনে অঞ্জলির জন্য দুঃখিত হল ওরা।

সমবেদনার সঙ্গে ইভাই ওকে বলল, অমন অসভ্য ছেলের সঙ্গে আর কোনদিন কথাও বলিসনে, অঞ্জু। মান-সম্মান রেখে যে লোক চলতে বা বলতে জানে না তার সঙ্গে আবার কিসের ভাব ?

সুতপাও বলল, সত্যিই তো। সামান্য ব্যাপারে যার অত রাগ তার কারও সঙ্গে পরিচয় না রাখাই উচিত।

অঞ্জলি তখন আর ওদের কথার কোন প্রতিবাদ করল না। কেননা, বিজনের সঙ্গে এরপর আর কোন যোগাযোগ রাখবে না বলে সেও মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে।

ছেলেটা অসভ্য। ছেলেটা বদমেজাজী।

কিন্তু অঞ্জলির এতবড় একটা সিদ্ধান্তও পরদিনই একেবারে বানচাল হয়ে গেল।

কে জানত, ওর স্কুলে যাবার পথেই বিজন ওকে ধরবে !

আগে থেকেই ওকে দেখেছিল অঞ্জলি। কিন্তু না দেখার ভান করে নিজের পথে এগোচ্ছিল।

একেবারে ওর কাছাকাছি এসে বিজন সোজাসুজি বলল, আমার কালকের ব্যবহারটা সত্যি খুব খারাপ হয়ে গেছে। সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

বুকের শাড়িটা একটু টেনে নিয়ে অঞ্জলি ছোট্ট করে শুধু বলল, ধন্যবাদ। বিজনের দিকে ফিরেও তাকাল না সে।

—ও বা-ব্বা, রেগে যে এখনও টং হয়ে আছ দেখছি। অঞ্জলির সঙ্গে সঙ্গে সেও চলল।

—আমি এখন স্কুলে যাচ্ছি। সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে বলল অঞ্জলি।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। নির্বিকার জবাব বিজনের।

—এখন চেনাশোনা অনেকেই এদিকে আসবে। স্পষ্টতই ওকে চলে যাবার জন্য ইঙ্গিত করল অঞ্জলি।

— এলে আর কি করব ? কাউকে ফেরাতে তো পারব না।

—স্কুলের সময় এসব ফাজলামো ভাল লাগে না।

কথার সুর যথেষ্ট রূঢ় হল অঞ্জলির। বিরক্তির স্পষ্ট আভাষ। বেশ কিছু কড়া কথাই শুনিয়ে দিতে চাইছিল ওকে। কিন্তু পথের মাঝে তেমন বিশ্রী একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলতে লজ্জা পাচ্ছিল।

তাই, ভদ্রতা বজায় রেখে যতটা কড়া সুরে বলা সম্ভব সে সুরেই বলল, তুমি এখন যাবে কি না ?

— তুমি গেলেই যাব। বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই বিজনের।

—কোথায় ?

— যেখানে খুশি। শুধু ঐ স্কুলে ছাড়া। স্বচ্ছন্দ প্রস্তাব বিজনের।

— সবকিছুরই একটা সীমা রাখা প্রয়োজন, বিজন।

—শুধু রাগেরই কি সীমা থাকবে না ? হঠাৎ বিজনই প্রশ্ন করে বসে।

—তোমার সঙ্গে আমার রাগারাগির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

—আমিও তো তাই জানতুম। এখন দেখছি যা জানতুম, তা ভুল।

এদিকে স্কুল প্রায় এসে গেছে। অঞ্জলি ছাত্রীদের এবং অন্য টীচারদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। বিজনকে তাড়াবার জন্য সে আরও সচেষ্ট হয়ে উঠল।

মনের ভয়টাকে গোপন করে বরং একটু অতিমাত্রায় সাহসিকতার ভঙ্গীতে বলল, এটা কি হচ্ছে?

—কেন, পথ চলা। সহজেই বলল বিজন।

—অপমানিত হতে চাও?

—যা চাই, সে তো আগেই বলেছি। এখন তুমি কি কর, তাই দেখি।

—এরকম ভাবে দু'জনকে একসঙ্গে দেখলে লোকে যা-তা ভাববে। এবারে আর তার কথার সুরে সে জোর লক্ষ্য করা গেল না।

—ভাববেই তো। গম্ভীরভাবে বলল বিজন।

—তবে যাচ্ছ না কেন? কিছুটা যেন মিনতির সঙ্গেই বলল অঞ্জলি।

—একটা কিছু ঠিক হল না। আমি তো অনেক আগেই যাবার কথা বলেছিলাম—তুমিই তো গেলে না। আমি কি করব?

—স্কুল ফেলে এখন তোমার সঙ্গে যাব?

—তাহলে থাক। আমিই বরং তোমার সঙ্গে যাই।

এমন সময় স্কুলগেটের সামনে একজন পরিচিত টীচারকে দেখতে পেল অঞ্জলি। ওদের দিকেই তাকিয়ে ছিল টীচারটি।

তাড়াতাড়ি পাশের রাস্তা ধরল অঞ্জলি। সঙ্গে সঙ্গে বিজনও।

শেষ পর্যন্ত সেদিন সত্যি ওর স্কুলে যাওয়া হয়ে উঠল না। বোঝা গেল, গোঁ ধরে এসেছে বিজন। কিছুতেই ফেরান যাবে না ওকে। বাধ্য হয়েই ওর সঙ্গেই গেল অঞ্জলি।

খেয়াল-খুশিমত এদিক-সেদিক ঘুরে কাটাল ওরা। খাবার খেল এটা-সেটা। ধরতে গেলে গোটা ব্যাপারটাই একটা পাগলামি আর কি?

তবুও সব মিলিয়ে খুব খারাপ লাগল না অঞ্জলির। মাঝে-মধ্যে এরকম অর্থহীন খেয়ালই বা মন্দ কি?

তাছাড়া, এসব মুহূর্তেই বিজনের মনটাকে স্পষ্ট দেখতে পায়

অঞ্জলি। তখন ওর প্রতিটি কথাই আবেগময়। উচ্ছ্বসিত। প্রাণ-খোলা স্বীকারোক্তি।

কেমন সুন্দর করে এই খেয়ালী-দুপুরে বিজন বলল, হিসেবের অনেক বেশি পেয়ে গেলে মানুষের যে আনন্দ হয়, এখন তোমাকে পেয়ে আমারও তেমনি হয়েছে, অঞ্জু। তুমি তো জান, মেয়েদের স্তুতি করতে হলে যতটা কবিত্ব থাকার দরকার, আমার তা নেই। তবু বলছি, ভাল কিছু কথা বলতে পারলে এখন আমি সত্যি খুশি হতাম। কিন্তু উপায় নেই। মনের কথা কোনদিনই আমি তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারব না। তুমি বুঝে নিও অঞ্জু। তোমার মন দিয়ে আমার মনের কথা বুঝে নিও।

ফেরার পথে বিজনের কথাগুলোই গুনগুন করতে লাগল অঞ্জলির কানে। কানে লেগে থাকা একটি গানের মত। শুনতে শুনতে তন্ময়ভাবে অঞ্জলি ফিসফিস করে বলে ফেলল, বিজনটা একেবারে ছেলেমানুষ। না বললে যেন ওর মনের কথা আমি বুঝতে পারি না। মেয়েরা অত তোমাদের মত হয় না, বাপু। চোখের দিকে তাকালেই ওরা তোমাদের মনের সব কথা বুঝতে পারে, হুঁঃ।

বলে অকারণেই একটু হাসল অঞ্জলি।

কালকের মেঘলা আকাশ আজ বিকেলে ফরসা। উজ্জ্বল। কাল যেমন স্নুড়ো মেঘের টুকরো মুখে নিয়ে বোর্ডিংয়ে ফিরেছিল আজ তেমনি ফাল্গুনীর গুনগুনানি কণ্ঠে নিয়ে ফিরল অঞ্জলি। চাপা খুশির আলো যেন উপ্‌চে পড়ছিল ওর চোখে-মুখে।

মেয়েরা মেয়েদের খুশির প্রকাশভঙ্গী ভালভাবেই চেনে।

সীমা নন্দিতারও তাই বুঝতে দেরি হল না মোটেই।

অঞ্জলি যখন প্রায় নাচতে ঘরে ঢুকে স্লিপার খুলে আলনা থেকে জামা-কাপড় বাছাই করতে লাগল তখন ওকে এক নজর দেখেই সীমা ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি রেখে বলল, যাক, ঝামেলা তাহলে চুকেছে।

বেশ বড় রকমের যুদ্ধই হয়ে গেল দেখছি! বা-ব্বা, কাল যুদ্ধ আজ সন্ধি। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হবে, কি বলিস, নন্দিতা?

—তা হবে। ধন্যি বলতে হয় মেয়েটিকে।

ছোট্ট মন্তব্য করল নন্দিতা। মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি।

—কাকে? জামা-কাপড় খুঁজতে খুঁজতেই নিস্পৃহ প্রশ্ন করে অঞ্জলি।

—আছে একটি মেয়ে। সে যাক, তুই কি জামা-কাপড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলি নাকি? আজ বুঝি আর কোন দিশা খুঁজে পাচ্ছিস না? যেন খুব আগ্রহী নয় এমনিভাবেই জিজ্ঞেস করল সীমা।

—কি জানি, বডিসটাকে ছাই খুঁজেই পাচ্ছি না। যেন মহাবিরক্ত এমনি ভঙ্গীতে বলল অঞ্জলি।

—ওকি, বডিস খুঁজে পাচ্ছিস না? ওমা, কি অসভ্য মেয়েটা! সীমার বিস্মিত মন্তব্য।

—এতে অসভ্যতার কি হল? ঘুরে প্রশ্ন করল অঞ্জলি।

—তা তো বটেই। একটা মেয়ে বাইরে থেকে এসে যদি বলে, বডিসটা খুঁজে পাচ্ছি না, তাহলে তাতে লজ্জা পাওয়ার কি আছে? কি বল, নন্দিতা।

নন্দিতাও কথার কোন জবাব না দিয়ে মুখে আঁচল চেপে হাসতে লাগল।

অঞ্জলি কপট রাগের ভঙ্গীতে সীমার কাঁধের জামায় খিমচে ধরে বলল, তুই না,ভারি অসভ্য। একেবারে একটা যা-তা।

সীমা ওর হাতটা ধরে বলল, সে তো বটেই। গণ্ডগোল করে এলেন উনি সেকথা বললুম বলে আমি হলাম অসভ্য। চমৎকার।

নন্দিতা সোজাসুজি বলল, মিটমাট হয়ে গেল, অঞ্জু। আর কোন গণ্ডগোল নেই তো?

—কিসে বুঝলি?

—সে কি আর বোঝা যায় না? কালকের ভীমরুল আজ যখন

প্রায় প্রজাপতির মত নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকল তখনই বুঝলাম, কাল যুদ্ধ আজ শান্তি।

—হ্যাঁ? একেবারে অত?

—তবে না তো কি। সে যাক্, আজ কি হল বল!

এবার অঞ্জলির কাঁধ দুই হাতে চেপে ধরল সীমা। ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল দু'জনে। নন্দিতা যথাসাধ্য এগিয়ে এসে বসল।

—আহ্, অমন করছিস কেন তোরা? এতে কি-ই বা হবার আছে? নিজের দাম বাড়াল অঞ্জলি।

—ন্যাকামি করিসনে, অঞ্জু। কি হয়েছে, বল।

সীমা আঁকড়ে ধরল ওকে।

– বেশ, বলবখন। আগে মুখ-হাত ধুয়ে আসি, জামা-কাপড় ছাড়ি।

– ছাড়িস পরে।

– না, গা-টা কেমন যেন কিথকিথ করছে ঘামে। গন্ধ হচ্ছে বিচ্ছিরি। অঞ্জু উঠতে চেষ্টা করল।

—আ-হা ওই গন্ধ গায়ে মাখার জন্যই তো হা-পিত্যেশ করে বসে আছি আমরা। তোর ওটা অত খারাপ লাগে।

—ঘামের গন্ধ?

—না, পুরুষ মানুষের গন্ধ।

অঞ্জু ফিরে গিয়ে সীমার চুলের মুঠি ধরে বললে, তোকে না, আচ্ছা করে কিছু দিতে হয়। ভীষণ বেহায়া হয়ে উঠছিস তুই দিনকে দিন। বাড়িতে চিঠি লেখার সময় লিখে দিলেই তো পারিস, চাকরি আর ভাল লাগছে না। বোর্ডিংয়ে কেমন যেন বিচ্ছিরি লাগছে আজকাল। কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যস, আর কিছু লিখতে হবে না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তখন দেখা যাবে, কত গন্ধ শুঁকতে পারিস।

বলে খিল খিল করে হাসতে লাগল অঞ্জলি।

—না, সে সব কোন চান্সই নেই রে, অঞ্জু।

—কেন?

—অত টাকা যোগাবে কে ? কেবল নিজে যদি জুটিয়ে নিতে পারি তাহলেই কিছু হতে পারে।

—তাহলে সে চেষ্টাই কর।

– সে কি আর করিনি ভাবছিস ? কিন্তু কিচ্ছু হল না। তাই তো আফশোস।

—চেষ্টা করে যা, হবে। এসে বলব সব।

বলে এবারে বাইরে বেরিয়ে গেল অঞ্জলি।

ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

* * * *

পরের রবিবার দুপুরের দিকে ওরা যখন সবাই যে-যার খাওয়া-দাওয়া সেরে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, কেউ বা অলস দেহে সদ্য-প্রকাশিত কোন নভেলের পাতা ওল্টাচ্ছিল, ঠিক তখন বোর্ডিং-এর গেটের সামনে এক ভদ্রলোক অপেক্ষমান দারোয়ানের সাথে কি যেন কথা কাটাকাটি করছিল।

দারোয়ান যতই তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করছিল, লোকটি ততই ভেতরে আসবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ক্রমে ওদের কথার সুর চড়তে থাকায় ইভার কানে গিয়েছিল সে আওয়াজ।

কৌতূহলী হয়ে সে জানালা খুলে তাকাল বাইরে। দেখল, লোকটির প্রায় বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বয়স হবে। মোটামুটি দীর্ঘ স্বাস্থ্য। পরিচ্ছন্ন ভদ্র চেহারা। চোখে চশমা, পোশাক পরিচ্ছদেও স্বচ্ছল অবস্থার ঘোষণা।

নিজের ঘরে থেকেই ইভা দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে রামশরণ ?

রামশরণ ওর দিকে ঘুরে বলল, ইয়ে বাবু বোড়দির সোঙ্গে দেখা কোরতে চাহে।

—কোত্থেকে আসছেন উনি ? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি। বলে সঙ্গে সঙ্গেই বারান্দায় বেরিয়ে এল ইভা।

লোকটি দূর থেকেই ওকে নমস্কার জানাল। প্রত্যুত্তরে ইভাও।

—আপনি সরলাদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? ইভার প্রশ্ন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। লোকটির বিনীত স্বীকারোক্তি।

—মাপ করবেন, আপনি কি ওঁর কোন……।

কেন যেন প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না ইভা।

লোকটি কিন্তু অত্যন্ত সহজে ওর অসম্পূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিল, নিশ্চয়ই আত্মীয়। উনি আমার স্ত্রী।

পরিচয়টা শুনেই যেন দপ্‌ করে জ্বলে উঠল ইভা মনে মনে।

এই সেই লোক? লম্পট, দুশ্চরিত্র। যে তার স্ত্রীকে ন্যূনতম সম্মানও দেয়নি। অকারণে এবং অনায়াসে যে একটি নিরীহ নারীর ওপর পশুর মত ব্যবহার করেছে। নারীকে বের করেছে তার ছোট্ট সংসার থেকে। সেই লোক আবার এখানে আসতে সাহস পেল কি করে?

ভাবতেই অবাক হয়ে যাচ্ছে ইভা। রাগে ঘৃণায় প্রায় কাঁপতে লাগল ইভা। দারুণ উত্তেজিতভাবে সে শুধু বলল, রামশরণ, বাবু যদি এখনি যেতে না চান তো তুমি তোমার কাজ করবে।

বলে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সে।

লোকটা তখনও ওকে বলছে, আহা, আপনি অনর্থক রাগ করছেন, শুনুন…মিস…

—রামশরণ! ইভা প্রায় চীৎকার করে উঠল।

—ইভা! অদ্ভুত কঠোর শোনাল সরলাদির কণ্ঠস্বর।

ইভা অবাক। সরলাদি বারান্দার এক কোণে দৃঢ়-ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে।

—লোকটা অসম্ভব নির্লজ্জ, সরলাদি। কিছুতেই যেতে চাইছে না।

—আজকাল কি তুমিই এ বোর্ডিং-এর অভিভাবিকা হয়েছ নাকি ইভা? আমাকে কেউ অপমান করলেই অমনি তাঁকে অপমান করার অধিকার তোমায় জন্মায় নাকি? এই তোমার শিক্ষা?

—সরলাদি !

—তুমি ঘরে যাও। রামশরণ, ওঁকে আসতে দাও।

রাণীর মত আদেশ জারি করলেন সরলাদি।

ইভা অপমানে লজ্জায় লাল টুকটুকে হয়ে উঠল।

মাথা নিচু করে ঘরে যেতে যেতে ইভা বলল, কারও ভাল করতে যাওয়াই আজকাল বোকামি।

অঞ্জলি নন্দিতা সীমা আর সুতপা সবাই এর মধ্যে এক এক করে জড়ো হয়েছিল বারান্দায়। কিছুটা শুনে আর কিছুটা অনুমানে সবাই প্রায় বুঝল ব্যাপারটা। শুধু সরলাদির এই আচরণটারই কোন মানে বুঝতে পারল না ওরা। কেমন যেন অপরিচিত আর অবাঞ্ছিত আচরণ করলেন সরলাদি।

অথচ তিনি ঠিক এ ধরনের লোক নন। এমনিতে ধীর শান্ত প্রকৃতির মহিলা তিনি। যথেষ্ট বুদ্ধিমতীও।

তবুও এ মুহূর্তে ওঁকে সমর্থন করতে পারল না ওরা। বরং ইভাকেই ওরা সমবেদনা এবং সমর্থন জানাল।

সীমা বলল, সত্যি, সরলাদির উচিত হয়নি তোকে এরকমভাবে বলাটা। স্বামী-নিন্দা সহ্য করবেন না বলেই যে আর একজনকে অপমান করতে হবে, এটা আবার কোন্ দেশী কথা ?

—তাছাড়া, শুধু লোকটিকে আসতে বললেই তো হত, ওকে ধমক দেওয়া কেন ? আমরা কি ওকে আমাদের অভিভাবক মেনেছি নাকি ? বেশ কিছুটা ঝাঁজের সঙ্গেই বলল অঞ্জলি।

—হুঁ-উ···সবচাইতে ভাল হত ইভাকে কিছু না বলে নিজেই ওকে যা-কিছু একটা বলা। ব্যস, চুকে যেত সব ল্যাঠা।

সুতপা মোটামুটি একটা মীমাংসার পথ খুঁজল।

—সত্যি, খামোখা একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেল।

কাউকেই বিচ্ছিরি কাণ্ডটার জন্য দায়ী না করে নন্দিতা নিজের ছোট্ট মন্তব্য করল।

এমনি কথা ওদের আরও অনেকক্ষণ ধরেই চলত। কিন্তু তার চাইতেও অনেক গুণ বেশি কৌতূহল -যাকে নিয়ে এই কাণ্ড সে লোকটি এখন কি করছে, কি বলছে সরলাদিকে আর সরলাদিই বা নতুন করে কোন্ কথা বলছে, শোনার জন্য দম বন্ধ হয়ে এল ওদের।

তাই, আপাতত নিজেদের কথা বন্ধ রেখে সেদিকে মনোযোগী হল ওরা। লোকটি সরলাদির ঘরে ঢুকেই পেছনে হাতের ধাক্কা দিয়ে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। হয়তো অন্য কোন কারণে নয়, শুধু নিজেদের কথাবার্তাটুকু গোপন করাই তার উদ্দেশ্য।

কিন্তু সরলাদি তাতে বাধা দিলেন।

দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, ওটা থাক।

বলেই লোকটিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে এসে আপনি ভাল করেননি। তবু যখন এসে গেছেন তখন যা বলার ওখান থেকেই বলে যান। মনে রাখবেন, নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্যই আপনাকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচালুম।

একটু থেমে আবার তিনি বললেন, আর হ্যাঁ, যা বলার সংক্ষেপেই বলবেন। থামলেন সরলাদি। দৃঢ় ভঙ্গীতে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। এতবড় জবরদস্ত লোকটিও যেন তাঁর দৃঢ়তার সামনে এতটুকু হয়ে গেল। কিন্তু সামান্য সময়। তারপরই সে নিজের পৌরুষ নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে সেও বলল, ছাখো সরলা, অপমানের ভয় আছে জেনেও আমি এখানে এসেছি। কাজেই, তুমি অপমান করলেও আমি আমার কথা না বলে এখান থেকে যাব না। তোমাকে যেদিন অপমান করেছিলাম সেদিন যেমন কারও ভয় করিনি আজও তেমনি তোমার অপমানের ভয় করিনে। তুমি তো জান, অবশ্য, প্রাপ্য যা তা দিতে বা নিতে আমার সঙ্কোচ নেই।

—সঙ্কোচ যে আপনার কিছুতেই নেই সে কি আর জানিনে।

বলেই একটু বিদ্রূপের হাসি হাসলেন সরলাদি।

—তা ঠিক। নইলে কি আর আজ তোমার এখানে আসতাম। ভয় পেও না, সরলা। এতদিন বাদে তোমার কাছে কোন সাহায্য বা অনুকম্পা ভিক্ষা করতে আসিনি। শুধু জানাতে এসেছি আমার পাকা ব্যবসায়ী বুদ্ধিটা পারুলবালার বুদ্ধির কাছে এমনভাবে হেরে গেল, যেন একটা লঞ্চের ধাক্কায় জাহাজ উল্টে যাওয়ার মত। সে যাক, আমার দুঃখের এবং পরাজয়ের কথা শোনানোর জন্য তোমার এখানে আমি আসিনি।

কথার মাঝখানে একটু থামল লোকটি। বেশ একটু সহজভাবে বসারও চেষ্টা করল। গুছিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই বলার কথাটিকেও গুছিয়ে নিল।

তারপর বেশ সহজ সুরেই আবার বলল, ব্যবসায়ী লোক আমি। হিসেবটাই বুঝি। দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে। সেই হিসেবের একটু গোলমাল দেখা দেওয়াতেই তোমার এখানে এলাম।

—আপনার সঙ্গে আমার তো কোন দেনা-পাওনার সম্পর্ক নেই।

সরলাদি সতর্ক করে দিলেন লোকটিকে।

—তা হয়তো নেই। তবে আমার হিসেবে আছে। খেয়ালের বশে আর উত্তেজনায় একদিন তোমাকে অপমান করেছি সেটা যেমন সত্য, আজ তোমায় যে সম্মান জানাতে এসেছি, সেটাও এতটুকু মিথ্যা নয়। কথাটা বিশ্বাস যদি না কর তো আমার বলার কিছু নেই। তবে ভেবে দেখ, তোমাকে ফিরে চাইতে আমি আসিনি। কোনরকম অনুকম্পাও চাইতে আসিনি। শুধু আমার একটা উপকার যদি তুমি কর, তাহলে নিজের মনের কাছে আমি খানিকটা ভারমুক্ত হতে পারতুম। অবশ্য, অনুরোধ না রাখলে, আমার বলার কিছু নেই।

—মাপ করবেন, আপনার কোন অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—কথাটা শুনে, তারপর মতামত দিলে পারতে। বুদ্ধির দোষে

আজ আমার সমস্ত সম্পত্তিই প্রায় পারুলবালার লোভের জালে আটকে পড়েছে। যখন বুঝতে পারলাম, যে ছেলে কোলে নিয়েও আমার বাড়িতে এসে ঢুকল সে আদৌ আমার নয়, ততক্ষণে আমি আইনের নানা জালে আটকে পড়েছি। শেষ মুহূর্তে যেটুকু বাঁচাতে পেরেছি, সেটুকু আমি তোমার হাতে তুলে দিতে চাই। নিতে পার না, সরলা? আমার সম্মানটুকু তুমি নিতে পার না?

আবেগে আবেদনে লোকটি তখন একেবারেই পাল্টে গেছে।

বিনীত সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে পকেট থেকে বেশ বড় একটি খাম বের করে সরলাদির দিকে এগিয়ে ধরল।

—আমি দুঃখিত। আপনি এখন যেতে পারেন।

সরলাদির নির্মম জবাব।

হাকিমের রায় শুনে একবার তার মুখের দিকে তাকাল আসামী। তারপর, ঘাড় নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেয়েরা দেখল, ইভা ওকে যে অপমান করেছে তার চাইতে ঢের বেশি অপমানের ভারে মাথাটা ওর নুয়ে একেবারে বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছে।

আর কোনদিকে না তাকিয়ে গেট পেরিয়ে রাস্তার লোকের সঙ্গে মিশে গেল লোকটি।

মেয়েরা অবাক এবং দুঃখিত। সরলাদিকে এতটা কঠিন হতে ওরা কখনও দেখেনি।

বোর্ডিংয়ের সকলেই সাধারণভাবে যে-যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সীমার আছে টিউশ্যন, ইভারও তাই। সুতপার গীটার। অঞ্জলিই একমাত্র রঙ্গীন প্রজাপতির হাল্কা চালে দিনগুলো নাচের ছন্দে কাটায়। সরলাদির দিনগুলো এমনিতেই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। সেদিনের ঘটনার পর তিনি আরও স্বতন্ত্র হয়ে গেলেন। একসঙ্গে থেকেও তিনি একা।

তবে ইদানীং তাঁকে প্রায়ই দেরীতে বোর্ডিং-এ ফিরতে দেখা যায়। কোথায় যান তিনি, কি করেন স্কুল ছুটির পর, কারও তা জানা নেই। জানতে চায়, কিন্তু কি ভেবে কেউ আর তাঁকে কোন প্রশ্ন করে না।

আর নন্দিতা এতদিন চেপেই রেখেছিল ব্যাপারটা। সে প্রাইভেটে স্পেশাল বাংলা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই ওকে দু'একটা বই-খাতা হাতে নিয়ে বেরোতে দেখে সুতপার কি একটা সন্দেহ বা কৌতূহল দেখা দিয়েছিল।

একদিন নন্দিতা যখন সন্ধ্যা নাগাদ হাল্কা একটু প্রসাধন করে গুন্ গুন্ করতে করতে একটা বই আর খাতা নিয়ে বের হচ্ছিল, সুতপা একটু কৌতুকের সুরে বলল, আর মিছিমিছি ঐ বই-খাতাগুলোর বোঝা কেন বয়ে বেড়াবি নন্দিতা? এটা তো আর বাড়িঘর নয় যে, বাইরে বেরোনর একটা লাইসেন্স লাগবে?

—তার মানে? সুতপার কথা যেন বোঝেনি নন্দিতা।

—মানে, অভিসারে আজকাল আর ছলাকলার দরকার নেই। কলকাতার নল-দময়ন্তীদের অভিসারের ফ্রী লাইসেন্স আছে।

মুখ টিপে টিপে হাসল সুতপা। রসিকতাটুকু তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল সে।

নন্দিতাও মিষ্টি হেসে বলল, তাই নাকি! হবেও বা! তবে কথা কি জানো সুতপাদি, অভিসারের লাইসেন্সটা ফ্রী পাওয়া গেলেও নল-রাজার দেখা পাওয়াটাই আজকের দিনে সমস্যা। এর চাইতে বরং সেদিন ঢের ভাল ছিল। লাইসেন্স পাওয়াটা একটু শক্ত হলেও নল-রাজার ওপর ভরসা করা যেত।

—আর আজকাল?

—একেবারেই ফরসা।

—তবে যাচ্ছিস কেন? আশা করার যখন কিছুই আর নেই তখন মিছে কেন এই পণ্ডশ্রম?

—আশা করার নেই বলেই কি তামাশাটা দেখতে মানা আছে ?

—ও বাব্বা, এরই মধ্যে এতকথা শিখে ফেলেছিস ?

খুশি হল সুতপা। প্রাণখোলা হাসি হাসল একটু।

তারপর হাসি থামিয়ে বলল, তা এতকথা শেখাল কে রে ? মাস্টারটি খুবই পাকা মনে হচ্ছে !

—ও...ব্বা...বা, ওঁর কথা আর বলো না। কথা শুনলেই হাত-পা সব সিঁটিয়ে যায়। কথা তো নয়, তেঁতুল বীচি ভাজা আর কি। কটর-মটর চিবোয় যেন।

চোখ কপালে তুলে দারুণ ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলল নন্দিতা ওর মুখে। শরীরটাও যেন অদৃশ্য এক ভয়ে শক্ত করে ফেলল সে।

দেখেশুনে ফিকফিক করে হেসে সুতপা বলল, তবে ওখানে যাস কেন ?

—কি করব ? গরজ বড় বালাই যে !

অসহায় মুখভঙ্গী করল নন্দিতা।

—কিসের গরজ ? পড়ার, না আর কিছুর ?

কৌতূহলী প্রশ্ন সুতপার।

নন্দিতা ওর প্রশ্নের কোন জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ হাতের ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠল সে।

আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, এ্যাই সেরেছে ! ছটা পাঁচ হয়ে গেছে ! এরপর গেলে কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে সুতপাদি। পাঁচ মিনিট দেরী হয়ে গেলে কি বলে জানো ?

উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই তক্ষুণি বলল, এটা সিনেমা হল নয়। দশ মিনিট বাদ দিয়ে দেখলে বা শুনলেও চলে, এমন কোন গল্প এখানে হয় না।

বলার সময় নন্দিতা মাস্টারের কণ্ঠটাই অনুকরণ করতে চেষ্টা করাতে বেশ মজা লাগল সুতপার।

সে-ও কল্পিত ভীত ভঙ্গীতে বলল, তাই নাকি ! এ যে পাঠশালার টেকো মাস্টারের মেজাজ রে নন্দিতা !

—এ যে কি, পরে বলবো'খুনি। এখন আর এক মিনিটও দাঁড়াতে পারছি না।

বলে কোনরকম জবাবের অপেক্ষা না করে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল নন্দিতা।

ওর ভাবভঙ্গী দেখে সত্যি সত্যি হেসে ফেলল সুতপা।

তারপর বেশ খানিকটা পরে নিজে বসল গীটার নিয়ে।

কিছুক্ষণ এ-গানের সুর ও-গানের সুর ছাড়া ছাড়া ভাবে বাজিয়ে থামল সে। কেন যেন কিছুতেই তেমন মেজাজ পেল না রেওয়াজ করার।

তাই, একটু পরে 'ধুত্তেরি ছাই' বলে তুলে রাখল গীটার। ভাবছিল মনে মনে এখন কি করবে !

কিন্তু এরই মধ্যে ইভা এসে ঢুকল ওর ঘরে। হাতে যেন স্বর্গ পেল সুতপা। আসলে একা একা এতটা সময় কাটানই ওর কাছে একটা সমস্যা। সরলাদি হয়ত আছেন,কিন্তু তাঁর থাকাটা না থাকারই সামিল। প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আর কি কথা যে তাঁর সঙ্গে বলা চলে, তাই ভেবে পায় না ওরা।

অবশ্য অনেক কথাই যে তাঁকে বলা চলে, এবং আর কাউকেই নয় শুধু তাঁকেই বলা চলে, এটা জেনেছিল সুতপা অনেক পরে। গভীর বেদনার মুহূর্তে। তা সে যাই হোক।

এখন ইভার উপস্থিতিতে ও খুবই খুশি হল।

খুশিয়ালি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কিরে, আজ পড়াতে যাসনি ?

গিয়েছিলাম, পড়াইনি। নির্লিপ্ত জবাব দিল ইভা।

—কেন ?

—কি জানি, ওদের কোথায় যেন যাবার কথা আছে তাই ছুটি নিল।

—যাক, খুব বাঁচা বাঁচলি।

একটুও খুশি না হয়ে ইভা বলল, ছাই বাঁচলাম। সেই তো যেতেই হল ট্যাঙস ট্যাঙস করে। তবে আর কি লাভ! কেন বাবা, ছুটিই যদি নিবি তো কাল বলে দিলেই হত। যত্তোসব ইয়ে—

বিরক্তিতে ঠোঁট দুটো উল্টে দিল ইভা।

সুতপা তবুও খুশির ভঙ্গীতে বলল, তা যাক। তবু তো ঘণ্টা দেড়েক বকর-বকর করা থেকে বাঁচলি।

—ও কিছু না। বরং বকে বকে এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, ওটা না করতে পারলেই কেমন যেন লাগে।

এমনভাবে কথাটা বলল ইভা যেন, সত্যি সত্যি সে খুব খুশি হয়নি এই হঠাৎ ছুটি হওয়াতে।

—বেশ তবে চল আমরা খানিকটা বকে আসিগে।

—কোথায়?

—এই, একটু এদিক-সেদিক থেকে ঘুরে আসি।

—না বাবা, আর ড্যাং ড্যাং করতে যেতে পারিনে। তবে কিছু যদি খাওয়াস তো যেতে পারি। বেজায় খিদে পেয়ে গেছে।

—বেশ, খাওয়াব।

বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে দু'জনে বের হল।

পথে নেমে ইভা জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? হঠাৎ এরকম ইচ্ছা হল কেন?

—কী?

—এই পথে পথে ঘোরবার ইচ্ছা?

—কি জানি। কেন যেন আজ চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না।

—এমনি হয় সবারই। সুতপার কথাকে সমর্থন করল ইভা।

—কী?

—এই, মন কেমন করে আর কি। সংক্ষিপ্ত জবাব ইভার।

কিছুক্ষণ চুপ করে পথ চলল ওরা। দোকান-পসার পথঘাটের আলোকসজ্জা দেখল। দেখল পথচারীদের চলাফেরার ভাবভঙ্গী। একসময় ইভাই আবার বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবি না তো?

—কি কথা? পাল্টা প্রশ্ন সুতপার।

তোর কোন ইয়ে নেই?

—না।

—আগে ছিল? পরবর্তী প্রশ্ন ইভার।

—সে জেনে তোর কি লাভ? পাশ কাটাতে চাইল সুতপা।

—লাভ-লোকসান কিছু নয়, জানতে ইচ্ছে হয়, তাই।

নিজের কথা জানাল ইভা।

—সে পরে জানিস। এখন চল, ওখানে গিয়ে কিছু খাই। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যই অন্যদিকে ইভার মনোযোগ আকর্ষণ করল সুতপা।

দুজনে গিয়ে ঢুকল রেস্টুরেন্টে। পর্দা সরিয়ে একটা লেডিজ কেবিনে বসল।

এবার সুতপা জিজ্ঞেস করল, কি খাবি?

—সে তোর যা খুশি বল।

না, তুই বল।

বেশ। একটা করে ফিস্ ফ্রাই আর চা।

—আর কিছু?

—না।

—বেশ।

অর্ডার নিয়ে চলে গেল বয়।

ইভা হাতের বালাটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, বেশ লাগে এ রকম-ভাবে ছেলেগুলোর নাকের ডগা দিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকতে।

—সে আবার কি? একটু না বুঝতে পারা সুর সুতপার গলায়।

—বাঁ রে, ঐ যে ওরা সব ক্যাবলা ক্যাবলা চোখে তাকিয়ে থাকে। কখন ও বা করুণ চোখে, ওটা দেখতে ভাল লাগে না।

—যা বলেছিস। এমনভাবে ছেলেগুলো তাকায় যেন সাতজন্মেও মেয়েমানুষ দেখেনি

—তাতে আমাদের অবশ্য ক্ষতি নেই, বরং লাভ। ওরা হ্যাংলার মত তাকায় বলেই আমার নিজেকে বেশ দামী মনে হয়। আর তোর? কথার শেষে একটা প্রশ্নের পুঁটলি ঝুলিয়ে দিল ইভা।

—কি আবার! বিচ্ছিরি লাগে।

—এটা তোর মনের কথা নয়। আমাকে কেউ মনোযোগ দিয়ে দেখছে, কারও দৃষ্টির লক্ষ্য আমার সতেজ দেহটা, এটা ভাবতে কোন মেয়েরই খারাপ লাগে না।

ইভা স্পষ্ট মন্তব্য করল।

শাড়ির আঁচলটা ডানদিকের কোমর থেকে খুলে পিঠের ওপর দিয়ে এনে এতক্ষণ-বের-হয়ে থাকা হাতের কনুইটুকু পর্যন্ত ঢেকে বুকের ওপর দিয়ে বাঁ কাঁধের ওপর ফেলল সুতপা। পর্দা-ঢাকা কেবিনও যেন যথেষ্ট নয় ওর কাছে। তারপর বাঁ কনুইয়ে টেবিলে ভর দিয়ে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে টেবিলের পাথরের ওপর হিজিবিজি কাটতে কাটতে বলল, ছেলেদের সম্বন্ধে একটা আগ্রহ থাকা মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক, মানি। যেমন ওদের আগ্রহ থাকে আমাদের সম্বন্ধে। কিন্তু তাই বলে ওরা আমাদের সর্বক্ষণের চিন্তা হতে পারে না।

—তোর কথাটাতে বেশ খানিকটা নীতি-নীতি গন্ধ পাচ্ছি, সুতপা। মনের কথা নয়, পুঁথির কথা। আগ্রহটা যেখানে প্রবল অথচ পাওয়াটা ক্রমেই বিলম্বিত, সেখানে সর্বক্ষণের একটা অতৃপ্ত চিন্তাই তো থাকবে। মনকে চোখ ঠারানোর নামই তো নীতিকথা।

ইভা বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গেই যুক্তি দিচ্ছিল।

এর আগেও সে লক্ষ্য করেছে, সুতপার কথায় এবং চলনে সব সময়েই প্রায় একটা নীতির ওড়না জড়ানো থাকে। নিজেকে আর

দশটা মেয়ে থেকে স্বতন্ত্র করে রাখার একটা নিরন্তর প্রচেষ্টা ওর মধ্যে। যেটাকে খুব ভাল মনে হয়নি ইভার। মনে হয়েছে, এই আদর্শবোধ আর নীতিবোধ গোটাটাই বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ নয় একটুকুও।

এর আগেও এ নিয়ে সে ওর সঙ্গে অনেক বিতর্ক করেছে। কিন্তু মাঝপথে কথা থামিয়ে দিয়েছে সুতপাই। এমনভাবে থেমেছে যাতে মনে হয়েছে, ইচ্ছা করলেই জিতে যেতে পারে সে, কিন্তু মহৎ এক উদারতায় তা না করে চুপ করে যায় সে।

সে সবই মনে আছে ইভার। আজ তাই ওকে বেশ একটু কড়া যুক্তি-জালে জড়াতে চাইছিল সে।

কিন্তু ওর কথার মাঝখানে খাবার এসে পড়াতে বাধ্য হয়েই থামতে হল ওকে।

যে-যার খাবারটা কাছে টেনে নিয়ে জুৎ করে বসল ওরা।

ফিস্-ফ্রাইএর ওপর একটু গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়াতে ছড়াতে ইভা আবার নিজের কথা সুরু করল, অভাবের মধ্যে তো হ্যাংলামি জন্মাবেই সুতপা! নীতির চালুনি দিয়ে তো সে দোষ সারানো যাবে না।

- তাই বলে নীতি বলে কিছু থাকবে না জীবনে। অভাবটাকে বড় করে দেখে রুচি, শিক্ষা, সব বিসর্জন দিয়ে অহেতুক হাত পা ছুঁড়ব খালি?

কথার শেষে টুক্ করে এক টুকরো খাবার মুখে ফেলল সুতপা। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভঙ্গীতে আস্তে আস্তে চিবোতে লাগল সে।

ইভা ইতিমধ্যেই এক টুকরো গিলে কাঁটা চামচের দাঁতে আর এক টুকরো বিঁধিয়ে নিয়ে মুখে পুরতে যাচ্ছিল। সেটা বন্ধ রেখে বলল, অভাবের শিক্ষাটাও তো কুশিক্ষা, ওতে আর কি লাভ হবে বল? এই যে আজ পথেঘাটে রকে কতকগুলো অসভ্য ছেলে দেখতে পাচ্ছিস, ওরা কারা? কেন দিনকে দিন দেশটা এমন কুৎসিত পথে চলেছে? অথচ শিক্ষিতের হার বাড়ছে বই কমছে না। কেন এমন হচ্ছে?

—তার কারণ, মানুষ আজ সহজেই অধৈর্য। হাল্কা জিনিসের প্রতি তার আগ্রহ।

—বড্ড বেশি মাস্টারী মাস্টারী কথা বলছিস না? শিক্ষা যখন কম ছিল তখন মানুষ অনেক বেশি সহনশীল আর সুরুচির অধিকারী ছিল আর শিক্ষা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব উধাও হতে লাগল। কথাটা নিজের কানেই একটু কেমন শোনাচ্ছে না? ছাখ সুতপা, যত শিক্ষাই দিস যত নীতির কথাই শোনাস কিছুই কাজে আসবে না যদি মানুষের প্রাথমিক অভাব বোধটা মেটাতে না পারিস। দর্শন আর ধর্মের চাটনী ভরাপেটে মন্দ লাগে না, কিন্তু খালিপেটে খেলেই গা গুলিয়ে ওঠে।

—আবার ওগুলোর ওপর চটছিস কেন?

ইভাকে ক্ষ্যাপানোর জন্যই বলল সুতপা।

—তার কারণ, আমাদের দেশের কর্তাব্যক্তিরাও মুঠো মুঠো দর্শনের পাতা ছুঁড়ছেন দেশের লোকের সামনে। অনেকটা তোর মতই তাঁরাও বলেন, বৃহৎ আর মহৎ কিছু পেতে হলে ত্যাগ আর নিষ্ঠার প্রয়োজন। ধৈর্য হারালে চলবে না, এটা চাই, ওটা চাই করলে সব ভেস্তে যাবে। গোটা দেশটাতে আজ যখন খাওয়া পরা থাকা কোন কিছুরই নিশ্চয়তা নেই, তখন ওসব ভাল ভাল কথাগুলোকে নেহাৎ ঠাট্টা বলে মনে হয় না তোর?

বিপক্ষের মন্তব্য শোনার জন্যই কথার শেষে প্রশ্নের লেজ জুড়ে দিল ইভা। সুতপা হঠাৎ ওর মুখের দিকে এক পলক দেখে বলল, উহুঃ। বরং আমার মনে হচ্ছে, তুই কোন খারাপ দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিস।

কথাটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে ইভা জিজ্ঞেস করল, কিসের দল?

—রাজনীতি।

—হুঃ, তুইও যেমন! মেয়েরা আবার রাজনীতি বোঝে নাকি?

—কেন, বুঝবে না কেন?

—সে অনেক কথা। তবে বোঝে না, এটাই হল ব্যাপার।

ইভা নিজের বক্তব্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে শেষ করল।

স্নতপা ওর মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, হু-উ ?

ঐ 'হু-উ' ধ্বনিটা জিজ্ঞাসার না বিস্ময়ের ঠিক বোঝা গেল না। তবে তখনকার মত ওদের কথা বন্ধ হল কিছুক্ষণের জন্য। কথা ছেড়ে খাবারে মন দিল ওরা।

ওদের খাওয়া যখন প্রায় শেষ তখনই রেস্টুরেণ্টের এদিকটাতে একটা তীব্র চীৎকার আর বচসা শোনা গেল।

কে একটা লোক নাকি খেয়ে-দেয়ে পয়সা দিতে পারছে না। বোধ করি রেস্টুরেণ্টের খাদ্যদ্রব্যের দাম সে জানে না, নয়ত নিজের পকেটের পয়সার হিসাব রাখতে পারেনি।

রেস্টুরেণ্ট-ম্যানেজার লোকটাকে বলতে আর কিছুই প্রায় বাকী রাখল না। তার কথার তোড়ে আর জোরে লোকটা যে মিউ-মিউ করে কি বলতে চাইল, তা প্রায় কারোরই কানে ঢুকল না।

রেস্টুরেণ্ট পক্ষ ছাড়া অন্যান্য লোকেরা প্রায় নির্বিকার দৃষ্টিতে ঘটনাটি উপভোগ করতে লাগল। বোধ করি, কি বলা যায় কিংবা আদৌ কিছু বলা যায় কিনা তা-ই ঠিক করে উঠতে পারল না। আর নয়ত এরকম ধরনের ব্যাপারে নাক গলানোটাকেই যথেষ্ট ভদ্র বলে মনে করল না। ইতিমধ্যে ইভা আর স্নতপা কেবিন থেকে বের হল, কিছুটা কৌতূহলের বশে।

ওরা কাউণ্টারের কাছে আসতেই জনৈক বয় চীৎকার করে বলল, এক টাকা কুড়ি।

স্নতপা ব্যাগ খুলে পাঁচ টাকার একটি নোট এগিয়ে দিল ম্যানেজারের দিকে। খুচরো ফেরত পাবার আগেই দু'আঙুলে করে কিছু মশলা তুলে মুখে ফেলল।

বেরিয়ে আসার আগে একবার আড়চোখে লোকটার মুখটা দেখল স্নতপা। মোটামুটি মন্দ নয় লোকটার পোশাক-পরিচ্ছদ। চেহারাটাও খুব গেঁয়ো লোকের মত নয়।

পথে নেমে ব্যাগের চেনটা টেনে দিতে দিতে স্নতপা তাই একটু ঠোঁট

বেঁকিয়ে বলল, লোক দেখে আজকাল চেনা ভার। কেউ আর আজ-কাল ওজন্ বুঝে চলে না। অপমানও হতে হয় তাই পায়ে পায়ে।

—কার কথা বলছিস? ঐ লোকটার?

—সবার কথাই বলছি। লোভী হলে লোকের অভাববোধ কখনও ঘোচে? ইভা বুঝল সুতপা ওকে ওর আগের কথার জের টেনেই এই মন্তব্য করল।

সে-ও তাই একটু বিদ্রূপের সুরেই বলল, তা ঠিক। লোভ আছে বলেই তো অভাব, নইলে আবার অভাব কোথায়? কিছু মনে করিসনে সুতপা, তোর ব্যাগে তো বেশ কিছু টাকাই ছিল, কিন্তু কই, তা থেকে সামান্য কটা পয়সাও তো দিতে পারলিনে?

—আমি দিতে যাব কেন?

—মন্তব্যই বা করতে যাচ্ছিস কেন? যাকে জানিস না, জানবার আগ্রহ নেই, যার এতটুকু উপকারও করতে পারলিনে তাকে নিয়ে আলোচনাই বা করতে যাস কেন? কারণ, ওটাতে কোন খরচ নেই, এই তো?

—তা কেন? একটা জিনিস দেখলে সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়াটা অন্যায় নয় মোটেই।

—হবে হয়তো।

আর কোন কথা নেই। দু'জনেই নীরবে পথ চলছিল। ঠিক যে মেজাজ নিয়ে দুই বন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছিল সেটা যেন হারিয়ে গেল। বন্ধুত্বের সুরটা কেমন করে যেন কেটে গেল।

ইভা মনে মনে ভাবছিল, সুতপা বড় বেশি নীতি বাগীশ। বড্ড বেশি সেকেলে ধ্যান-ধারণা ওর। আজকের দুনিয়াটা যেন ওর চোখেই পড়ে না। কিংবা পড়লেও আজকের কোন কিছুই ওর পছন্দ নয়। অথচ, ঠিক এরকমটা হওয়া উচিত নয়। লেখাপড়া শিখেও মানুষ যদি মা-মাসীর চিন্তাধারাকে নির্বিচারে মেনে চলে তো কি দরকার লেখা-পড়ার এই পণ্ডশ্রম করে?

আর সুতপা ভাবছিল, ইভা আজকালকার ছেলেদের মত কতক-গুলো বড় বড় কথা মুখস্থ করে রেখেছে। সব ব্যাপারেই ওইসব কথা-গুলো গড়গড় করে বলে যাবে সে। জীবনটা যেন কতকগুলো ডেফিনেশন আর থিওরীর ওপর নির্ভর করছে। কেমন যেন সব ব্যাপারেই একটু বেশি-বুঝি ভাব ওর। বেশ কিছুটা পুরুষালি ভাব-ভঙ্গী ওর।

দু'জনার মনেরই যখন এমনি ভাব তখন স্বভাবতই কারও কিছু বলার থাকে না। ওরাও তাই দোকানের আলো আর পথের লোক চলাচল দেখতে দেখতে পথ চলতে লাগল।

বেশ খানিকটা এমনি করে চলতে চলতে সুতপা হঠাৎ কি একটা দেখে যেন চমকে উঠল। এত বেশি আঁতকে উঠল সে যে, তার চলাই কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

আর সে ওরকম থমকে দাঁড়িয়ে যেতেই ইভা জিজ্ঞেস করল কি হল রে?

সুতপা ইঙ্গিতে ওর দৃষ্টি অনুসরণ করতে বলল ওকে।

তখন ইভাও দেখল, নন্দিতার পাশে পাশে কে এক ভদ্রলোক যেন চলছেন। দু'জনেই ওরা কথা বলায় ব্যস্ত। তাই দেখতে পায়নি ওদের।

সে তাই বলল,—বেশ তো, তাতে চমকাবার কি আছে? চল, আমরা একটু ওপাশটা দিয়ে ঘুরে যাই।

ইভা তখনও ঠিক বুঝতে পারল না, এতে অতটা চমকানোর কি আছে! সে তাই বলল, আজ দেখিস ওকে কি করি।

কি যে করবে তা ওর কথা থেকেই বোঝা গেল। আর কিছু নয়, শুধু নন্দিতার একটা মহাগোপন খবর যে ওরা ফাঁস করে ফেলেছে এটাই ওকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেবে।

আসলে গোটা ব্যাপারটাই একটা মজার ব্যাপার। তাছাড়া, আর যে কি হতে পারে তা ভেবে পায় না ইভা।

কিন্তু সে যদি জানতো, নন্দিতার সঙ্গের লোকটি কে, তার সঙ্গে সুতপার কি সম্পর্ক, তাহলে সেও ওরকম শিউরে উঠত ভয়ে। আর সবদিক ভেবে সুতপাও ওকে সে-সব কথা কিছু বলল না।

একটু পরে ইভা বলেছিল, কিরে, ও দেখে তুই অত ভয় পেয়ে গেলি কেন ?

—ওমা! আমি আবার ভয় পেলাম কোথায় ? নতুন জিনিস চোখে পড়ল, তাই।

পাশ কাটান জবাব দিল সুতপা।

—তা ঠিক। নন্দিতা যে আবার তলে তলে এত কাণ্ড করছে তা ভাবাই যায় না। ইভা সুতপার বিস্ময়কে সমর্থন করল।

—কেন ? এবারে সুতপার প্রশ্ন।

—এই···এমনিতেই একটু মুখচোরা মেয়ে কিনা! বক্তব্যকে স্পষ্ট করল ইভা।

—ওরাই তো বেশি সেয়ানা হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুতপার কথায় কেমন যেন একটু কর্কশ বিরক্তির সুর বাজল।

—রাগ করছিস কেন ?

—আমার রাগ করার কি আছে ? আর কথা বাড়াতে চাইল না সুতপা। ধীরে ধীরে বোর্ডিংয়ে চলে গেল ওরা।

ফিরে দেখে, নন্দিতা ওদের আগেই ফিরেছে। ওরা যে এল, জামা-কাপড় ছাড়ল সেদিকে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। ও তখন টেবিলের ওপর বাঁ কনুইয়ের ভর দিয়ে মাথাটা হাতের চেটোর ওপর রেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে কি একটা বই পড়ছিল।

সুতপা অবশ্য ব্যাপারটাকে ভালভাবে নিতে পারেনি বলেই সেদিকে তেমন দৃষ্টি দিল না। বাইরের জামা-কাপড় ছেড়ে সে তাই একখানা গল্পের বই নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুলো।

কিন্তু ইভা নন্দিতার পড়ায় অত গভীর মনোযোগ দেখে মুখ টিপে

টিপে হাসল। তারপর কি ভেবে তখন আর ওকে কিছু বলল না। নিজে একখানা বই খুলে নন্দিতার পাশে বসল।

কিছুক্ষণ উসখুস করে সে বলল, তোর পরীক্ষার আর কদ্দিন বাকী রে নন্দিতা?

নন্দিতা ওর দিকে না তাকিয়েই বলল, কদ্দিন আর! এসে গেল বলে!

—ও, তাই অত মনোযোগ দিয়ে পড়ছিস? বেশ, বেশ, পড়ে যা।

এবারে ইভার কথায় ওর মুখের দিকে একপলক তাকাল নন্দিতা। তাই কেমন যেন একটা সুর শোনা গিয়েছিল ওর কথায়।

কিন্তু ইভা তখন নিজের বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। সেও যেন মনোযোগী পাঠিকা।

ইতিমধ্যে পাশের ঘরে সীমার উপস্থিতি টের পাওয়া গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইভা ওর বই বন্ধ করে রেখে বলল, যাই, ভাল লাগছে না পড়তে। দেখিগে সীমা কি করছে।

বলে আর কোন কথার অপেক্ষা না করে সে চলে গেল।

সুতপা আর সীমা থাকে এক ঘরে। কাজেই, সে ঘরেই এল ইভা। এসে দেখল, সুতপার একপাশে একটা বই পড়ে রয়েছে। আর সে ডানহাতটা কপালের ওপর দিয়ে বাঁদিকে এলিয়ে আছে।

ইভা জিজ্ঞেস করল, কি রে এসেই শুয়ে পড়লি যে? শরীর-টরীর খারাপ করল নাকি?

সুতপা একটুও না নড়ে-চড়ে বলল, না, এমনি।

ইভা মনে মনে কি ভেবে আর কিছু বলল না ওকে।

তারপর সীমাকে বলল, তুই এখন কি করবি সীমা?

কাপড় ছাড়তে ছাড়তেই সীমা বলল কি আর করব, কাল আবার ক্লাস এইটের হিস্ট্রি-ক্লাস নিতে হবে। একটু চোখ বুলিয়ে রাখব সেটা।

বিচ্ছিরি লাগে এই হিস্ট্রি-ক্লাস। কিছুতেই মনে রাখতে পারি না সন-তারিখগুলো।

বলতে বলতে ওর কাপড়টা একটু বেসামাল হয়ে গেল।

তাই দেখে ইভা বলল, আহ্, ও কি হচ্ছে? মেয়েদের সামনে বুঝি আর কোন আব্রু রাখতে নেই?

সীমা তাড়াতাড়ি কাপড়টা সামলে নিয়ে বলল, যাঃ. ভারি অসভ্য হচ্ছিস তুই।

—তাই নাকি? বেশ, যেমন খুশি চল, আর কিছু বলব না।

এমনি করে এর তার ওর সঙ্গে টুকটাক গল্প করে সেই সন্ধ্যে রাতটা কাটাল ইভা। কিছুতেই পড়ায় মন বসল না ওর।

এক সময় অঞ্জলি সরলাদি সবাই ফিরল। তারপর খাওয়া-দাওয়া শেষে যে-যার ঘরে গেল।

রাত যখন প্রায় বারোটা তখন নন্দিতা পড়া শেষ করে বাতি নিভিয়ে শুলো।

ইভা আগে থেকেই শুয়েছিল, কিন্তু ঘুমায়নি।

নন্দিতা শোবার একটু পরেই সে বলল, লোকটা কে রে নন্দিতা?

নন্দিতা অবাক। সে জানতো না ইভা এখনও জেগে আছে। ওর প্রশ্ন শুনেই বুঝেছিল কোন্ লোকটার কথা জানতে চায়।

তবুও সেকথা না বলে সে অন্য কথা পাড়ল, এখনও ঘুমাওনি।

—না। কেন যেন ঘুম আসছে না। লোকটা কে?

—এমনিতেই যখন ঘুম আসছে না তখন আর কথা বলিসনে, ঘুম চটে যাবে।

—সে যাক, তুই বল।

ইভার বিছানায় একটু ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ হল। বোঝা গেল সে এদিকে পাশ ফিরে শুলো।

—কি আবার বলব? কার কথা বলছিস, আমি কি করে জানব?

—ন্যাকামি রাখ, তাহলে কাল সবাইকে বলে দেব। ইভা দূর থেকেই ভয় দেখাল।

—কি বলবি? ভয়ের চিহ্ন নেই নন্দিতার কথায়।

—সে যখন বলব তখনই বুঝবি?

—বেশ, তবে তাই বলগে।

বলে যুতসই করে শুলো নন্দিতা।

হঠাৎ একি কাণ্ড! ইভা এসে ওর বিছানায় শুলো।

নন্দিতা বলল, ওকি হচ্ছে? ঘুমাতে দিবিনে নাকি?

—আগে বল! ইভা নন্দিতার বাহুতে হাত রাখল।

নন্দিতা ওর হাতটা সরিয়ে দিতে দিতে বলে, আগে হাত সরা।

—কেন?

—ভাল লাগে না।

ইভা হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলে, এ হাতটা যদি ও লোকটার হত, তাহলে কেমন লাগত?

নন্দিতা বুঝতে পারে, অন্ধকারেও ইভা হাসছে। তবু বলে, কি জানি!

ইভা ওর থুতনিটা একটু নেড়ে বলে, ঠিক জানিস, ভাল লাগত। সত্যি, পুরুষের হাতের মত যাদু নেই মেয়েদের হাতে।

—কি করে জানলি?

—কেন জানব না? বয়স হয়নি? আমার কাছে অত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই বাপু। সে যাক, তুই বল।

—কি বলব?

—কি করে আলাপ হল?

—হঠাৎ।

—আহ্! ভাল করে গুছিয়ে বল না! ঐ 'হঠাৎ' বললে কিছু বোঝা যায়?

—ঐ তো…যেদিন শেয়ালদায় কি একটা ব্যাপার নিয়ে ভীষণ

মারামারি কাটাকাটি হল, শেষটায় ট্রাম-বাসে আগুন লাগাল ছাত্ররা সেদিনই

—সেদিন? কি করে?

—আমি তো কিছুই জানতাম না। কলেজ স্ট্রীটে যাচ্ছিলাম দু'একটা বই কিনতে।

—তারপর?

—রাজাবাজারের ওখান থেকেই ট্রামটা আর তেমন এগোচ্ছিল না। টুকরো-টাকরা কথা শুনছিলাম, শেয়ালদায় নাকি গণ্ডগোল হচ্ছে, তাই এই রাস্তা জ্যাম্।

—তারপর?

—ভাবছিলাম, কি করি? ফিরেই যাব না অন্য পথে যাব! হঠাৎ কোথা থেকে কতকগুলো লোক এসে পর-পর দাঁড়ানো ট্রামের বডিতে ঢিল ছুঁড়তে আর লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পেটাতে লাগল। চীৎকার করে ওরা কি যেন বলছিল, কিছুই শুনতেও পেলাম না, বুঝতেও পারলাম না।

—কি সর্বনাশ!

—কোনদিক দিয়ে কোথায় যাব কিছুই ঠাহর করতে পারছিলাম না। ইতিমধ্যে গাড়ির প্রায় সব লোকই এদিক-ওদিক চলে গেল। ঐ লোকটিই তখন আমায় বলল।

—কি? ইভা আবার নন্দিতাকে জড়িয়ে ধরল।

—এখানে বসে থাকা মানেই বিপদ। বুঝতে পারছি আপনি নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, ভয় পাবেন না। আমার যে তখন কি অবস্থা, বুঝতেই পারছিস। কাজেই, বাধ্য হয়েই ওর সঙ্গে গেলাম।

— তারপর?

—তারপর আর কি, বেশ ভদ্রভাবেই আমাকে পৌছে দিয়ে গেল।

—ভাব হল কি করে ?

—ভাব তো হয়নি ! এখন ওর কাছেই আমি পড়ি।

—কি ?

—কি আবার ! পড়ার বই।

—না - পড়ার বই পড়িস না !

—সে আবার কি ?

—আ-হা, জানিস না যেন !

—বাজে বকিস না তো। এখন যা, আমায় ঘুমাতে দে।

— যাচ্ছি, আর একটা কথা বল !

—কি ?

—লোকটা কি বলে ?

—কি আবার বলবে ? রোজ একবার করে বলে, আমার মাথাটাই নাকি নির্ভেজাল মাস্টারের মাথা।

—তার মানে ?

—মানে, মাথায় কিছুই নেই।

ঝর্ণায় নুড়ি গড়ানো লহর তুলে হাসল ইভা। সঙ্গে নন্দিতাও।

—চমৎকার কথা বলে তো লোকটা। ইভা তারিফ করল লোকটির বুদ্ধির।

—হ্যাঁ-গ-হ্যাঁ, চমৎকার না, হাতি ! শুনলে হাড়-পিত্তি জ্বলে যায়।

বিরক্তিসূচক একটু আওয়াজ করল নন্দিতা।

ইভা ওর গাল দুটো টিপে দিয়ে বলল, ঐ জ্বালায় তো মজা রে। যখন আরও বেশি জ্বালাবে তখন দেখবি, জ্বালা ছাড়া বাঁচা যায় না।

কথার শেষে হঠাৎ, একেবারেই আকস্মিকভাবে ইভা নন্দিতার বুকের ওপর চেপে ঘন-ঘন দুটো চুমো খেল।

তারপর, তেমনি হঠাৎ নিজের বিছানায় যেতে যেতে বলল, বেঁচে থাক, খুব সুখী হবি তোরা।

ইভার ঐ আকস্মিক এবং অযৌক্তিক আচরণে নন্দিতা এতই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল যে, সে আর কোন কথাই বলতে পারল না।

মনে মনে ভাবল, ইভাটা একেবারেই ক্ষেপে উঠেছে। ওকে যত-টুকু সে বলেছে তাতে কি বুঝেছে, কে জানে! হয়তো ভেবেছে, ওর পড়াটা একটা ছল। আসলে গল্পগুজব করতেই ওখানে যায় সে।

ভেবে মনে মনেই একটু হাসল নন্দিতা।

বেশ কিছুটা পরে ইভা নিজের জায়গা থেকেই বলল, কিরে, রাগ করেছিস নাকি?

—না। তবে এসব ভাল লাগে না।

—কি সব?

— ঐ যে··তোর বেহায়াপনা। স্পষ্ট অথচ মৃদু গলায় জানিয়ে দিল নন্দিতা ওর মতামত।

— তা ঠিক। আমি করলে বেহায়াপনাই হয়, কিন্তু আর একজন কেউ করলে?

ইভা হয়তো অন্ধকারেই ঠোঁট চেপে হাসছিল।

—ধ্যেৎ, চুপ কর তো এখন। ঘুমা।

—বেশ, ঘুমাচ্ছি।

হাল্কা পায়ে নূপুরের বোল তুলে হাসল ইভা। তারপর চুপ করল সে।

ওদের দু'জনার একজনাও জানতে পারল না, ওদের এই রাত দুপুরের কথাগুলো আর একটি মেয়ে শুনল। যে মেয়েটি ওদেরই মত ঘুমাতে পারছিল না। অথচ, সে শক্ত করে চোখ বুজে আপ্রাণ ঘুমাবার চেষ্টা করছিল।

সুতপার চোখ বন্ধ ছিল, কিন্তু কান তো বন্ধ করা যায় না?

অতএব, ওদের সব কথাই ওর কানে গেল। শুনল সব সুতপা, বুঝলও সব।

নন্দিতার কথা ভাবল সে। ভাবল ইভার কথা।

শুধু নিজের কথা ভাবতে গিয়েই অসীম শূন্যতায় ডুবে যায় সে। গভীর এক অন্ধকারে লুপ্ত।

*　　　*　　　*

এর কিছুদিন পরই সবার স্কুল ছুটি হয়ে গেল বেশ কিছুদিনের জন্য। তাই, সরলাদি আর নন্দিতা ছাড়া বোর্ডিং-এ আর কেউ রইল না। সবাই যে-যার বাড়ি চলে গেল। সুতপাও।

সেবারে বাড়িতে গিয়ে নতুন ফ্যাসাদে পড়ল সুতপা। সে জানতো না, এতসব ব্যাপারের পরও মা আবার ওর বিয়ের জন্য চেষ্টা করছে। জানল যখন তখনই সে বেঁকে বসছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুখতে পারল না। কেননা বাড়িতে তখন বাইরের লোক এসে গেছে। কাজেই, মনে মনে গজরাতে গজরাতে সে লোকগুলোর সামনে গিয়ে বসল। ওদের কথার জবাবও দিল।

যদিও তখনই সে ওদের সামনে এমন কিছু বেফাঁস কথা বলতে পারত, কিন্তু কেন যেন তাও সে করল না।

ব্যাপারটাতে নীরেন্দ্রনাথের কতটুকু সমর্থন আছে তা বোঝা গেল না। কারণ ঐ সময়টাতে ইচ্ছা করেই হোক বা কাজের চাপেই হোক তিনি উপস্থিত ছিলেন না।

লোকগুলো চলে যেতেই সুতপা মাকে বলল, এ সবের মানে?

মা ও মেয়ে একেবারে মুখোমুখি।

সুধাদেবী বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে বললেন, সে তো বুঝতেই পারছিস।

—এর ফলটা ভেবে দেখেছ?

—মা হিসেবে আমার কর্তব্য তোর বিয়ে দেওয়া, তোকে সংসারী করা। তারপর ফল কি হবে, সেটা তুই বুঝবি। বুদ্ধি থাকলে ফল ভালই হবে, যেমন আর দশটা মেয়ের হয়…।

মায়ের কথাটা শেষ হলো না। মাঝপথেই মেয়ে বলল, বুঝে-শুনে

না বোঝার ভান করো না। দশটা মেয়ের সঙ্গে আমাদের তুলনা করে লাভ নেই।

—কেন নয়? স্কুল-কলেজে যে সব মেয়ে পড়তে যায় তারা একটু এর-তার সঙ্গে গল্পগুজব করেই, কখনও কারো সঙ্গে সিনেমা রেস্তোরাঁ-তেও যায়, তাতে তাদের গায়ে ফোস্কা পড়ে না।

মা যেন মেয়েকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে।

—কিন্তু যাদের গায়ে সত্যি-সত্যি ফোস্কা পড়েছে?

মেয়েও মায়ের মিথ্যেটা ধরিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করল।

—বাজে বকিস না। যা বলছি, তাই কর। অনীতা সুমিতা ওদের বিয়ে দিতে হবে না আমার? মাঝখানে তুমি একটা পাথরের নারায়ণী হয়ে থাকলে চলবে?

—কেন? আমি বিয়ে না করলে ওদের বিয়ে আটকাবে কেন?

—আটকাবেই।

শেষ রায় জানিয়ে দিলেন মা। মেয়েও চুপ করে গেল। একমাত্র ভরসা রইল যে, লোকগুলোর যদি পছন্দ না হয় ওকে। কিন্তু আশ্চর্য, ওদের নাকি ওকে খুবই পছন্দ।

দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে সুতপা, বিশেষ করে গ্র্যাজুয়েট বলেই পাত্রপক্ষের পছন্দ। তারা খুবই অল্প কথায় এবং অল্প সময়ে কাজটি সারতে চাইল। সুধাদেবীরও সেটাই ইচ্ছা। কাজেই, ছুটির মধ্যে ছুটোছুটি করতে হল নীরেন্দ্রনাথকে। তবে তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, দ্বিতীয়বার কোন কেলেঙ্কারীর মধ্যে যেতে চান না। তাই এবারে সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের হাতে নেবেন তিনি। এ ব্যাপারে কারো কোন কথাই শুনবেন না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরিষ্কার বোঝাপড়া হয়ে গেল।

সুধাদেবী বললেন, তুমি মেয়ের বাপ, তুমিই তো সব করবে। তাই বলে আমাদের কথাটা একবার শুনতেও আপত্তি?

—শুনে লাভই বা কি? সর্বাধিনায়কত্বে গম্ভীর সুরে বললেন নীরেন্দ্রনাথ।

—এমন করে বলছ, যেন আমরা তোমার সঙ্গে শুধু শত্রুতাই করছি। কিছুটা অভিমান কিছুটা আহত সুর ফুটল সুধাদেবীর কণ্ঠে।

—সে প্রসঙ্গ তুলে লাভ নেই। মিছিমিছি কথা-কাটাকাটি করে কি হবে? তার চাইতে, আগে বুঝে দেখ, আমার সিদ্ধান্ত মেনে চলা তোমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা। তারপর, কাজে হাত দেওয়া হবে।

নীরেন্দ্রনাথের প্রতিটি কথায় এবং আচরণে স্ত্রীর বিচার-বুদ্ধির প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞাই প্রকাশ পাচ্ছিল এবং সাধারণভাবে সুধাদেবী এটা সহ্যও করতেন না। কিন্তু যেহেতু এই ব্যাপারটাতে তিনি একটা প্রচণ্ড চোট খেয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও একেবারে নির্ভয় হতে পারেননি, সেহেতু এখন আর ততটা তীব্র প্রতিবাদ করতে পারলেন না। মনে মনে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হলেও এখন তিনি পতি-অনুগতার ভূমিকায় বললেনঃ বেশ, তুমি যা ভাল বুঝবে, তাই কর।

সহৃদয় আনুগত্য নয়, অবস্থা বিপাকে আত্মসমর্পণ করলেন সুধাদেবী। এ নিয়ে বাপ আর মেয়ের মধ্যে স্পষ্ট কথাবার্তা হল একদিন। আগে এমন ছিল না, আজকাল এ বাড়ির এমনি ধারা। সবকিছুতেই একটা বিচ্ছিন্নতা। কেমন একটা অনাত্মীয় পরিবেশ।

সুতপার বিয়েকে কেন্দ্র করেই যেন আবহাওয়াটা একেবারে পাল্টে গেল এ বাড়ির। এখানে কেউ যেন কারো মা-বাপ, ভাই-বোন নয়, সবাই একেক জন অন্য মানুষ। সবাই স্বতন্ত্র। সবাই পৃথক। একই বাড়িতে থাকলেই সবাই মিলে একটা মানুষ হওয়া যায় না, হওয়া উচিত নয় কারো, এমনি একটা ভাব।

তাই, নীরেন্দ্রনাথ পরদিনই মেয়েকে ডেকে বললেন, সেবারে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে বলেই এবারে বাধ্য হয়ে আমায় একটু রূঢ় হতে হচ্ছে। বয়স হয়েছে তোর, বুদ্ধিও হয়েছে। হয়তো বুঝতে পারবি আমার কথাটা। এতদিন কিছু বলিনি, কিন্তু আজ বলতে হচ্ছে।

সুতপা বুঝল, এটা বাবার পরবর্তী নির্দেশের ভূমিকা। মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল সে। অপমানিত বোধ করছিল। তবু তক্ষুণি কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মেঝেটা আঁচড়াতে লাগল।

নীরেন্দ্রনাথ হাতের ম্যাগাজিনটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন, তোর মা তোকে বলেনি, কারণ ওর ভয়, আগে থেকে জানলে তুই হয়তো রাজি হবিনে।

এবার একটা না জানা কথা জানবার আগ্রহে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল মেয়ে।

—প্রত্যেক মেয়েই চায় যোগ্য স্বামী, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সে যোগ্যতার বিচার সব সময় বাইরে থেকে ঠিক করা যায় না। সাময়িক লোভ সে-বিচারে বিঘ্ন ঘটায়।

বাবা বড্ড বেশি সময় নিচ্ছেন বলে মনে হল সুতপার। অহেতুক সময় নষ্ট করা হচ্ছে।

আশ্চর্য! বাবা কি মনে করেন, বিয়ের জন্য সে খুবই আগ্রহী? সুতপা মনে মনে ভাবল, মেয়েকে তা হলে চিনতে পারেনি বাবা। তা নইলে, সামান্য বিয়ের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে এমন থমথমে আবহাওয়ার সৃষ্টি করত না।

মনে মনে যথেষ্ট অধৈর্য হয়ে উঠেছিল সে।

এখন তাই মুখ না তুলেই বলল, ব্যাপার-স্যাপার যা দেখছি তাতে বিয়ে করার আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নেই বাবা। মাকে বলেওছি সেকথা।

—কেন?

—সেটাই বোধ হয় ভাল হবে। দৃঢ় কোন মতামত নয়, নিষ্প্রভ মন্তব্য। নীরেন্দ্রনাথ বুঝলেন সেটা।

তাই বললেন, ভুল-ভ্রান্তি মানুষের হয়, সেটার জের টেনে চলাটা কোন কাজের কথা নয়। বরং সেটাকে শুধরে নিতে পারাটাই বড়

কথা। কাজেই, বিয়ে না করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া বংশের মান-সম্মানের কথাও সবারই ভাবা দরকার। আজ হয়তো মনে হচ্ছে, একটা জীবন যে-কোন রকমেই কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তার জন্ম অত ভাবনা কি? কিন্তু ভাবনার আছে। তাই আমরা তোর বিয়ের কথাই ভাবছি।

এতক্ষণে একটা সিদ্ধান্তের কথা জানালেন নীরেন্দ্রনাথ। জানাতে পেরে খানিকটা স্বস্তিও বোধ করলেন তিনি। নিজের প্রতি আস্থাবান হলেন কিছুটা। কি মনে করে মেয়ে তখন চুপ করে রইল।

তাই, তিনিই আবার বললেন. ছেলেটি গ্র্যাজুয়েট নয় বটে তবে খুবই মার্জিত রুচির। চাকরী খাসা। দু'হাতে রোজগার!

একে একে সব কথাই জানালেন নীরেন্দ্রনাথ।

কথা শেষ করার আগে বললেন, সবদিক ভেবে দু-একদিনের ভেতর তোর মতামত জানাস, তাহলেই আমরা কাজে এগোতে পারব। আর ....আমার মনে হয়...আজকের দিনে অত সব বিচার করা চলে না। আচ্ছা, তুই এখন যা।

যদিও নীরেন্দ্রনাথ মনে মনে ঠিক করেছিলেন, বাপ হিসেবে তিনি শুধু মেয়েকে তাঁর নির্দেশ জানিয়ে দেবেন, কিন্তু কার্যতঃ তা হল না। শেষ পর্যন্ত কেমন যেন মেয়ের মতামতেরই প্রত্যাশী হয়ে রইলেন। হয়তো এতদিন কর্তৃত্ব করেননি বলেই আজ সুযোগ পেয়েও তা করতে পারলেন না।

সেই রাতেই সুতপা ছোট বোনদের সঙ্গেও এ বিষয়ে একটু আলোচনা করেছিল। অন্য কিছুর জন্য নয়, আসলে এ বাড়ির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রীতি-বদলটা ওর কাছে প্রায় বিস্ময়কর ঠেকছিল, সেটার মূল কারণটাই সে জানতে চেয়েছিল।

তাছাড়া, ওর সম্বন্ধে ছোটদের ইদানীং কি ধারণা সেটাও জানবার একটা কৌতূহল ছিল।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষে ওরা যখন ঢুলে ঢুলে পড়া তৈরী

করার চেষ্টায় এক নিদারুণ প্রয়াস করছিল, তখন সুতপা নিজের শয্যা থেকে বলল, অত কি পড়ছিস রে, রাত বারোটা পর্যন্ত ?

গুন্‌গুনানি থামিয়ে ওর কথাটা শুনলো ওরা। তারপর, হ্যাঁ-না কিছুই না বলে আবার গুন্‌গুন্ করতে লাগল।

ওদের এই আচরণটাতে দিদির প্রতি ওদের শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল না। তার কারণ, ওদের মতে, দিদির জন্যই ওদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। নিজে তো বেশ মজা লুটে বেড়িয়েছে, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি বলে ওদের সুদ্ধু সাজা ভোগ করতে হচ্ছে।

এত কিছু করার পরও ওর তো বেশ মজা। একটা চাকরি নিয়ে টুক্ করে বোর্ডিং-এ চলে গেল। এখন যত কিছু আইন-কানুন সব ওদের ওপর চাপান হচ্ছে। স্বভাবতই দিদির প্রতি সশ্রদ্ধ হতে পারেনি ওরা। সুতপা তা বুঝতে পারে। তবু আবার বলে, কিরে, কথা বলছিস না যে ?

এবারে ছোট সুমিতাই বলে, কি বলব ?

—অত কি পড়ছিস ? যেন এটাই ওর জানা খুব দরকার।

সুমিতাও ছোট করে বলে, পলিটিক্যাল সায়েন্স।

—ওরে বাবা! মাথায় ঢোকে ? এমন ভীতকণ্ঠে বলল সুতপা যেন ওকেই একটা ভারি অপছন্দের পড়া পড়তে হচ্ছে।

—ঢোকে না বলেই তো ঘ্যানর-ঘ্যানর করছি। সুমিতাও সংক্ষিপ্ত স্পষ্ট জবাব দিল।

সুতপা বুঝল ঠিক সুবিধে হচ্ছে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। ওরা পড়তেই লাগল।

খানিকটা পর আবার সে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বলবি ?

ঠিক কাকে যে সে বলল, বোঝা গেল না।

ওরাও কেউ কোন কথা বলল না। ওর পরবর্তী কথার অপেক্ষা করতে লাগল।

সুতপাই আবার জিজ্ঞেস করল, তোরা কি আমার ওপর রাগ করেছিস ?

এবার হঠাৎ নমিতা বলল, কি করে বুঝলি ?

—কি জানি ? কেমন যেন মনে হল, তাই।

--কারও মনে হওয়ার ওপর তো কারও হাত নেই। নমিতার জবাবটা অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক।

সুতপাই তখন ভাব করার জন্য বলল, দ্যাখ, বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা এমনিতেই প্রায় পর হয়ে যায়, তাই যে ক'দিন একসঙ্গে থাকা যায় সেটাই ভাল। বিয়ে হয়ে গেলে কে কোথায় চলে যাবি তার কি ঠিক আছে ? এ ক'টা দিন রাগ করে থাকলে পরে এর জন্য মনে ব্যথা পাবি।

মা-মাসীর মত করে বলল সুতপা। গলায় একটা আন্তরিকতার সুর এল ওর।

নমিতা ততটা নীরস কণ্ঠে না বলে একটু নরম সুরেই বলল, রাগ তো করিনি, R. D-র ক্লাসটাকেই একটু ভয় করি, তাই ওর পড়াটা একটু ভাল করে দেখে রাখছি।

—জানিস তো, আমার বিয়েটা প্রায় ঠিক হয়ে এল, তোদের মত কি ?

--সে তোর ব্যাপার, তুই বুঝে দ্যাখ।

—তোরা কিছু বলবি না ?

—সত্যি কথা বলব ? অনীতার কাটা-ছেঁড়া প্রশ্ন।

—বল !

—বিয়ের ব্যাপারে তোর আর এটা-সেটা না ভাবাই ভাল।

—কেন ?

—অনেক কিছু করেই তো দেখলি, তাতে কি লাভ হল ?

—তার চাইতে যদি বিয়ে না-ই করি, তাহলে ?

—আমার মনে হয়, আরও খারাপই হবে। স্পষ্ট মন্তব্য করল নমিতা।

—কেন? কত মেয়েই তো বিয়ে করে না, কত মেয়ের বিয়ে হয়ও না। তাদের জীবন কি কাটে না? তারা কি ঠেকে থাকে?

—তাদের কথা থাক। তোর নিজের কথা বল।

—তুই-ই বল!

—বেশ, জানতে চাইছিস, তাই বলছি। তাদের প্রকৃতি আর আমাদের প্রকৃতি ঢের তফাৎ।

দেড় বছর দু'বছর আগের সুতপা এর জবাবে কি বলত তা বলা যায় না, কিন্তু আজকের সুতপা আর কোন কথা বলল না। কোথায় যেন একটা দুর্বলতা বাসা বেঁধেছে। নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে সে।

মনে মনে যতই সে চেষ্টা করল, এ দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে, কোনমতেই অবস্থার কাছে হার মানবে না, তবু সে যথেষ্ট শক্তি পেল না। অনেক ভেবে-চিন্তে সে বিয়েতে আর কোন আপত্তি তুলল না।

আর পাত্রপক্ষ যদিও খুবই তাড়াতাড়ি বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিল, তবু শেষ মুহূর্তে ছেলের মায়ের কঠিন অসুখ হওয়াতে প্রায় মাস দুয়েক পিছিয়ে গেল তারিখটা।

কাজেই, সুতপাকে আবার বোর্ডিং-এ ফিরে আসতে হল। অহেতুক এতদিন আগেই কাজ-কর্ম ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকার কোন মানে হয় না।

বাড়ির সবাই ভাবল, এটা খুব মন্দ নয়। অনর্থক ঘরে বসে থেকে দুটো মাসের মাইনে হাতছাড়া করার কোন মানে হয় না। তাছাড়া, এত আগে থেকেই ও যদি ঘরে বসে থাকে তো অনেকেই অনেক কথা জানতে চাইবে। হয়তো কোনরকমে এই বিয়ের ব্যাপারটা ফাঁসও হয়ে যেতে পারে। আর তাহলেই দ্বিতীয়বারও ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে

বিয়েটা। তাই, কাক-পক্ষীও যাতে জানতে না পারে, এবারে সেদিক থেকে তীব্র দৃষ্টি রাখা হল।

এমন কি সুধাদেবী দেয়ালেরও কান বাঁচিয়ে স্বামীকে একটি যথার্থই মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। খুবই গোপনে ঠিক হল, এবারে সুতপার বিয়ের ব্যবস্থাটা করা হবে নীরেন্দ্রনাথের বোনের বাড়িতে, বর্ধমানে। এতে কারও কোন সন্দেহ হবার কথা নয়। কারণ, স্থানাভাব আজকালকার একটি সাধারণ সমস্যা।

এতসব কথা সুতপা অবশ্যই জানত না। এমন কি জানতে চাইলও না সে। যেন সমস্ত ব্যাপারটাই ওর কাছে 'হচ্ছে হোক' গোছের। আগ্রহ বিশেষ নেই, আপত্তিও করে উঠতে পারল না। কেন, তা কে জানে!

হয়তো, পূর্ব-জীবনের পৌনঃপুনিক ব্যর্থতা এবং গ্লানি আজ ওকে কোন নিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতি বেশ কিছুটা লালায়িত করেছে। তাই, ন্যায়-অন্যায় সৎ-অসতের যুক্তি-বিচারকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল। কিন্তু তবুও যখন মানসিক দ্বন্দ্বে সে প্রায় জর্জরিত হয়ে উঠল, তখন এই বলে সে বিপর্যস্ত মনকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, সংসারের এতগুলো লোকের মুখ চেয়েই সে আজ এই বিয়েতে রাজি হয়েছে। নইলে, নিজের প্রয়োজনে সে কখনই বিয়ে করত না। কিছুতেই না।

এক এক করে সবাই ফিরে এল বোর্ডিং-এ। স্মৃতপাও এল। যারা নিজের নিজের বাড়িতে গিয়েছিল স্বভাবতই তারা সুস্থ আর সতেজ হয়ে ফিরল। বেশ কিছুটা প্রফুল্ল।

সরলাদি আর নন্দিতা যায়নি। তাই ওদের দেহে-মনে একটা ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট।

সরলাদি কখনই যান না। কাজেই সে সম্বন্ধে কেউ নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করল না।

শুধু নন্দিতাকেই জিজ্ঞেস করল, কিরে, কি রকম প্রগ্রেস হল?

পরীক্ষা সামনে বলেই যে নন্দিতা এবার বাড়ি যায়নি, এটা সকলেরই জানা।

কেউ কেউ সপ্রশংসভাবে বলল, ধন্যি মেয়ে তুই, নন্দি। তোর হবে।

কিন্তু এই 'ধন্যি মেয়ে' ওদের আবার একবার অবাক করল।

কয়েকদিন পরই যখন ওরা হঠাৎ জানল নন্দিতা পরীক্ষা দেবে না ঠিক করেছে, তখন সবারই চোখে চোখে বিস্মিত প্রশ্ন—ব্যাপার কি? এটা তো ঠিক বোঝা গেল না!

খামখেয়ালী মেয়ে নয় নন্দিতা। হাল্‌কা হুজুগে মাতে না কখনও। ওর সব কাজই ধীর-স্থির। কথাবার্তায়ও পরিণত বুদ্ধির ছাপ।

তবে কেন এ মেয়ে হঠাৎ এরকম অদ্ভুত একটা খেয়ালী সিদ্ধান্ত করল? সে নিজে অবশ্য বলল, নাঃ, ভাল প্রিপারেশান হয়নি। লাভ নেই সীটে বসে।

কিন্তু কেউ ওর কথাটাকে তেমন বিশ্বাস করতে পারল না। সবাই ধরে নিল, প্রিপারেশন-ফ্রিপারেশন ওসব বাজে কথা। অন্য কোন কারণেই ওর এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু কি সেই কারণ তা কেউ ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারল না।

তবে সিদ্ধান্তটা যে ওর পাকা সেটা সবাই টের পেল। কারণ সবাই দেখল, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেদিন থেকেই নন্দিতা বই-টইগুলো আর হাত দিয়েও ছুঁলো না। যেন ওটা ওর ব্যাপারই নয়। আবার স্কুল থেকেও কয়েকদিনের ছুটি নিল।

দেখে-শুনে কেউ বলল, কি পাগলামি শুরু করেছিস, নন্দি? এত পরিশ্রম করে এখন পরীক্ষার মুখে এসে বলছিস— দেব না পরীক্ষা!

নন্দিতা একই কথা বলল, বললাম তো প্রিপারেশন হয়নি, তাই।

—ও কি একটা কথা হল? সুতপা বোঝাতে চেষ্টা করল। বলল, যা হয়েছে তাই দে না। কেউ তো আর মেরে ফেলছে না?

—নাঃ, ভাল লাগে না ওরকম। নন্দিতা শুকনো মুখে বলে।

—আ-হা, ফেল যেন আর কেউ করে না! অঞ্জলি বলল, ওর সবতাতেই বেশি বাড়াবাড়ি। তোর হিসেবটা তো ঠিক না-ও হতে পারে! আগে থেকেই ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিস কেন? ফস্ করে পাশও তো করে যেতে পারিস!

নন্দিতার অন্ধকার মনে আশার আলো জ্বালতে চেষ্টা করল অঞ্জলি।

—আর তাছাড়া, পরীক্ষাটা দিলে একটা অভিজ্ঞতাও তো হবে। সেটাই বা মন্দ কি? সীমাও অল্প কথায় বোঝাতে চেষ্টা করল।

কিন্তু কারও কথাই কাজে এল না।

তখন ইভা বলল, বেশ, পরীক্ষা না হয় না-ই দিবি। সে তোর যা ইচ্ছা তাই কর। কিন্তু হঠাৎ এখন আবার ছুটি নিলি কেন?

—এমনি। শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না। সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ দিল নন্দিতা।

— তাহলে এক কাজ কর। ইভাই অবার বলল।

—কি?

ছুটিতে বাড়ি যাসনি। এখন চট্ করে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। দেখবি, বেশ ভাল লাগবে। তাছাড়া, ওখানে গেলে হয়তো তোর মতামতও পাল্টাতে পারে।

ইভার প্রস্তাবটি সবারই খুব মনঃপূত হল। শুধু যাকে বলা হল, তার চোখে-মুখে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

রাত্রে যখন যে যার বিছানায় শুলো তখন আর একবার নন্দিতাকে একা পেল ইভা। কী কারণে ইভার যেন ঘুম আসছিল না। বিছানায় চোখ বুজে পড়ে ছিল সে।

আর নন্দিতাও কেন যেন কেবলই এপাশ-ওপাশ করছিল। বুঝতে পারছিল ইভা, নন্দিতা ঘুমোয়নি। ঘুমোতে পারছে না।

কিছুক্ষণ বাদে খুবই নীচু গলায় ইভা বলল, নন্দি, ঘুমোসনি ?

নন্দিতা প্রথমটায় ওর কথার কোন জবাব দিল না। নীরবে পাশ ফিরে শুলো সে।

ওদের দু'জনের অলক্ষ্যে সুতপাও জেগে ছিল। সে কান পেতে শুনছিল ওদের কথা। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। ওরও ঘুম আসছিল না, তাই।

আর এত রাতে, যত আস্তেই লোকে কথা বলুক, ঘরের সকলেই তা শুনতে পায়।

তাই সুতপা শুনতে পেল, ইভা বলছে, খুবই সহানুভূতির সঙ্গেই সে বলছে, মনের কথা শুধুই চেপে রাখলে মনে ঘা হয়, নন্দিতা। আমরা তোর বন্ধু, আমাদের কাছে তোর লজ্জাই বা কি, আর ভয়ই বা কি ? আমায় বল্ না ! বিশ্বাস কর, আমি কাউকে কিছু বলব না।

সহানুভূতির হাত রাখল নন্দিতার কাঁধে। বিশ্বাসী স্পর্শ।

বহুদূরে প্রসারিত শূন্য দৃষ্টি মেলে নন্দিতা বলল, কি বলব ?

আগ্রহের সঙ্গে ওর কাঁধে-পিঠে একটু চাপ দিয়ে ইভা বলল, কি হয়েছে তোর ? কেন এমন করছিস ? তুই তো এমন নোস্ ! আর আর মেয়ের মত হলে কথা ছিল না। কিন্তু তা নোস্ বলেই তো এত করে বলছি।

বলতে বলতে ওরই চোখ দু'টো কেমন যেন টলটল করে উঠল।

মেঘে মেঘ টানে। এবার তাই নন্দিতাও ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

ইভার কাঁধে গলায় মুখ ঘষতে ঘষতে ফোঁপাতে লাগল নন্দিতা। আর ইভা ওর কান্না থামাতে গিয়ে নিজের কান্না থামাতে পারল না। তবুও ব্যাকুল সান্ত্বনার হাতে নন্দিতার মুখে মাথায় হাত বোলাতে লাগল সে।

অনেকক্ষণ থেকেই যে ব্যথার মেঘ গুমরে গুমরে কুণ্ডলী পাকাচ্ছিল স্নেহের শীতল স্পর্শে সে মেঘে বর্ষণ হল। গুমোট মেঘটা কেটে আর ফেটে গিয়ে এবার সারা আকাশটা কিছুটা ধূসর - বিবর্ণ হয়ে রইল।

একটু শান্ত হয়ে সে নিজেই বলল, তোরা বলতে বলিস, কিন্তু কি বলব, বল?

কেমন করে আর কোথা থেকে কথাটাকে সুরু করা যায় ভেবে না পেয়ে ওখান থেকেই কথা সুরু করল নন্দিতা।

তারপর একটু থেমে আবার বলল, পড়তে গিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুতেই পড়ায় মন বসত না। কেবলই কান পেতে ওঁর কথা শুনতুম। কি যেন এক জাদু আছে, ওঁর কথাই ভাবতুম। বইয়ের পাতার সব হরফ ডুবে গিয়ে ওঁর মুখটাই ভেসে উঠত। তুই বিশ্বাস কর, আমি মনে প্রাণে সে-ছবি ঝেড়ে মুছে দিতে চাইতুম, কিন্তু পারতুম না। আজও, এখনও পারিনে, ইভা। আমার সর্বনাশ যে আমি নিজেই করেছি। কে আমায় বাঁচাবে বল?

—হায় রে, এমন করেই মজেছিস! তা ভদ্রলোক সেকথা জানেন না? তিনি কি বলেন?

—এতদিন জানত না। কিন্তু যেদিন জানল, সেদিনটা প্রথম হকচকিয়ে গেলেন তিনি। তারপর ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি দুঃখিত। পড়াতে পড়াতে কখনও আপনাকে আমি ভুল বোঝবার সুযোগ দিয়েছি কিনা জানিনে। তবে বিশ্বাস করুন, ইচ্ছা করে আমি কিছু করিনি। আমি বুঝতেই পারিনি, এরকম একটা কিছু ঘটতে পারে। অবশ্য এর জন্য আপনারও লজ্জা পাবার কিছু নেই। সাধারণ-

ভাবে এতে দোষের কিছুই ছিল না। শুধু অবস্থা বিশেষে যা বরণীয় হতে পারত এক্ষেত্রে তা-ই হল বর্জনীয়।

—কেন? এবার ইভাই যেন লোকটিকে প্রশ্ন করে বসল।

নন্দিতাও তাঁর হয়ে জবাব দিয়ে গেল, আপনি যাতে কোনরকমে লজ্জা না পান সেজন্যেই বলছি, কেউ দু'বার ভালবাসতে পারে না।

—তার মানে, সে আর একজন কাউকে ভালবাসে?

—বাসত।

—বিয়ে হল না কেন?

—মেয়েটিই নাকি শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গেছে।

—কেন?

—কারণ……কারণ…… ওরা .. নাকি….।

—কি?

– না, সে .. তোকে আমি · বলতে পারব না।

যদিও ব্যাপারটা নন্দিতার নয়, অন্য কারও। তবুও তাদের একটা লজ্জাকর ঘটনার জন্য সে নিজেই যেন লজ্জা পেল।

ইভা অবাক। এ আবার কি?

সে বলল, তোর হঠাৎ এত লজ্জা পাবার কি হল? বল না ছাই!

– সে ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার।

– অথচ ভদ্রলোক তো তোকে বেশ বলে দিল?

– হ্যাঁ রে। ওঁর স্বভাবটা যেন কেমন। আর দশটা লোকের মত চাপাচুপি নেই ওঁর। যা করেন, যা বলেন সব একেবারে স্পষ্ট।

—তা কি বললেন তিনি?

—বললেন, কথাটা আপনাকে না বললেও চলত। অনুরূপ অবস্থায় সবাই তাই করত। কিন্তু আমি তা করব না। যদিও জানি, কথাটা শুনলেই আপনি চমকে উঠবেন এবং তারপর ঘৃণাও করবেন, তবু বলব, আমরা ভাই-বোন ছিলাম।

—বলিস কিরে? ভাই-বোন? এতক্ষণ নন্দিতার কাঁধের

ওপর যে সহানুভূতির হাতটা ছিল, একথা শুনে সেটা হঠাৎ চমকে উঠল। আর নিজের অজান্তেই হাতটাকে গুটিয়ে নিল ইভা।

তবুও ধীরে ধীরে ওর সব কথাই শুনল ইভা। শুনে কেমন যেন বোবা হয়ে গেল। কি যে বলবে, কি যে বললে ভাল হয়, কিছুই ঠিক করতে পারল না সে। তাই চুপ করেই রইল। ওর এতকালের ধ্যান-ধারণা আর সংস্কারের সঙ্গে বর্তমানের শিক্ষা আর বিচার-বুদ্ধির একটা সংঘর্ষ বাধল। ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় আর উচিত-অনুচিতের ধারণাটা হঠাৎ এক ধাক্কা খেয়ে যেন চক্রাকারে ঘুরতে লাগল।

বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। কারণ, এরকম একটা জটিল অবস্থায় সে কোনরকম মন্তব্যই করতে পারছিল না।

একসময় নন্দিতাই জিজ্ঞেস করল, কিরে, তুই যে কিছুই বলছিস না?

—কি বলব? ওকেই উল্টে প্রশ্ন করে ইভা।

—এই....যা শুনলি···তাই!

বেশ বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস ফেলে ইভা বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না, কি বলব। তবে ভদ্রলোকটিকে ভালই মনে হচ্ছে। আর কিছু না হোক, তিনি অন্তত স্পষ্টবাদী।

একটু থেমে আবার সে বলল, সে যা হওয়ার সে তো হয়েছে। এখন তুই কি করবি ঠিক করেছিস?

—তাই তো ভাবছি! চিন্তিত মুখে বলল নন্দিতা।

—একটা কথা শুনবি?

—কি?

—পরীক্ষাটা দিয়ে দে। তারপর যা হয় ভেবে দেখা যাবে।

—দেখি, কি হয়!

শেষ পর্যন্ত কি যে হত বলা যায় না। হয়তো পরীক্ষা দিত নন্দিতা। হয়তো দিত না। কিন্তু এরই মধ্যে আর এক গোলযোগ হওয়াতে সব উল্টে-পাল্টে গেল।

ঠিক এমন সময় যে এটা ঘটবে, তা কেউ আশা করেনি। অনেক দিন যাবৎই কথাটা শোনা যাচ্ছিল, নানারকম বাগ্‌বিতণ্ডা আর জল্পনা-কল্পনা চলছিল নানা মহলে। সবাই ধরে নিয়েছিল, একদিন না এক-দিন হবেই এটা। তবে সেটা যে ঠিক কোনদিন, কেউ ঠিক করে উঠতে পারেনি। কাজেই, যেদিন ঘটনাটি ঘটল, সেদিন দেশের লোক অবাক।

শেষ পর্যন্ত শিক্ষকেরা ধর্মঘট করল। শোভাযাত্রা বের হল শহরের রাজপথে। একেবারে মৌন সে মিছিল। শাসকবর্গের প্রতি নিঃশব্দ ধিক্কার যেন।

অনেকদিন অনেক বছর যাবৎই আবেদন-নিবেদন এবং আশ্বাস আর ভরসার কথা শুনে শুনে আজ তারা বীতশ্রদ্ধ। শাসকের অবহেলা আর অর্থনৈতিক দুর্দশায় আজ তারা নেমে এল পথে। সরাসরি কোন প্রতিকার চাইল তারা।

খবরের কাগজে নরম গরম নানা ভাষায় এর ওপর সম্পাদকীয় লেখা হল। অনেক পত্রিকা স্পষ্টতই শাসকের নিন্দা করে তাদের সতর্ক করে দিল যে, ব্যাপারটাকে আর বেশিদূর গড়াতে না দেওয়াই উচিত সরকারের। কেননা, শিক্ষকেরা পথে নামলে দেশের কোন লোকই ঘরে বসে থাকতে পারবে না। অন্তত তা পারা উচিত নয় কারও। তাই, অবিলম্বে এর মীমাংসা করে ফেলা উচিত। যাতে দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচী অনুযায়ী শিক্ষকদের আর বিধানসভা পর্যন্ত যেতে না হয়।

কিন্তু কারও কোন কথাই সরকারের মনঃপুত হল না। দ্বিতীয় দিনেও শিক্ষকেরা পথে বের হলেন এবং বিধানসভার দিকে এগোলেন। এবারে সরকারী কর্ম তৎপরতা বাড়ল। তাঁরা শিক্ষকদের শান্তভাবে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। ভবিষ্যতের ভরসাও তাঁরা দিলেন। কিন্তু শিক্ষকেরা তখন আর শুধু কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁরা সরাসরি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখাশোনা করে এর একটা চূড়ান্ত মীমাংসা চাইলেন। কাজেই বিরোধ পাকা হল।

কিছুতেই গতিরোধ করতে না পেরে পুলিশ দুর্বিনীত শিক্ষকদের সামান্য লাঠির আঘাত করল। এছাড়া তাদের করণীয় আর কিছুই ছিল না।

শিক্ষকদের এই ধর্মঘটে ইভা সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। সেও এই মিছিলে ছিল।

ধর্মঘটীদের ওপর পুলিশ লাঠি চালাচ্ছে শুনেই নানাজনে নানাদিকে ছুটোছুটি করতে শুরু করেছিল। চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। হৈ-চৈ চীৎকার। কে যে কি বলছে, তাও বোঝা যাচ্ছে না।

ইভাও ভাবছিল, এখন সে কি করবে?

ইতিমধ্যে হঠাৎ ওর সামনেই একটি লোককে পুলিশ লাঠি দিয়ে মাথায় মারল। লোকটা একটা কাতরোক্তি করে মাথায় হাত দিল। হাত চুঁইয়ে রক্ত পড়তে লাগল তার জামা কাপড়ে।

ইভা এগিয়ে গেল লোকটির দিকে। পুলিশটি ততক্ষণে অন্যদিকে চলে গেছে। বিশেষ কিছু ভেবেচিন্তে নয়, একটা দারুণ উত্তেজনার মধ্যেই একটি ট্যাক্সি ডেকে লোকটিকে তুলল সে।

ভিতরে বসে যতটুকু পারা যায় লোকটির রক্ত মুছে দিল ইভা। লোকটিরই রুমাল দিয়ে কোনরকমে একটা ব্যাণ্ডেজও বাঁধল। তারপর জিজ্ঞেস করল, বাড়ি যাবেন, না হস্‌পিটালে?

— বাড়িতেই যাব।

—কোথায়?

—শ্যামপুকুর স্ট্রীট।

—আমার মনে হয়, হস্‌পিটালে গেলেই ভাল করতেন। কিসে থেকে কি হয়, বলা তো যায় না।

শেষ পর্যন্ত বাড়িতেই ওকে পৌঁছে দিয়ে এল ইভা।

পরের দিনও দারুণ উত্তেজনার ভেতর দিয়ে কাটল। কারণ ধর্মঘট তখনও চলছে। এবারে অবস্থান ধর্মঘট।

সুতপা নন্দিতা অঞ্জলি আর সীমা, ইভার মত নয়। অতসব ঝামেলায় যেতে চায় না ওরা। বোঝেও না অতসব।

ইভা বলেছে, পাশের বাড়িতে আগুন লাগলেও যারা ভাবে দরকার নেই আমার অত ঝামেলাতে গিয়ে, তারা আর যাই হোক, বুদ্ধিমান নয় কোনমতেই। তাছাড়া, ওটা শিক্ষিতের লক্ষণও নয়।

—তা আমরা কি করব ওখানে গিয়ে?

—ছাখ, যাবার দরকার নেই মনে হলে যাসনে, সে বরং ভাল। কিন্তু ওসব বাজে বাজে কথা বলিসনে। ওখানে যারা গেছে বা যাচ্ছে তারা কি করতে যাচ্ছে? মারামারিও করছে না কেউ, যুদ্ধও করছে না। নিজেদের উপস্থিতি দিয়ে ওরা শুধু প্রমাণ করছে—ঐ দাবীর তারা অংশীদার এবং ঐ দাবী তাদের বিচারে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

কিন্তু ইভার অত কথার পরও ওদের কারোর মধ্যেই তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। তবে এ অবস্থায় এরকম চুপ করে বসে থাকাটাও প্রত্যেকের কাছেই একটু বিসদৃশ ঠেকল।

কাজেই, অঞ্জলির হঠাৎ মনে পড়ল, শোভাবাজারের মাসীর বাড়ি ওর অবশ্যই একবার যাওয়া উচিত। কারণ মাসীর নাকি শক্ত কি এক অসুখ হয়েছে। এ অবস্থায় তাকে একবার দেখতে না যাওয়াটা ওর পক্ষে খুবই অন্যায় হবে।

অতএব, পরদিন সকালে অঞ্জলি মাসীর বাড়ি গেল এবং ফিরল দু'দিন বাদে। ধর্মঘট ভেঙে যাওয়ার পর।

ও অবস্থায় সীমা কি করত বলা যায় না। কিন্তু সে-রাতে হঠাৎ ওর নাক দিয়ে কাঁচা রক্ত পড়তে থাকায় সে সত্যি সত্যি বিছানা নিল। এ রকমটা অবশ্য এর আগে আরও দু-এক বার ওর হয়েছে। তবে এত বেশি পরিমাণ এবং এত বেশিক্ষণ পর্যন্ত আর কখনও রক্ত পড়েনি।

আর অনেক ভেবেচিন্তে সুতপা পরদিন ইভার সঙ্গে গেল বটে, তবে সাগ্রহে বা স্বেচ্ছায় নয়, লজ্জায়। না গেলে নেহাতই খারাপ দেখায়, তাই।

আর নন্দিতা গেল ইভার টানে। ইভার সম্বন্ধে ওর কেমন ধারণা জন্মেছে যে, ও কোন অহেতুক কাজে সময় নষ্ট করে না। কাজের মেয়ে ইভা। বুদ্ধিমতী মেয়ে। তাই, নিজে সব ব্যাপারটা না বুঝলেও ইভার সঙ্গে যেতে ওর কোন দ্বিধা নেই। ভয় নেই কিছু।

তবে পরদিন সেখানে গিয়ে ওরা একটু অবাক হল।

দেখল, অনেক লোকের ভিড়ে সরলাদি মাথার ওপর একটি পত্রিকা চাপিয়ে বসে আছেন।

ওরা এগিয়ে গেল তাঁর দিকে।

ইভা জিজ্ঞেস করল, কি খবর সরলাদি ? কেমন বুঝছেন ?

সরলাদি কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে বললেন, এতে আর বোঝাবুঝির কি আছে ? যে দেশের লোক লেখাপড়া শেখে শুধু টাকা রোজগার করার জন্য, সে দেশে শিক্ষকতার মূল্য আশা করাই ভুল।

একটু সমর্থনের হাসি হেসে ইভা বলল, তবে বসে আছেন কিসের আশায় ?

—আশায় নয়, অপেক্ষায়। লোকেরা একটু ভাবতে শিখুক, মাস্টারেরা এ সমাজেরই লোক। এর যত দুঃখ, যত শোক, তা ওদেরও সইতে হয়। বোধকরি, অনেকের চাইতে বেশিই ওরা সয়। কেননা, ওদের শিক্ষা ওদের সহজে উত্তেজিত হতে দেয় না। লজ্জা পায় ওরা, সামান্যতে চীৎকার করতে। তবে একান্ত অসহ্য হলে তখন আর উপায় নেই। বাধ্য হয়েই পথে নামতে হয়।

একটু থামলেন সরলাদি। এত কথা এমনিতে তিনি বলেন না। কিন্তু আজ বললেন। বোধহয়, আজকের অবস্থাটাই ভিন্ন বলে।

আবার তিনি বললেন, দুঃখটা কি জান ? জাতির যাঁরা মাথা তাঁরা তাঁদের শিক্ষকদের এই পরিণতি দেখে একটুও লজ্জা পেল না। সেজন্য লজ্জায় আমরা মাথা তুলতে পারছি না। দ্রোণাচার্যদের পথে নামিয়ে আজ একলব্যেরা তাঁদের পাশ দিয়ে বুইকের ধুলো উড়িয়ে বিধানসভায় ঢোকে সদর্পে আর সগর্বে।

একটা নিঃশ্বাস ফেললেন সরলাদি। গভীর পরিতাপের নিঃশ্বাস।

ইভা বলল, আচ্ছা, আপনি বসুন। আমরা একটু ওদিকে থেকে ঘুরে আসি।

—এস।

ইভা ভুলে গেল, এই সরলাদির সঙ্গে কথা বন্ধ করেছিল সে। সেই বিশ্রী একটা ব্যাপার হয়ে যাওয়ার পর। সেদিন ওর মনে হয়েছিল সরলাদি অত্যন্ত স্বার্থপর। অবিবেচক। কারণ, সেদিন ওঁরই সম্মানের দিকে তাকিয়ে লোকটিকে কঠিন আঘাত করতে চেয়েছিল ওরা। কিন্তু তিনি তা বুঝলেন না। উল্টে ওকেই অপমান করলেন। সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে আর কথা বলেনি সে।

আজ এই বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁর মন্তব্যটা বলে ফেলল বলে ভালই লাগল ওর।

আজ মনে হল, অবিবেচক নন তিনি। স্বার্থপরও নন। আসলে, নিজের আত্মীয়কে পরের কাছে অপমানিত হতে দিতে রাজী নন তিনি। তাই, সেদিন ওরকম কঠিন সুরে রূঢ় কথা বলেছিলেন।

একটু দূরে গিয়ে নন্দিতাকে বলল, বিশেষ অবস্থায় না পড়লে লোককে ঠিক চেনা যায় না, তাই না? এই সরলাদি সম্বন্ধে আমাদের কি ধারণা ছিল বল তো? সবাই ভাবতাম, উনি শুধু নিজের স্কুলটাই বোঝেন, নিজের স্বার্থটাই দেখেন। এছাড়া আর কোন চিন্তা নেই তাঁর। কিন্তু ছাখ, আমাদের সবার চাইতে আগে তিনি এসে হাজির হয়েছেন এখানে। কেউ তাঁকে বলেনি, ডাকেনি।

সারাটা দিন সেখানে কাটিয়ে বিকেলের দিকে ওরা বাড়ি ফিরল। ফেরার পথে ইভা গতকালের আহত লোকটিকে একবার দেখতে যাবে ঠিক করল।

শ্যামপুকুর স্ট্রীটে পড়তেই নন্দিতা জিজ্ঞেস করল, এদিকে কোথায় যাচ্ছিস?

ইভা যেতে যেতেই বলল, চল না। কাল আমার সামনে যে

মাস্টারটিকে পুলিশ মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, এখানেই তাঁর বাড়ি। একবার দেখে যাই চল, ভদ্রলোক এখন কেমন আছেন।

নন্দিতার মনে একটা সন্দেহের কাঁটা বিঁধতে লাগল। এ রাস্তাটা ওর চেনা। এ পথটাই ওর জীবনে একটা নতুন স্বাদ বয়ে এনেছিল। আবার এ পথটা ওর কাছে একটা দুশ্চিন্তার পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর যেন এ পথে আজকাল চলাই বারণ।

তবু শেষ পর্যন্ত সে চলল একটা কৌতূহল বুকে নিয়ে। দেখা যাক, ইভা ঠিক কোন লোকটির কথা বলে।

কিন্তু একি! ও যে সত্যি সেই বাড়িটার দরজার কড়া নাড়ছে? এখন কি করবে সে? কোথায় যাবে?

তাড়াতাড়ি বলল, তুই ভদ্রলোককে দেখে আয়, ইভা, আমি আর সুতপা এগোই।

—কেন? আয় আমার সঙ্গে।

ওর কথার কোন মূল্যই দিল না ইভা।

সুতপার এ বিষয়ে কোন মতামতই ছিল না। কেননা সে কিছুই জানত না।

ইতিমধ্যে একটি অল্প বয়সের ছেলে এসে দরজা খুলে দিল। ছেলেটি কালই ইভাকে দেখেছিল এ বাড়িতে।

তাই সহজেই বলল, আসুন আপনারা, ভেতরে আসুন। দাদাবাবু ওঘরে আছেন।

বলে পথ দেখাল সে। যদিও ইভা এবং নন্দিতা পথ জানত।

ঘুরে দাঁড়িয়ে নন্দিতা শেষবারের মত বলল, তুই যা, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

ইভা ওর শাড়িটা ধরে বলল, ও কি অসভ্যতা হচ্ছে? আয়।

ঘরে ঢুকে নন্দিতার চাইতেও বেশি—অনেক বেশি ভয় পেল সুতপা। যদি কেউ নিশ্চিতভাবে কখনও বুঝতে পারে যে, সে একটি বাঘের গর্তে ঢুকে পড়েছে এবং সেখান থেকে বেরোবার তখন আর

কোন উপায় নেই, তাহলে তার যে মানসিক ও শারিরীক অবস্থা হয়—সুতপার তখনকার অবস্থা তার চাইতে একটুও কম নয়।

সম্পূর্ণ সুস্থ সুতপা হঠাৎ ঘামতে সুরু করল। পা দু'টো যেন কিছুতেই শরীরটাকে ধরে রাখতে পারছে না। বুকের ভেতর কে যেন অসম্ভভ দ্রুত হাতুড়ি পিট্‌ছে।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই এত দ্রুত হল যে, উপস্থিত কেউ তা টের পেল না।

বোধ করি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঁচবার চেষ্টা করার বৃত্তি থেকেই ভয়ের সঙ্গে লড়াই করার একটা শক্তি মানুষ পেয়ে যায়। সুতপাও তাই পেল। সম্পূর্ণ সামলে নিল নিজেকে।

এতক্ষণ চোখ বুজে ছিল লোকটি। ওরা যেতেই চোখ মেলে তাকাল।

নমস্কার করল ইভা। নন্দিতাও নমস্কার করার মত করেই হাত দুটো একটু ওপরে তুলে কি এক লজ্জায় মাঝপথে শাড়ির সাথে জড়িয়ে ফেলল হাত। মাথাটা চেষ্টা করেও ওপরে তুলতে পারল না সে।

কিন্তু যার ভয় সব চাইতে বেশি, সেই সুতপা কিন্তু একটুও দ্বিধা-গ্রস্ত হল না।

একটু হেসে ইভা জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন আছেন, রজতবাবু?

রজত একটু শুকনো হাসি হেসে বলল, এরপরও যদি ভাল না থাকি তাহলে ব্যথাটাকে বড্ড বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে।

—মানে?

—মানে, আপনারা এতগুলো লোক যখন এত কষ্ট করে আমায় দেখতে এসেছেন তখনও যদি আমি ভাল বোধ না করি তাহলে পুলিশের লাঠিটাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না কি?

ওর কথায় একটু হাসল ইভা। সুতপা নন্দিতাও হাসতে পারত স্বাভাবিক অবস্থায়। কিন্তু এখন ওরা তা পারল না।

তারপর ইভাই আবার বলল, দাঁড়ান, এদের পরিচয় করিয়ে দিই।

বলেই ওদের দিকে ঘুরল ইভা।

এবারে ভুল করল সুতপা। আগে থেকেই আত্মরক্ষার জন্য যদি এতটা ব্যস্ত না হত সে তাহলে অবস্থাটা অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু সেই তখন তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, তার আর দরকার হবে না। আমি ওঁকে চিনি।

সুতপার মুখটা কঠিন হয়ে উঠল কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে। যেন অবশ্যম্ভাবী এক আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে রইল সে।

ওর কথা শুনে এবারে অবাক চোখে তার দিকে তাকাল ইভা আর নন্দিতা।

এ রকমটা রজত আশা করেনি। সে তো এ পর্যন্ত ব্যাপারটাকে গোপন করতেই চেয়েছিল। তবে সুতপা কেন এই বোকামিটা করল? এতে ওর কি লাভ হবে? এরপরেই তো ওরা জানতে চাইবে, কি করে পরিচয় হল ওদের, কতদিনের পরিচয় ইত্যাদি, তখন? কি বলবে ও? না কি ইভা দেবীর কাছ থেকে কালই জেনেছে ওর কথা, তাই আজ বেশ একটু দল ভারি করে এসেছে ওকে আক্রমণ করতে?

দেখা যাক কি করে, এমনি একটা ভাব নিয়ে চুপ করেই রইল রজত।

তারপর কি ভেবে বলল, হ্যাঁ, সুতপাকে আমি আগে থেকেই চিনি।

নন্দিতা চকিতে রজতের দিকে তাকাল।

রজত বলল, ইভা দেবী, আপনি আমার উপকার করেছেন, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আর নন্দিতা আমার কাছে পড়ত, তাই আমার স্নেহের পাত্রী। সুতপার সঙ্গে পরিচয়টা অবশ্য অনেক আগের তবু সবাইকেই বলছি, আপনারা বসুন। উপস্থিত আপনারা আমার অতিথি। নন্দ, নন্দ, এই নন্দ!

—দাদাবাবু? নন্দ নামের সেই ছেলেটি দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল।

—যা, এঁদের জন্য একটু চা নিয়ে আয়।

ইভা বলল, সেকি! আপনার এখানে আমরা কি চা খেতে এসেছি?

আবার একটু হেসে রজত বলল, দেখুন শুধুই চা খাবার হলে মানুষ রেস্টুরেণ্টে যায়, আমি জানি। কিন্তু কারও বাড়িতে যে-কোন কারণে এসে এককাপ চা খেলে মনে করার কোন কারণ থাকে না যে, লোকটা চা খেতেই এসেছিল।

—বাঃ, আমি কি তাই বললাম নাকি?

—মানেটা তাই দাঁড়ায় বটে।

—এরকম মানে করতে শিখলেন কোথা থেকে?

—যেখান থেকে সেরা শিক্ষা পাওয়া যায়—সেই সংসার থেকে।

সহজভাবেই হাসল ইভা। বলল, নাঃ, কথায় আপনার সঙ্গে পারা যাবে না দেখছি।

—হতাশ হবেন না। আখেরে পেরেও যেতে পারেন। সে যাক, আপনারা বোধ করি বিধানসভার ওখান থেকেই আসছেন, কি খবর বলুন?

—খবর আর কি? আলাপ-আলোচনা তো চলছেই, কিন্তু কাজ তেমন এগোচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আমার মেন যেন ধারণা, শেষ্ পর্যন্ত লাভ কিছুই হবে না।

রজত শোয়া অবস্থা থেকে একটু উঠে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে বলল, তাও কি হয়? লাভ তো নিশ্চয়ই কিছু হবে। সেটা আর্থিক না হলেও আত্মিক হবেই। এই যে আজ কলকাতা এবং শহরতলীর সমস্ত শিক্ষক একটা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক হতে পেরেছেন, এটাই কি কম লাভ নাকি? সাধারণ লোক না জানুক, শিক্ষক হিসেবে আপনারা তো জানেন আপনাদের নিজেদের মধ্যে কত গলদ! জাতিকে শিক্ষা দেবার ব্রত যাঁরা নিল, দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, তাঁদের নিজেদের চারিত্রিক শিক্ষা প্রায় কিছুই নেই। কাজেই, শিক্ষকতা যে

একটা জাতির জীবনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্রত, অনেক চীৎকার করেও আজ লোককে তা বোঝান যাচ্ছে না। তারা স্পষ্টই দেখছে, দোকানদারি করার সঙ্গে মাস্টারী করার তফাৎ কিছু নেই। ভিন্ন রকমের দুটো ব্যবসা মাত্র।

রজত ওর স্বভাব অনুযায়ী বিষয়টির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণই করছিল। কিন্তু শিক্ষকদের চারিত্রিক অশিক্ষার কথা কয়েকবার উল্লেখ করায় সুতপা মনে করল রজতের ঐ বক্র মন্তব্যের উদ্দেশ্য ওকেই কটাক্ষ করা। তবুও সেটা যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল না বলেই সে ওকথার কোন জবাব অবশ্য দিল না। কেননা, তা করতে যাওয়াই বোকামি।

তাই সে শুধু বিরক্ত কণ্ঠে বলল, আমার একটু কাজ আছে, ইভা। তোরা বোস, আমি চলি।

ইভা আর নন্দিতা ওদের ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল।

রজত তাড়াতাড়ি বলল, আর একটু অপেক্ষা করে চা-টা খেয়ে যাও।

এবং সুতপাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তৎক্ষণাৎ বলল, বাড়ির সব ভাল আছে তো ?

এবারে সুতপা হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল।

বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় ঠোঁট বেঁকিয়ে সে বলল, ভণ্ডামিটা চরিত্রের কোন্ গুণ জানি না। তবে আমার মনে হয়, নতুন পরিচয়ের পক্ষে গুণটি মন্দ আকর্ষণীয় নয়। মুস্কিল হল কি জান, পুরোনো হলে ওটাতে ঘৃণার উদ্রেক করে।

রজত তবুও যথেষ্ট শান্ত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলল, উত্তেজিত হয়ো না। সুতপা। তাতে এঁরা সহজেই তোমার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে যাবে। শোন, যেটাকে আমার ভণ্ডামি বলছ, সেটা তোমার সম্মান বাঁচানোর জন্যই আমি করেছি।

—আমার সম্মানের দিকে তোমার এত লক্ষ্য ? ওরা কি মনে করবে ভেবে, এ মুহূর্তে হাসলুম না। তবে অন্য সময় ভেবে দেখো,

তখন হয়তো তোমারও হাসি পাবে। সে যাক, আমি চললুম। তুমি বরং বেশ গুছিয়ে ওদের কাছে তোমার বীরত্বের কাহিনী বল।

এবারে আর কোন কথার অপেক্ষা না করে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল সুতপা। রজতও তখন আর ওকে বাধা না দিয়ে বলল, এরপর আর তোমাকে থাকার জন্য বলা যায় না।

ওর কথা শেষ করার আগেই সুতপা দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। কি ভেবে একটু থেমে গিয়ে আবার বাইরে চলে গেল সে।

সমস্ত ঘটনাটা এমনই অপ্রীতিকর আর নাটকীয় যে, ইভা আর নন্দিতা কোন কথাই বলতে পারল না।

কি এক লজ্জায় ইভা মাথা নীচু করে আঙুলের নখ খুঁটতে লাগল। আর নন্দিতা শাড়ির আঁচল আঙুলে ক্রমাগত জড়াতে আর খুলতে লাগল।

প্রথমে ইভা এবং পরে নন্দিতাকে দেখে রজত যতটা খুশি হয়েছিল এখন তার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। সেও যে এখন ওদের কি বলতে পারে, কিছুই ঠিক করতে পারল না।

ইতিমধ্যে নন্দ চা নিয়ে আসাতে তবু একরকম মন্দ হল না। কিছুই না, তবু যেন সবাই একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

একসময় রজতই একটু বিষণ্ন হাসি হেসে বলল, অবস্থা বিশেষে জিনিসের স্বাদও কত বদলে যায় দেখুন। এমনিতে চা জিনিসটা খুব মন্দ নয়, কিন্তু এখন সেটাই হয়তো পাঁচনের মত লাগবে।

অন্য সময় হলে এ কথায় সবাই হয়ত হাসত, কিন্তু এখন চেষ্টা করেও কেউ ঠোঁটটা একটু প্রসারিত করতে পারল না। সবাই যে-যার চা শেষ করতেই ব্যস্ত হল।

ওরা যখন চলে যাচ্ছে তখন রজত বলল, জিজ্ঞেস করতে বিশেষ ভরসা পাইনে, তবু বলছি, তোমার পড়াশুনা কেমন চলছে, নন্দিতা ?

নন্দিতা কোন কথা না বলে চুপ করে রইল। রজতের প্রতি ওর

যে কোন রাগ বা ঘৃণা আছে, তা নয়। আসলে নিজের লজ্জাতেই কথা বলতে পারছিল না সে।

রজত ওর মৌন ভাব দেখে তৎক্ষণাৎ বলল, থাক। আপত্তি থাকলে বলার দরকার নেই।

নন্দিতা তবুও কিছু বলতে পারছিল না। এই না বলতে পারার জন্য ওর কষ্ট হচ্ছিল খুবই। কিন্তু কেন যেন ওর ঠোঁট কিছুতেই ফাঁক করতে পারছিল না ও।

ইভা দেখল, সুতপা রজতবাবুকে অহেতুক খানিকটা অপমান করে গেল। অনেকটা গায়ে পড়ে ঝগড়া। লোকটি ভদ্রতার খাতিরে তা সহ্য করল। আবার এখন নন্দিতাও ওর কথার জবাব না দিয়ে ওকে অপমান করছে। এটা উচিত নয় কোনমতে। লোকটা আর যাই হোক, অভদ্র তো নয়।

অবশ্য এটাও সে বুঝল, পরীক্ষার ব্যাপারে নন্দিতার বর্তমান সিদ্ধান্তটাই ওকে এমন লজ্জিত আর নীরব করেছে। এরকম অবস্থায় নিজের মুখে সেকথা বলতে না পারাই স্বাভাবিক।

তাই সে-ই এবারে ওর হয়ে বলল, নন্দি মনে মনে আমার ওপর রাগ করবে জানি। তবু বলছি, ও হঠাৎ পরীক্ষা দেবে না ঠিক করেছে।

—সেকি! কেন?

—কি জানি? বলছে, প্রিপারেশন হয়নি।

একথা শুনে রজত কি ভেবে যেন চুপ করে গেল।

আবহাওয়াটা থমথমে বলেই ইভা তক্ষুণি আবার বলল, আচ্ছা, এখন আসি। সুযোগ পেলে আবার আসব।

ওটা কোন প্রতিশ্রুতি নয়। সৌজন্যের বুলি মাত্র। বক্তা আর শ্রোতা সবাই জানে, ও কথার মাত্রাই ওরকম।

তবুও, ঐ সৌজন্যের শিষ্ট পথ ধরেই আবার ওখানে গিয়েছিল ইভা। একবার নয়, অনেকবার।

সে রাতে বোর্ডিং-এ ফিরে ওরা দেখে সুতপার ঘর তখনও অন্ধকার। এটা ওরা ধরেই নিয়েছিল। অঞ্জলি নেই, কাজেই ও ঘর এখন অন্ধকার থাকবেই। পথেই ওরা ঠিক করে নিয়েছিল, রজতের ব্যাপারে কোন কথাই সুতপাকে বলবে না। কারণ, ওতে নতুন করে আর এক বার বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। কাজ কি ওদের মিছে ঝামেলার সৃষ্টি করে?

ওরা তাই নীরবেই নিজেদের ঘরে ঢুকল। এবং যে-যার কাজ করতে লাগল।

একসময় ইভা সীমার ঘরে গেল ওর খোঁজ নিতে। মেয়েটা অসুস্থ। এখন কেমন আছে, কে জানে?

অসুখটা বাড়েনি সীমার। কালকের মত রক্তও আর পড়েনি। তবে শরীরটা তখনও দুর্বল।

বলল, ও কিছু নয়। দু'দিন বাদে এমনিতেই সেরে যাবে। আগেও তো হয়েছে, জানি।

ইভা তবুও বলল, তবু একবার একটা ডাক্তার দেখালেই ভাল করতিস, সীমা। বলা তো' যায় না কি থেকে কি হয়?

সীমা ওর দুশ্চিন্তাকে উড়িয়ে দিয়ে বলল, হবে আবার কি হাতি, ও বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা। বলবে, এটা কর, ওটা কর। মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরীক্ষা করে এক গাদা ওষুধ চাপিয়ে দিয়েই খুশি ওরা! ভাবে, যাক, কিছু করা গেল রোগীটার জন্য।

—তা বলে ওদের না দেখিয়েও তো উপায় নেই।

— সে যখন উপায় থাকবে না তখন হবে।

বোঝা গেল, অসুখের ব্যাপারটাকে বিশেষ আমলই দিতে চায় না সীমা।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সে খুবই সন্তর্পণে ইভাকে বলে, আজ যেন সুতপার কি হয়েছে, ইভা।

—কি?

—তা কি করে বলব ? তোদের সঙ্গেই তো বেরিয়েছিল। তার-পর কোথায় গিয়েছিল রে ? দেখলাম, একা একা ফিরে এল।

—হ্যাঁ, আমরা একটা বাড়িতে গিয়েছিলাম। ও চলে এল একা।

সব কথা ইভা ওকে বলল না। জানতে চাইল, সীমা কি বুঝেছে।

সীমাই তখন আবার বলল, কি জানি, ও আর কোথাও গিয়েছিল কিনা ! দেখি, এসেই নিজের বিছানায় শুয়ে কাঁদছে। আমি একবার গিয়েছিলাম ওর ঘরে। শুধু বলল, কিছু হয়নি, শরীরটা একটু খারাপ লাগছে। বলেই দরজা বন্ধ করে দিল ও।

হঠাৎ ইভা বলল, মাঝে মাঝে একটু কাঁদা ভাল রে, সীমা। ওতে গ্লানি মুক্ত হয়।

ওর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে সীমা বলল. তার মানে ?

—মানে কিছু নেই। এমনি বললাম আর কি।

আগের কথার ভারী সুরটাকে হাল্‌কা করে দিল ইভা।

কিছুই বুঝতে না পেরে সীমা চুপ করে গেল।

সে রাতে সুতপা অবশ্য খেতে এল না। কারণ সবার জানা, শরীরটা তেমন ভাল নেই। খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না ওর।

এরকমটা যে হবে. তা জানত ইভা নন্দিতা। এটা সাধারণ হিসেবের কথা।

কিন্তু যে হিসেবটা কারোরই জানা ছিল না, সে ঘটনাটি ঘটল আরও পরে। অনেক রাতে।

কেন যেন সে রাতে ঘুম আসছিল না ইভারও। এপাশ-ওপাশ করে করে খুবই বিরক্ত হয়ে উঠছিল। জেগে থাকলেই নানা চিন্তা ভীড় করে মাথায়। আবার জোর করে চোখ বন্ধ করে থাকলেও ঘুম আসে না।

হঠাৎ কোন এক ঘরের দরজায় ঠক্ ঠক্ করে টোকা মারার শব্দ হল।

কান খাড়া করে সে শব্দ শুনল ইভা। কিন্তু তক্ষুণি কিছু করল না। লক্ষ্য করতে চেষ্টা করল, কার ঘরে আওয়াজ হচ্ছে।

একটু পরেই সে বুঝল, সরলাদির ঘরেই কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে।

কে হতে পারে? মনে মনে একটা হিসেব করতে চেষ্টা করল ইভা। এবং সহজেই যার কথা ওর মনে হল তাতে চাপা কৌতূহলে সে প্রায় উঠে বসল বিছানাতে।

একবার ভাবল, নন্দিতাকে ডাকবে কিনা! তারপর ভাবল, না, থাক। কাজ নেই ওকে ডেকে। আগে দেখা যাক ব্যাপারটা কি?

ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠল সে। খুলে যাওয়া শাড়িটাকে একটু টেনে-টুনে ঠিক করে নিল। খুবই সন্তর্পণে বাতি না জ্বালিয়ে পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগুলো।

তখনও দরজায় হাত দেয়নি সে, ইতিমধ্যে কথা শোনা গেল। ঘরের ভেতর থেকেই সরলাদি বলছেন, কে?

পাতার খসখসানির মত অস্ফুট স্বরে উত্তর এল, আমি, সরলাদি।

গলা শুনেই বুঝল ইভা, এ আমি সুতপা।

—কি ব্যাপার? এত রাত্রে?

পরবর্তী প্রশ্নের সাথে সাথে দরজা খুললেন সরলাদি।

ইভা কিছুতেই বুঝতে পারল না, আর সবাইকে বাদ দিয়ে হঠাৎ সরলাদির কাছে কেন গেল সুতপা? কারও সঙ্গেই তো তাঁর সম্পর্ক অত ঘনিষ্ঠ নয়? তবে হঠাৎ তাঁর কাছে কেন?

সুতপা ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করলেন সরলাদি।

ইভা কান পাতল সে দরজায়। আতি-পাতি করে খুঁজল, কোথাও একটু ফাঁক আছে কিনা। শেষ পর্যন্ত পেয়েও গেল।

অবাক হল ভিতরের কাণ্ড দেখে। পাগল হয়ে গেছে নাকি মেয়েটা? নইলে অমন করে কেউ বলে, আমি কি ভ্রষ্টা সরলাদি?

আপনি বলুন, আমি কি নষ্ট হয়ে গেছি? কেন আমাকে দ্রৌপদী বলে রজত?

আঁচলটাকে মুখে পুরে দাঁত দিয়ে চেপে ধরল সুতপা। উদগত কান্না ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা।

—ছিঃ সুতপা, ছেলেমানুষি করে না। বোস।

জোর করে ওর কাঁধে চাপ দিয়ে বিছানায় বসালেন সরলাদি। নিজেও বসলেন পাশে। এতদিন ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও ঘটনার টানে এক মুহূর্তে ঘনিষ্ঠ হল ওরা দু'জনে।

সরলাদি সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, রজত বলেছে বুঝি ওকথা? কিন্তু কেন বলেছে, তা আমি কি করে বুঝব?

—ওকে ভালবাসতুম যে!

—তাই কখনও হয়?

—হ্যাঁ। ওকে শেষে বিয়ে করলুম না, তাই।

—কেন?

—আগে জানতুম না, বিশ্বাস করুন, এতটুকু মিছে বলছি না। আমরা কেউ জানতুম না যে, আমরা ভাই-বোন।

—সেকি? শিউরে উঠলেন যেন সরলাদি।

তারপর বললেন, কেমন ভাই?

—মাসতুতো। তাই তো জানার পর দূরে সরে গেলাম।

—ভালই তো করেছ।

—তবু ও বলে, আমি নাকি দ্রৌপদী।

—সে কি চায়? তারও তো না বোঝবার কথা নয়?

—বোঝে, সব বোঝে ও। তবু আমাকে অপমান করতেই এখন ওর আনন্দ। কেননা, ওর মতে, যে ধরনের ঘনিষ্ঠতা আমাদের জন্মেছিল তাতে বিয়ে করাটা অনেক কম অন্যায় হত। অজান্তে যে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা, তার জন্য আমরা দায়ী হতে পারি না। কিন্তু জেনেশুনে নতুন করে কনে সাজাটা নাকি একই ভণ্ডামী আর লোভীর লক্ষণ।

এবারে আর সরলাদি চট্ করে কোন মন্তব্য করতে পারলেন না। তাঁরও যেন কেমন কথা আটকে গেল।

বেশ একটু থেমে থেমে তিনি বললেন, ঠিক বলতে পারিনে, কতদূর ঘনিষ্ঠতা তোমাদের জন্মেছিল। তবে যদি খুব বেশি দূর এগিয়ে থাক তো ভাববার যথেষ্ট কারণ আছে। রজতবাবুর কথাটা ফেলে দেওয়া যায় না। জান তো, মনের অগোচরে পাপ নেই?

ব্যস। আর যায় কোথায়?

সটান দাঁড়িয়ে সুতপা বলল, বেশ, আপনারা সবাই আমায় যা-খুশি তাই ভাবুন। তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। কিন্তু কিছুতেই ওকে বিয়ে আমি করব না। সাতজন্ম বিয়ে না করলেও, নয়।

চলে আসছিল সুতপা।

আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আপনাদের কথায় আমার কিছুই এসে যাবে না। আর হ্যাঁ, কালই আমি এখান থেকে চলে যাব।

বলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাচ্ছিল সুতপা।

সরলাদি আস্তে বললেন, আমরা তো তোমায় কিছু বলিনি? আমাদের ওপর মিছেমিছি রাগ করছ কেন?

—মুখে বলছেন, না। কিন্তু মনে মনে সবাই বলছেন, সুতপাটা একটা বাজে মেয়ে সে কি আর বুঝিনে? তবে একটা কথা জেনে রাখবেন, যাঁরা আমায় নিয়ে হৈ-চৈ করে বেড়াচ্ছে তাঁরা নিজেরা কি তা জানতেও আমার বাকি নেই কিছু। যিনি আমাকে দ্রৌপদী বলে তিরস্কার করতে ওস্তাদ তিনিই যে আবার নন্দিতার সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছেন, সে খবর কি আর জানি না? কে যে কত বড় সাধু পুরুষ জানতে আর বাকী নেই কিছু! হুঁউ!

সরলাদি তখনও ধীরে শান্তভাবে দু'পা এগিয়ে সুতপার হাত দু'টি ধরলেন। স্নেহের সঙ্গে বললেন, তুমি এখন খুবই উত্তেজিত সুতপা। কাজেই, এ সময় ও নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই।

একটু থেমে আবার তিনি বললেন, তোমায় তো কেউ কিছু বলেনি,

তবে তুমি অত রাগারাগি করছ কেন? এত কান্নাকাটিই বা কিসে? আসলে, আমার মনে হয়, তোমার মনেই ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দের একটা ঝড় উঠেছে। আর তাতেই তুমি বিক্ষুব্ধ। নইলে শুধু বাইরের লোক কিছু বললে সহজেই সেটা ঝেড়ে ফেলতে পারতে। তা কখনও অন্তরকে অপমানিত করতে পারত না।

যথেষ্ট রুখেই বলতে চেয়েছিল সুতপা, আমি মানি না অন্তর। মানি না, সেকেলে ন্যায়-অন্যায়।

কিন্তু বলার সময় ওর কথায় তেমন রুখে ওঠার সুর শোনা গেল না।

সরলাদি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন, বেশ তো, মেনো না।

সুতপা তক্ষুণি বলল, সবাই যেন কতই নীতি মেনে চলছে, হুঁউ!

কথাটা যে কাকে সে বলল, কেনই বা বলল, কিছুই বোঝা গেল না।

সরলাদি খুবই মিষ্টি করে বললেন, কে কি করছে না করছে তা দিয়ে তো কোন কিছুর বিচার করা হয় না, সুতপা। আসলে আমরা নিজেরা নিজের যে বিচার করি সেটাই হল খাঁটি বিচার। মন বড় শক্ত বিচারক, সুতপা। ওর হাত থেকে কারও রেহাই নেই! তবে বয়সে তোমাদের চাইতে আমি অনেক বড়। আর কিছু না হোক, সেই বয়সের দাবীতেই বলি, রজতবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যদি খুব বেশিই হয়ে থাকে তো অন্যত্র বিয়ে করাটা বোধহয় ন্যায়সঙ্গত হবে না। শুধু আলাপ-পরিচয় থাকলে কোন প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে সত্যিই জিনিসটা খুব ভাল হবে না।

আবার ফোঁস করে উঠল সুতপা। বলল, হবে কি না-হবে, সে আমি বুঝব। দেখিয়ে দেব, আপনাদের গালাগালি আর বিচার-বিতর্ক সব মিথ্যা করে দিয়ে আমিও সম্মানী নারী হব একদিন। দেখবেন কোথাও একটুও আটকাবে না।

কথার শেষে একটু বিদ্রূপের হাসিও হাসল সুতপা।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তবে হ্যাঁ, কাল থেকে এই বাজে বিচ্ছিরি মেয়েটাকে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন না। আপনারা সবাই সম্মানী মহিলা, আমার মত মেয়ে তো আর আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারে না? আর তা থাকাও উচিত নয়। বলেই আর কোন কথার অপেক্ষা না করে হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ইভা দেখল, সরলাদি ওর পিছু পিছু ওর ঘর পর্যন্ত এসেছিলেন। কিন্তু সুতপা খটাং করে দরজা বন্ধ করে দেওয়াতে বাধ্য হয়েই ফিরে এলেন তিনি।

মা, ও মা!

যথাসম্ভব গলা চড়িয়ে চীৎকার করল প্রণব।

এখন ওর অফিসে যাওয়ার সময়। কাজেই ব্যস্ত সে। কিন্তু ওরকম ব্যস্ত মুহূর্তে কিছুতেই রুমালটা খুঁজে পাচ্ছিল না সে। তাই মাকে ডাকল।

মা সৌদামিনীও রান্না ঘরের কাজে ব্যস্ত।

তিনিও তাই সেখান থেকে উঁচু পর্দায় জিজ্ঞেস করলেন, কি হল?

—কি আর হবে? রুমালটাকে ছাই খুঁজে পাচ্ছি না।

বেশ খানিকটা বিরক্ত কণ্ঠ প্রণবের।

—রেখেছিস কোথায়? বলেই ঝামেলা এড়ানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গেই আবার বললেন, যাও তো বৌমা, প্রণবের রুমালটা একটু দেখে দিয়ে এস তো।

বটিটাকে কাৎ করে রেখে ধীরে-সুস্থে উঠল সুতপা। ঘোমটাটুকু আরও একটু টেনে প্রণবের ঘরে এল সে?

ঘরে ঢুকেই মিষ্টি মুখে বলল, অত ষাঁড়ের মত চ্যাঁচাও কেন? আস্তে বলতে পার না?

—না পারি না। আমি প্রণব, আমার বাহনই ষাঁড়। ওর চ্যাঁচানি শুনতে আমার ভালই লাগে। তাই, মাঝে মাঝে আমিও ওরকম চ্যাঁচাই।

—বাঃ! চমৎকার! খিল খিল করে হেসে উঠল সুতপা।

ওর দিকে ফিরে প্রণব বলল, এতে হাসবার কি আছে?

—না, বলছিলাম, বাহনের সঙ্গে আবার একাকার হয়ে যেতেই বা কতক্ষণ!

—বটে? যাকে যা নয়, তাই বলা? দেখবে তাহলে মজা?

বলেই প্রণব ওর দিকে ছুটে এল। সুতপা 'ওকি হচ্ছে', 'ওকি হচ্ছে' বলে একটু আতঙ্কিত ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রণব এসে ওকে দু'হাতে জাপটে ধরে বলল, এখন, এখন কি করবে?

—দেখবে, কি করি? ডাকব মাকে?

বলেই মা বলার মত মুখভঙ্গী করল সুতপা।

প্রণব হাত দিয়ে ওর মুখ চাপা দিল। কাজেই নিরুপায় সুতপা। হাত সরিয়ে তৎক্ষণাৎ ওর ঠোঁটে ঘন ঘন চুমু দিতে লাগল প্রণব। লাল টুকটুকে হয়ে উঠল সুতপার মুখ।

একটু পরে বলল, এই বুঝি তোলার রুমাল খোঁজা হচ্ছে?

—খুঁজেছি, পাইনি।

—হু—উ—ম? বলে সঙ্গে সঙ্গে ওর পকেট থেকে রুমালটি টেনে বের করে বলল, তবে এটা কি?

যেন সে খোঁজই রাখত না এমনি ভঙ্গীতে প্রণব বলল, এই যাঃ, এতক্ষণ খেয়ালই করিনি।

—বেশ, এখন তো পেয়েছ! এখন ছাড়, আমি যাই।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল সুতপা।

—অত যাই-যাই কর কেন? না হয় একটু থাকলেই। আমি তো আর সারাদিন ঘরে বসে থাকছি না?

—থাকলেই পার! কে মানা করেছে? কিন্তু এখন দেরী করলে মা কি ভাববেন?

—ভাবুক গে।

—হেট্। এগুলোকে অসভ্যতা বলে। মা-বাবার চোখের সামনে এসব কি!

এবারে সত্যি নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সুতপা।

প্রণব আবার ওর একটা হাত ধরে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি কথা বলবে?

—কি ?

—সারাদিন একবারও কি আমার কথা ভাব ?

—তোমার কি মনে হয় ? পাল্টা প্রশ্ন সুতপার।

—সে পরে বলব। আগে তুমি বল।

—যদি বলি– না ?

—যদি না, ঠিক করে বল।

—দিন দিন কি ছেলেমানুষী হচ্ছে ? এসব কথা কেউ জিজ্ঞেস করে জানতে পারে ?

—বুঝেছি, অপ্রিয় বলে কথাটাকে তুমি এড়িয়ে গেলে।

একটু ব্যথিত হল প্রণবের মুখ।

সুতপার হাত ছেড়ে দিয়ে সে বলল, জানি, বয়সটা আমার একটু বেশি হয়ে গেছে বলেই আমার কথা আর আচরণ কোনটাই তোমার তেমন ভাল লাগে না। কিন্তু কি করব বল ? মনটাকে তো আর সব সময়েই চোখ রাঙিয়ে রাখা যায় না ?

—আহা, ভারী বুদ্ধিমান !

এবারে নিজেই এগিয়ে এসে প্রণবের হাত ধরল সুতপা।

কাঁধের ওপর হাত রেখে আস্তে বলল, মহেশ্বরের বয়স বিচার করে নাকি গৌরী ? এই বুদ্ধি হচ্ছে দিন দিন ?

বলে নিজেই ওর গালে গাল ঘষতে লাগল।

প্রণব ফিস্-ফিস্ করে বলল, সত্যি তুমি আমার মহেশ্বরী, সুতপা। তুমিই সব।

ঘন আশ্লেষে দু'জনেই একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ সুতপা বলল, এবার যাই ?

—আচ্ছা। আর হ্যাঁ, বিকেলে আমরা দু'জনে মেট্রোতে যাব।

—সেকি ?

হ্যাঁ।

খুশি মনে চলে গেল সুতপা।

গুন্ গুন্ করতে করতে প্রণবও বেরিয়ে গেল অফিসে।

বিকেলে যথাসময়েই সাজগোজ করতে বসল সুতপা। শাশুড়ীকে আগেই বলেছে। তাঁরও অমত কিছু নেই।

জামা-কাপড় পরা সব শেষ। প্রসাধনের কাজটুকু হাল্কা হাতে সেরে নিতে হবে এখন। আর কিছু নয়।

প্রণবের জন্যই অপেক্ষা করছিল সে।

একটু পরেই প্রণব এল।

—তুমি রেডি, সুতপা?

—ও বাব্বা! সেকি এখন? সেই চারটে থেকেই তো সেজেগুজে পুতুল হয়ে আছি।

—দেখি, দেখি কেমন রাঙা পুতুল এটা! একেবারে কেষ্টনগরের পুতুল নাকি?

বলতে বলতে ওর মুখটা দু'হাত দিয়ে ধরতে যাচ্ছিল প্রণব। সুতপা আতঙ্কিত ভঙ্গীতে মুখটা পেছনে টেনে নিয়ে বলল, উঁ-উঁ হু ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না। ওই শক্ত থাবায় ধরলে পুতুলের রঙ উঠে যাবে, হাড়-পাঁজর সুদ্ধু ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে।

—দূর্, তাই কি যায়? এটা তো আমার কামনার রঙে রাঙা পুতুল। এটা তাই রোজ ভাঙে, রোজ নতুন করে সাজে।

—হুঁউ, অত?

—তবে না তো কি?

একটু থামল প্রণব।

তারপর নেহাতই মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে বলল, ওহ্ হো! ভুলেই যাচ্ছিলাম আর কি। আমি খুব চটপট জামা-কাপড়টা বদলে নিচ্ছি। তুমি ততক্ষণে ঝট্ করে দু'কাপ চা করে ফেল তো, সুতপা।

—কেন? দু'কাপ কেন?

—আরে, নীচের ঘরে আমার এক বন্ধু অপেক্ষা করছে যে। কথাটা বলতে ভুলেই গেছলাম।

—সেকি? এটা কি বন্ধুকৃত্যের সময়? ওদিকে শো শেষ হয়ে যাবে যে!

—না। ভয় নেই, শুরুও হবে না। সে খেয়াল আমার আছে।

—ভাল লাগে না ছাই, যখন তখন এসব বন্ধু-ফন্ধু।

- তা তো বটেই। সিনেমা দেখার মত একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধা সৃষ্টি হলে কার-ই বা ভালো লাগে, বল? তা কি করবে! তবে এসে যখন পড়েইছে তখন—

প্রণবের কথাটা শেষ হতে পারল না।

সুতপা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, এখন চা-টা খেয়ে চট্ করে বিদেয় হলে বাঁচি।

— না, না সুতপা, রজত বন্ধুটি আমার সেরকম নয়, কারো বাড়িতে ও সাধারণতঃ ঢুকতেই চায় না। ঢুকলেও বেরোনোর জন্য ও নিজেই ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

—কি নাম বললে?

— রজত, রজত। মানে রজত রায়।

এক নিমেষেই পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল সুতপার শরীরটা। বাজ-পড়া একটা শরীর যেন। দেহের সমস্ত শক্তি এক নিমেষে উধাও।

সামনের দীর্ঘ আয়নায় নরেন, কল্যাণশঙ্কর আর রজতের মুখটা চক্রাকারে বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল।

এক সময় সেগুলো সবকটি মিলে জড়াজড়ি করে কি এক বিশ্রী চেহারা নিল! দেখতে দেখতে সেটা একটা কালো কুচ্‌কুচে কাঁকড়া-বিছে হয়ে ল্যাজের দিকটা বেঁকিয়ে দুরন্ত আক্রোশে সুতপার নরম শরীরটা কামড়ে ধরল।

—উফ্, মাগো! একটা অস্ফুট চীৎকার করেই মাটিতে পড়ে গেল সুতপা।

ডাক্তার এসে আপাদমস্তক দেখে বলে গেলেন. ভয় নেই। উনি মা হতে যাচ্ছেন। এ রকম সময় এমন হয় মাঝে মাঝে। এতে ভয় পাবার কিছু নেই।

ডাক্তারের কথা শুনে হাঁফ্ ছাড়ল প্রণব।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা।

শেষ